মৎস্য পক্ষ

১৬-৩১ আগষ্ট

'৯৫

করবো মোরা মাছের চাষ
থাকবো সুখে বারো মাস

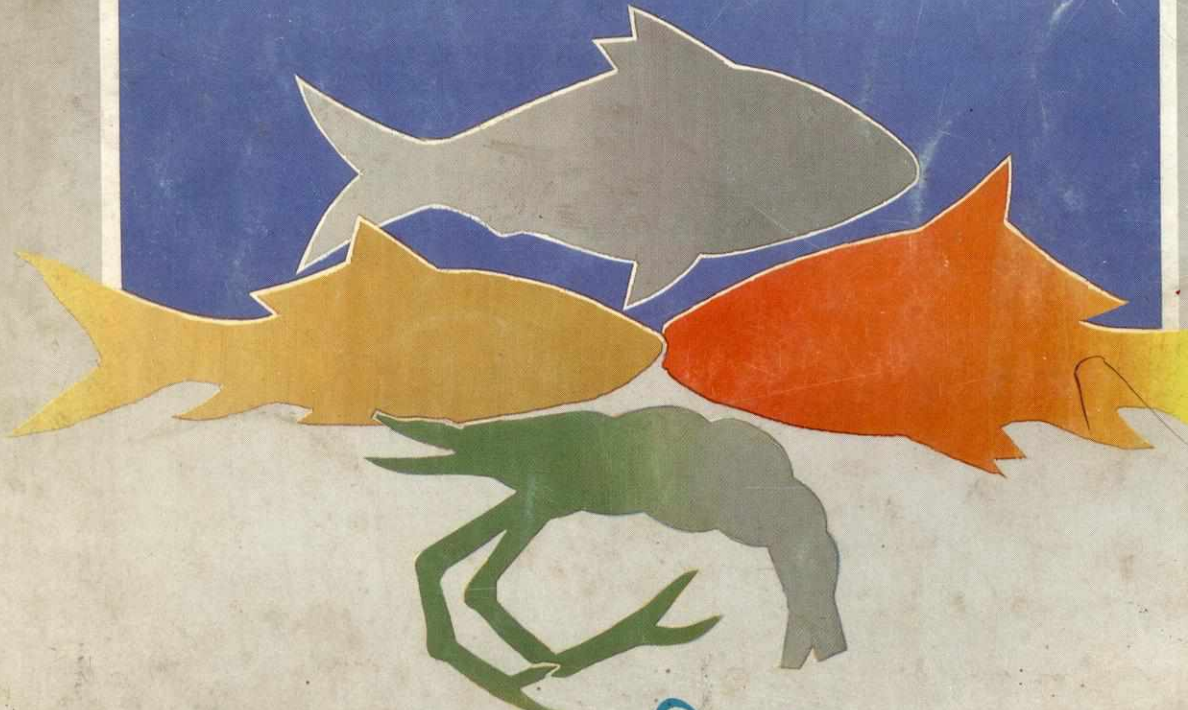

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য পক্ষ

সংকলন

১৬-৩১ আগষ্ট

'১৫

করবো মোরা মাছের চাষ
থাকবো সুখে বারো মাস

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য পক্ষ '৯৫ সংকলন

প্রকাশ ও প্রচারণায় ঃ
মহা পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশে আর্থিক সহায়তা ঃ
বৃটিশ সরকারের ওডিএ

প্রকাশ কাল ঃ
আগষ্ট ১৬, ১৯৯৫
ভাদ্র ১, ১৪০২

প্রচার সংখ্যা ঃ
১০,০০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

কম্পিউটার অক্ষর বিন্যাসে ঃ
অমনি এক্সিকিউটিভ সিস্টেমস্ লিঃ
৬/১১এফ, লালমাটিয়া, সাতমস্‌জিদ রোড।

ডিজাইন ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় ঃ
প্রমোটার্স এডভার্টাইজিং, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ

জনাব মোঃ আব্দুল মহিন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা - সভাপতি

জনাব এস. এন. চৌধুরী
উপ-পরিচালক - সদস্য

জনাব মেজবাহউদ্দিন আহমেদ
উপ-প্রধান - সদস্য

জনাব মাহমুদুল হক
সহকারী প্রধান - সদস্য

জনাব মনতোষ চন্দ্র চক্রবর্তি
সহকারী প্রধান - সদস্য

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা - সদস্য সচিব
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

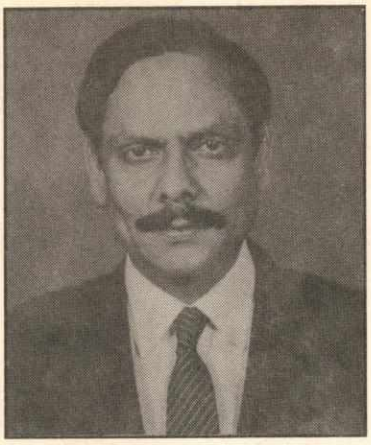

অন্তরঙ্গ কথা, অন্তরের কথা

একদা বাংলা ভাষার এক কবি তাঁর সন্তান যেন দুধে - ভাতে থাকে সেই কামনা করে গিয়েছিলেন। তিনি কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তাঁর প্রিয় পানীয় দুধ নির্জলীকৃত বিচূর্ণ অবস্থায় একদিন আশ্রয় নেবে বিদেশী টিনের কৌটায় ? আর দুধ - ভাত অনেকের কাছে হয়ে উঠবে এক স্বপ্নে দেখা খাবার।

তেমনি মাছে - ভাতে বাঙ্গালীর পাত থেকে কোনদিন ডানা মেলে শূন্যে উধাও হবে টুকটুকে পুঁটি কিংবা চক্‌চকে ইলিশ, একথা কি কেউ কোনকালে কল্পনাও করেছিল ? আমাদের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণে মাৎস্যন্যায় আচরণ ও অবিমৃষ্যকারিতা আমাদেরকে মৎস্যহীন, দুগ্ধহীন আমিষশূণ্য এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে দ্রুত প্রধাবিত করছিল। সেই সকরুন পরিনতি থেকে বাঁচার তাগিদে, আশার কথা, বিলম্বে হলেও আমাদের সমগ্র জাতির আজ কমবেশী চৈতন্যোদয় হয়েছে, আমরা আমাদের লুপ্ত ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে এখন মৎস্যচাষে, গবাদি পশুপালনে মনোযোগ দিচ্ছি।

চাষ না করলে যেমন সবুজ প্রান্তরে স্বয়ম্ভূ সোনালী শস্য ফলে না, সব রকমের জলাশয়েও তেমনি রূপালী মাছ পেতে হলে চাষ করতে হয় মাছের। এই ধারণাটি আমাদের দেশে এই সেদিনও ছিল দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। যত তাড়াতাড়ি আমাদের সকলের মধ্যে এই উপলব্ধিটি দানা বাঁধে ততই মঙ্গল। সঙ্গত কারণেই আমাদের এবারের শ্লোগান তাই ঃ *করবো মোরা মাছের চাষ, থাকবো সুখে বারোমাস।*

আমরা সবাই মৎস্যমনস্ক হই, মাছের ফলনবৃদ্ধিতে আরো যত্নবান হই - এই কামনা করি। কারণ এতেই আমাদের পুষ্টি এতেই সমৃদ্ধি।

(এ. এইচ. মোফাজ্জল করিম)
সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ই আগষ্ট, ১৯৯৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	১
সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক উন্নত মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৭
ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনা	১০
সেচ প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন	১৪
পার্বত্য জেলা সমূহে মাছ চাষের সম্ভাবনা	১৬
মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের জন্যে গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রয়াস এবং প্রসার	১৭
ব্যাংক ঋণের জন্য একটি আধা-নিবিড় মৎস্য চাষ খামারের মডেল প্রকল্প	২১
মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও প্রসারে আধা-নিবিড় প্রযুক্তি প্রয়োগ	২৫
মাছের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা	২৮
মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ	৩০
হাঁস/মুরগীর সাথে মাছের সমন্বিত চাষ	৩৪
ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ঃ একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি	৩৮
মৎস্য প্রজননে অন্তঃপ্রজনন ও সংকরায়ণ জনিত সমস্যা ও সমাধান	৪১
পুষ্টির উৎস হিসেবে মাছ	৪৩
বাহারী মাছের একোরিয়াম ব্যবস্থাপনা	৪৫
ক্ষুদ্রায়তন গলদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা	৪৭
লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে উপকূলীয় চিংড়ি চাষ উন্নয়ন	৫০
বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা	৫৩
চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনায় রোগবালাই প্রতিকার ও প্রতিরোধ	৫৭
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সহনশীল মাত্রায় আহরণ পরিচালনা	৬০
মাছের আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস করণে মান নিয়ন্ত্রণের কৌশল	৬৭
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা	৭১
বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদনের গতিধারা	৭৫
মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আইনসমূহের সংক্ষিপ্তসার	৭৯
মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা পরিচিতি	৮৭
একনজরে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর	৯৩
মৎস্য সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং পোনা প্রাপ্তি স্থান	৯৭
মাছ চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রাপ্তিস্থান	১০২
মৎস্য পক্ষ '৯৫ পুরস্কার	১০৬
প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর	১০৭
মৎস্য সেক্টরের স্থাপনা সমূহ	১১৫

প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মোঃ লিয়াকত আলী, মহাপরিচালক
মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপপরিচালক
রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক

সূচনা

নদীমাতৃক বাংলাদেশ স্মরণাতীতকাল হতেই মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৮ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে প্লাবনভূমি হলো ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর (মৎস্য সম্পদ জরিপ, মৎস্য অধিদপ্তর)। বিগত ষাট ও সত্তরের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০% পাওয়া যেত অভ্যন্তরীণ এসব জলাশয় হতে । তাছাড়া দেশের মৎস্যজীবিগণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই প্লাবনভূমির মৎস্য আহরণের উপর জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে প্লাবনভূমির গুণগত অবক্ষয় ও এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে প্লাবনভূমি হতে মৎস্য উৎপাদন গত তিন দশকে মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ফলে জনগণের খাদ্যে মৎস্য প্রাপ্তিতে এবং স্থানীয় মৎস্য জীবিগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায়, প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য কারিগরী ও আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

প্লাবনভূমির বর্তমান অবস্থা

সাধারণতঃ বর্ষা মৌসুমে ৩-৬ মাসের মত পানি থাকে অথচ শুস্ক মৌসুমে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় বা এর অংশ বিশেষে পানি থাকে এমন এলাকাই প্লাবনভূমি হিসাবে পরিচিত। প্লাবনভূমি বছরের বেশীর ভাগ সময় শুষ্ক থাকায় এখানে ধানসহ বিভিন্ন কৃষি ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে অনেক সার ব্যবহারের ফলে এবং প্রচুর পলিমাটি জমে বিধায় উৎপাদনের জন্য দরকারী মৌলিক উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাই এখানকার মাটি ও পানির উর্বরা শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হওয়ায় প্লাবনভূমি রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ইত্যাদি) মাছের উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট চারণভূমি ও আবাসস্থল। এ কারণে মুক্ত জলাশয় হতে প্রাপ্ত বিশেষতঃ রুই জাতীয় মাছের সিংহভাগ উৎপাদিত হত প্লাবনভূমিতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে ১৯৭৬ সালে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে দেশে বার্ষিক ১ লক্ষ টন রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউস ইত্যাদি) মাছ উৎপন্ন হয়েছে যার সিংহভাগই উৎপাদিত হয়েছে প্লাবনভূমি হতে। এই রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন নানাবিধ কারণে হ্রাস পেতে পেতে মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে মাত্র ৮,১৩৩ টনে এসে দাঁড়ায় (মঃসঃজঃ, মৎস্য অধিদপ্তর -১৯৮৮)। প্লাবনভূমি হতে ক্রমান্বয়ে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন এরূপ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হলো মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে মাছের প্রজনন ও আবাসভূমির পরিবেশ এবং প্রকৃতির অবক্ষয় ও এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়াতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছের পোনার পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া। বিগত তিন দশক ধরে প্রাকৃতিক পোনার উৎপাদন ও মজুদ মারাত্মকভাবে কমে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তরের (মঃসঃজঃ) এক হিসাব মতে ১৯৮৫ সালে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে ১৯,৩৬২ কেজি রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদিত হত তা ক্রমান্বয়ে কমে ১৯৯৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৫,০৬৯ কেজিতে। উৎপাদিত এ রেণুর এক উল্লেখযোগ্য অংশ আহরণ করা হয় পুকুরে মৎস্য চাষের নিমিত্তে। প্রাকৃতিকভাবে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনার মজুদ বর্তমানে প্রায় নগণ্য। ফলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী প্লাবনভূমি প্রায় অব্যবহৃতই থেকে যায়, কেননা উক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে (Ecologiacl niches) বিদ্যমান জীবের/খাদ্যের ব্যবহার হচ্ছে না বা অপচয় ঘটছে।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে যে হ্রাস পাচ্ছে তা রোধ করা এবং উৎপাদনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিগত আশির দশকের শেষদিক হতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প হাতে নিতে শুরু করে। উহারই অংশ হিসাবে ১৯৮৯ ও ৯০ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থে মুক্ত জলাশয়ের কতিপয় স্থানে সামান্য পরিমাণে রুই জাতীয় মাছের পোনা ছাড়া হয়। এই সময়ের পর হতে এবং গত ৪র্থ ৫-সালা পরিকল্পনা মেয়াদে এই উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিশ্ব ব্যাংকের ঋণে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পসহ কয়েকটি প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর হাতে নেয়। তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের আওতায় ১৯৯২ সাল হতে পরীক্ষামূলকভাবে বৃহত্তর খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার যে সব প্লাবনভূমিতে অন্ততঃ ৫ মাস পানি থাকে সেসব প্লাবনভূমিতে বর্ষার শুরুতে বড় আকারের (৩"-৫") পোনা ছেড়ে তা খাবার উপযোগী আকারে পরিণত হলে বর্ষার শেষে এবং শুস্ক মৌসুমে আহরণ করা হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৯ সাল হতে বৃহত্তর সিলেট - ময়মনসিংহ হাওড় অঞ্চলের প্লাবনভূমির অন্তর্গত বিলের কতিপয় নীচু স্থানে নার্সারী প্রস্তুত করতঃ তথায় রুই জাতীয় মাছের রেণু ছাড়া হয় এবং বর্ষাকালে এসব নার্সারীর পাড় ডুবে গেলে তথায় উৎপাদিত পোনা সমস্ পাবনভমিতে ছড়িয়ে পড়ে। পরবতীতে এসব পোনা আহরণোপযোগী হলে বর্ষার শেষ দিকে বা শুস্ক মৌসুমে ধরা হয়। এ দু'ধরনের ব্যবস্থাপনা মডেলের ভিত্তিতে প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পরীক্ষামূলক কাজ চলে আসছে। এ দু'টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রভাব ও ফলাফল নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প

প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এর আওতায় গোপলগঞ্জের চান্দা, খুলনার বিএসকেবি এবং নাটোরের হালতি-এ তিনটি বিলে 'ইউ এন ডি পি' এর কারিগরী সহায়তায় প্রকল্পে নিযুক্ত 'এসটিএ' এর অধীনে

মজুদ কার্যক্রমের ফলাফল ও প্রভাব সম্বন্ধে সমীক্ষা ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত চালানো হয়। এ সমীক্ষা চালানো হয় একটি স্থানীয় পরামর্শক ফার্মের মাধ্যমে। উক্ত ৩টি বিল ব্যতীত অন্যান্য বিলে শুধু উৎপাদন মনিটরিং এর কাজ মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল দ্বারা চালানো হয়। প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক হেক্টর প্রতি ২০ কেজি হতে শুরু করে ৩০ কেজি পর্যন্ত পোনা ছাড়ার এবং গড়ে মজুদকৃত পোনার ১০ গুণ মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা আছে। প্লাবনভূমি/বিলের উৎপাদন ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য মাছের উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মজদযোগ্য মাছের প্রজাতিসমূহ, উহাদের আনুপাতিক হার এবং হেক্টরপ্রতি মজুদের পরিমাণ অর্জিত অভিজ্ঞতা/ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবৎসর সমন্বয় করা হয়।

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের উৎপাদন পরিবীক্ষণের কাজ ১৯৯২ সাল হতে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত পরিবীক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প পূর্ব বৎসরের (১৯৯১-৯২) উৎপাদন এবং ১৯৯৩ সনে পোনা মজুদের পর ১৯৯৩-৯৪ বৎসরে মৎস্য উৎপাদন ফলাফল পরিশিষ্ট - ১ তে দেখানো হলো । এতে দেখা যায় যে, মজুদকৃত পোনার ১৩গুণ পর্যন্ত এবং হেক্টরপ্রতি ২৪৭ কেজি পর্যন্ত রুই জাতীয় মাছের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে। স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম প্লাবনভূমির অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যজনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রকল্পপূর্ব ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে এবং প্রকল্পোত্তর ১৯৯৪ সালের মে মাসে সমীক্ষা/ জরিপ কাজ পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করতঃ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর উক্ত কার্যক্রম কি প্রভাব ফেলেছে বা ফেল্‌ছে তা দেখানোর জন্য কতিপয় উন্নয়ন নির্দেশক/মাপকাঠি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিশিষ্ট-২ এবং ৩-এ পরিবেশিত হলো। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন এলাকার উপাত্তের সমতা বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সম্পত্তিতে (Assets) স্থানীয় বাজার দরে পরিমাপ করে তা টাকায় দেখানো হয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং এখানে প্রদত্ত পরিশিষ্ট ২ ও ৩ হতে দেখা যায় যে, এ কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব স্বল্পহারে হলেও তা দৃঢ় এবং ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু। বিশেষ করে পেশাজীবি জেলে ও ক্ষুদ্রকালীন জেলেদের মৎস্য আহরণের সুযোগ (পানি সম্পত্তি), মৎস্য আহরণ যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও মাছ হতে বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় জনগণের মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণও উৎসাহব্যাঞ্জক হারে বেড়েছে।

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্লাবনভূমিতে বাহির হতে পোনা সরবরাহ ও মজুদ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং আর্থিক দিক দিয়েও তা লাভজনক। তবে এ কর্মসূচীর মূল সমস্যা হলো এর সুফল লক্ষ্যজনগোষ্ঠি বিশেষতঃ দরিদ্র মৎস্যজীবিগণের মধ্যে যুক্তিসংগত হারে পৌঁছানো এবং একে টেকসই করা। এ উদ্দেশ্যে চলতি ১৯৯৫ সালের মজুদ-কর্মসূচীতে স্থানীয়ভাবে কাজ করছে এরূপ 'এনজিও' দেরকে নিযুক্ত ও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে আশা করা যায় যে, মৎস্যজীবিসহ স্থানীয় সকল জনগোষ্ঠির স্বতঃস্ফূর্ত ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতত জোরদার হবে। ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যজনগোষ্ঠী নিজেরাই সফলভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে একে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে টেকসই করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প

বৃহত্তর সিলেট ও কিশোরগঞ্জের হাওড়ের বিলে নার্সারীতে লালন করা পোনা এবং সরাসরি বড় পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম ১৯৯১ সাল হতে এ পর্যন্ত চলে আসছে। মৎস্য উৎপাদন এবং স্থানীয় মৎস্যজীবিগণের ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিরূপণের জন্য ১৯৯৪-৯৫ সনে সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্লাবনভূমি মজুদ মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্তমান বিল ইজারার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৮৪% ব্যক্তি বিশেষের আওতায় বিশেষভাবে অমৎস্যজীবির কাছে নিলামের মাধ্যমে ন্যাস্ত। ফলে মৎস্য উৎপাদনের সুফলের সিংহভাগ ৮২% জলাশয়ের লীজ গ্রহণকারীরাই পেয়ে থাকে। বাকী ১৮% মৎস্যজীবিগণ সারা বৎসর মাছ ধরার মাধ্যমে ভোগ করে। মাত্র ১৬% ইজারাভুক্ত জলাশয় নতুন জলমহাল নীতিমালার আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এটিও সত্যিকারভাবে সমবায়ভিত্তিক নয়। যদিও এ পদ্ধতিতে স্বল্প টাকা প্রদানের মাধ্যমে জলাশয়ে মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার নিশ্চয়তা থাকে তথাপি বিত্তশালী লোকজনই এক্ষেত্রে টাকা বিনিয়োগ করে মাত্রাতিরিক্ত হারে মৎস্যজীবিদের নিকট হতে আদায় করে থাকে।

উল্লেখিত কার্যক্রমে মৎস্যজীবিগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন শুধু এক বৎসরের সমীক্ষার ফলাফল দ্বারা নির্ধারণ যদিও সম্ভব নয় তবুও স্বল্প পরিসরে প্রাপ্ত এবং ব্যক্তি সমষ্টি মালিকানায়/লীজে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মৎস্যজীবিদের কিছুটা উন্নতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিগণ অধিক টাকা বিনিয়োগ করে কার্প জাতীয় মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ৪% ও ৬% মধ্যম বা বড় মৎস্যজীবিতে পরিণত হয়েছে, কারণ উপযুক্ত সরঞ্জাম ছাড়া রুইজাতীয় মাছ ধরা যায় না। সকল শ্রেণীর মৎস্যজীবিদের আর্থিক আয় গড়ে ৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরার সময় মৎস্যজীবির সংখ্যা (সাময়িক) ২৭% থেকে ৩২% এ উন্নীত হয়েছে। কৃত্রিম মজুদের কারণে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবিদের আয় বাড়ার ফলে বাসস্থান, বাচ্চাদের লেখাপড়া, গহস্থালীর ব্যবহায্য জিনিসপত্র, গহপালিত পশুপাখী ইত্যাদি খাতেও বিনিয়োগের অধিকতর হার পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের ক্ষেত্রে অধিকতর রুইজাতীয় মাছ বিক্রয় ও খাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃত্রিম মজুদের মাধ্যমে জলাশয়ের ইজারা মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১৯৯২ এর উপর বর্দ্ধিত হার			
সন ১৯৯২	বৃদ্ধি ১৯৯৩ ('৯২ এর উপর)	বৃদ্ধি ১৯৯৪ ('৯৩ এর উপর)	১৯৯৪ ('৯৩ এর উপর)
বেইজ বৎসর	৪০%	৬২%	১৬%

সকল শ্রেণীর জনগণ স্বীকার করে যে, কৃত্রিমভাবে রুই জাতীয় মাছ অবমুক্তির ফলে প্লাবনভূমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে নতুবা মাছ আরও দুর্লভ আমিষ খাদ্যে পরিণত হতো।

১৯৯৫ সনে অনুকূল পরিবেশে রেণু পোনা মজুদ ও লালন খরচ বিশ্লেষণ

করে দেখা যায় যে, সরাসরি চারা পোনা (৭ সেঃমিঃ এর অধিক) ক্রয় মূল্যের মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ ও মিশ্র আকারের শতকরা ৯ ভাগ খরচে রেণু পোনা মজুদ সম্ভব হয়েছে। যদি জীবিতাবস্থায় হার তিন ভাগের এক ভাগ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবেও সরাসরি চারা পোনা ক্রয়ের (৭ সেঃমিঃ এর অধিক) ৮১% খরচে এবং মিশ্র আকারের পোনা ২৭% খরচে বিল নার্সারীর আওতায় মজুদ সম্ভব হয়েছে। এ বৎসর বর্ষা যথাসময়ে আসায় রেণু পোনা লালনের যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে। অধিকন্ত হাইল হাওড়ে ৪০ টন রুই জাতীয় পোনা অবমুক্তির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তাই সময় মত মৎস্য আইন এর যথাযথ প্রয়োগ হলে কাঙ্খিত পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন আশা করা যায়। ইতিমধ্যে ১৯৯৬ সনের মার্চ-মে তে ১,৬০০ হেক্টরে রেণু মজুদের কার্যক্রম এবং প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

অন্যান্য কর্মসূচী/প্রকল্প

উপরোক্ত ২টি প্রকল্প ছাড়াও সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভরাট হয়ে যাওয়া সীমিত সংখ্যক খাল, নালা, জলাশয় গভীর করার কাজ চলছে। প্লাবভূমি সহ মুক্ত জলাশয়ে মাছের জন্য কয়েকটি অভয়াশ্রম ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইনও যথাযথভাবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উপসংহার

দেশের উৎপাদিত মাছের সিংহভাগই আসে এখনো প্লাবনভূমিসহ অভ্যন্তরীণ মুক্তজলাশয় হতে এবং উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠি এখানকার মৎস্য সম্পদ আহরণের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্লাবন-ভূমির মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে চালু উক্ত চাষভিত্তিক ২টি ব্যবস্থাপনা মডেল কারিগরী দিক দিয়ে লাগসই ও উপযুক্ত বলে দৃশ্যতঃ প্রমাণিত হলেও এসব কর্মসূচী আরো কয়েক বৎসর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্রম অবক্ষয়মান মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদন স্থল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ যথা-পর্যাপ্ত সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, ভরাট নদী-নালা, খাল-বিল গভীর করে পানি/মৎস্য চলাচলের পথ সুগম করা, মৎস্য সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এসব কর্মকান্ডকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও টেকসই করার জন্য আরো অনেক কাজ করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে যেটা দরকার তা হলো স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যজনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে ও দায়িত্বে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা । এতদুদ্দেশ্যে চাই স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড।

(পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পরিশিষ্টগুলো সংযুক্ত হল)

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের আওতায় পোনা মজুদের উৎপাদন ফলাফল

পরিশিষ্ট - ১

প্লাবনভূমি/বিল জেলা এবং উহাদের আয়তন (হেক্টর)	বার্ষিক মজুদপূর্ব(১৯৯১-৯২) উৎপাদন (মেঃটন)			১৯৯৩ সালে পোনা মজুদের পরিমাণ(মেঃটঃ)	মজুদের পর উৎপাদন(মেঃটঃ) ১৯৯৩-৯৪ সালে (জুলাই-জুন)			অতিরিক্ত উৎপাদন(মেঃটঃ)		
	রুই জাতীয়	অন্যান্য	মোট		রুই জাতীয়	অন্যান্য	মোট	রুই জাতীয় (হেঃপ্রতি)	অন্যান্য (হেঃপ্রতি)	মোট (হেঃপ্রতি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। চান্দা গোপালগঞ্জ -৫০০০	৩৭	২১২৮	২১৬৫	৭২	৭৫২	৩৫৭৮	৪৩৩০	৭১৫ (১৪৩)	১৪১৩ (২৮৩)	২১৬৫ (৪২৬)
২। বিএসকেবি (খুলনা-নড়াইল) -৬০০০	৫৩	১৩৩৯	১৩৯২	১১৭	৮১৬	২০০৫	২৮২১	৭৬৩ (১২৭)	৬৬৬ (১১১)	১৪২৯ (২৩৮)
৩। হালতি নাটোর -১০,০০০	৮৮	১১৯৮	১২৮৬	১৭০	৫৯৮	২১৫৪	২৭৫২	৫১০ (৫১)	৯৫৬ (৯৬)	১৪৬৬ (১৪৭)
৪। গড়ালিয়া যশোহর -১৫০০	*	*	২৯৩	২৯	৩৭০	৬৮	৪৩৮	৩৭০ (২৪৭)	(৬৮**)	১৪৫** (৯৭)
৫। হিলনা নওগাঁ -২০০০	*	*	*	২৯	৩৫০	২৭০	৬২১	৩৫০**	২৭০**	৬২১**

সূত্র ঃ- বিসিএএস, ১৯৯৫ এবং
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯৫।

দ্রষ্টব্য ঃ

* মজুদ পূর্ব বার্ষিক মাছের উৎপাদন নির্ণীত নহে।

** বার্ষিক মজুদপূর্ব উৎপাদন নির্ণীত নহে বিধায় অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমানে হেরফের হতে পারে বা সম্ভব হয়নি।

* সম্ভবত ঃ মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের ফলে অন্যান্য মাছের উৎপাদন বেড়েছে। গড়ালিয়া বিলে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছের পোনার মজুদ হয় না।

বিভিন্ন প্লাবনভূমির স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের পোনা মজুদ কর্মসূচীর প্রভাব

৭ নং ক্রমিক ব্যতীত অন্যান্য ক্রমিকের সব অংক টাকায় দেখানো হয়েছে

উন্নয়ন মাপকাঠি/নির্দেশক	চান্দা বিল	বিএসকেবি বিল	হালতি বিল
১	২	৩	৪
১। ভূ-সম্পত্তি			
-প্রকল্পপূর্ব	৬০,৬৮৮	৭২,৬৪৪	১২১,৮৯৩
-প্রকল্পোত্তর	৬৩,০২০	৮৩,৪৫৮	১২৮,৭৫১
-বৃদ্ধির হার (%)	৪	১১	৬
২। পানি সম্পত্তি			
-প্রকল্প পূর্ব	৩,৮৮১	৫,২০৯	৩,৬৯৮
-প্রকল্পোত্তর	৭,৯৪৬	৬,০২৬	৩,৯৬৭
-বৃদ্ধির হার (%)	১০৪	১৬	৭
৩। অস্থায়ী সম্পত্তি			
-প্রকল্প পূর্ব	২৮০০	৩,০১৬	৪,৫৮০
-প্রকল্পোত্তর	৩৪৫১	৪,০২৩	৫,২১০
-বৃদ্ধির হার (%)	২৪	৩০	১৪
৪। মৎস্য আহরণ যন্ত্রপাতি		১,৩১৬	১,২৩৯
-প্রকল্প পূর্ব	১,৮৯৬		
-প্রকল্পোত্তর	২,১০০	১,৩৪৬	১,২৭৫
-বৃদ্ধির হার (%)	১১	২	৩
৫। পশু সম্পত্তি			
-প্রকল্প পূর্ব	৪,৬৭৮	৫,০৮৬	৪,৪৪১
-প্রকল্পোত্তর	৬,১৩৮	৫,১৩৬	৪,৯৯১
-বৃদ্ধির হার (%)	৩১	১	১২
৬। মাছ হতে বার্ষিক আয়			
- প্রকল্প পূর্ব	১,১২৬	২,৮২২	২,৭৬৩
- প্রকল্পোত্তর	৭,৩২৪	৫,৮১০	৬,৮৪৩
-বৃদ্ধির হার (%)	৫৫০	১০৬	১৪৭
৭। জনপ্রতি দৈনিক মাছ খাওয়ার পরিমাণ(গ্রাম)			
-প্রকল্প পূর্ব	২০.৩০	৫.৬২	৮.৭১
-প্রকল্পোত্তর	৪৮.৭৯	১৮.১১	২৪.৭৬
-বৃদ্ধির হার (%)	১৪০	৫৪	১৭৯
৮। বাসস্থান			
-প্রকল্প পূর্ব	১১,৫৭০	১০,৩৬১	১০,৮৭৭
-প্রকল্পোত্তর	১২,৪৮৭	১১,৫৭৯	১১,১৭৬
-বৃদ্ধির হার (%)	৮	১২	৩

সূত্র ঃ- বিসিএএস, ১৯৯৫।

নোট ঃ-

পরিবার প্রতি লোকসংখ্যার গড় -৬.১ জন
সম্পত্তির মূল্য ১৯৯৪ সালের বাজার দরে টাকায় নির্ণীত।
প্রকল্পপূর্ব = ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর।
প্রকল্পোত্তর = ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বৎসর।

পরিশিষ্ট - ৩

পেশাদার ও অপেশাদার মৎস্য জীবিগণের মধ্যে মৎস্য হতে অর্জিত আয়ের বিতরণ (%)

বার্ষিক আয়	পেশাদার মৎস্যজীবি						অপেশাদার মৎস্যজীবি						মোট			
	চান্দা		বিএসকেবি		হালতি		চান্দা		বিএসকেবি		হালতি		পেশাদার মৎস্যজীবি		অপেশাদার মৎস্যজীবি	
	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর	প্রকল্প-পূর্ব	প্রকল্পোত্তর
১০,০০০/০০ টাকার নীচে	২০.৭	২৭.৩	২৩.৫	৮.৩	৪৬.০	২৫.৯	৭৬.৮	৭৫.৯	৯০.৬	৮০.৮	৮৭.৩	৮৪.৩	২৮.৩	২০.৫	৮৪.৭	৮১.১
১০,০০০/০০ টাকার উর্ধ্বে	৭৯.৩	৭২.৭	৭৬.৫	৯১.৭	৫৪.০	৭৪.১	২৩.২	২৪.১	৯.৪	১৯.২	১২.৭	১৫.৭	৭১.৭	৭৯.৫	১৫.১	১৯.৯
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র ঃ- বিসিএএস, ১৯৯৫

সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক উন্নত মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, উপ-পরিচালক
মাসুদ সিদ্দিকী, উপ-সহকারী পরিচালক

মৎস্য সেক্টরে লক্ষ্য জনগোষ্ঠি বা সুফলভোগী বলতে মৎস্য চাষ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুলতঃগ্রামীণ মৎস্যচাষী এবং উন্মুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলে সম্প্রদায়কে বুঝায়। অপর দিকে উন্নত মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো পুকুর, দিঘী ও বদ্ধ জলাশয় সমূহে আধুনিক উপায়ে মৎস চাষ করা। উন্মুক্ত জলমহাল সমূহে সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণ, প্রাকৃতিক মজুদের উপর নির্ভর না করে বছর ওয়ারী কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত পোনা মজুদকরণ, মৎস চাষ, ও আহরণ সংক্রান্ত সর্বশেষ লব্ধ জ্ঞান মৎসচাষী/সুফলভোগীদের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অবহিতকরণ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তর ক্ষেত্র রয়েছে। বদ্ধ জলাশয়ে যথা দিঘী, পুকুর, বাওড়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যথা- নদী-নালা, খাল-বিল/হাওড়, কাপ্তাই হ্রদ, প্লাবনভূমি ও সামুদ্রিক এলাকা ইত্যাদি মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎসসমূহ। সর্বশেষ জরীপ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ ৪৩.৪০ লক্ষ হেক্টর, তন্মধ্যে প্লাবনভূমিসহ মোট মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং ১.৪০ লক্ষ হেক্টর। উপকূলীয় চিংড়ি খামার ১.৫৩ লক্ষ হেক্টর, পুকুর দিঘীসহ বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ ২.৯৩ লক্ষ হেক্টর। তটরেখাসহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশীয় ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় এবং বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এই বিশাল জলজ ও মৎস্যসম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ ব্যবস্থাপনার সাথে মৎস্যচাষী, জেলে সম্প্রদায়সহ সকল মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠিকে মৎস্য বিভাগের সকল কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জোড়ালো দাবী।

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিগত দশকের অভিজ্ঞতা এই যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রয়োগ উভয়ই দুরহ এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষন বিষয়ে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি সর্বত্র বিফল হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হলেও তা পর্যাপ্ত নয়, বিশ্বজুড়ে এই বাস্তব উপলব্ধি থেকে সাধারণ সম্পদের স্বাভাবিক অধিকার এবং সম্পদ ভোগের জন্য আইনগত অধিকার বিষয়সমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করে একটা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। উনত ও উনয়নশীল বিশের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপক ও পরিকল্পনাকারীদের উপলব্ধি থেকে এই যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, শেষ পর্যায়ে যাদের মঙ্গলের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করার উদ্যোগ চলছে এসব কাজে তাদের সম্পৃক্ত করেই শুধু মৎস্যসম্পদ পরিচালনা সুলভ ও সহজ সাধ্য হতে পারে। তবে এসব *সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনা* বাস্তবায়িত করা বেশ দূরহ- বিশেষ করে সরকার এবং মৎস্যজীবি মহলের মধ্যে অধিকার আর দায়িত্ব বন্টন ক্ষেত্রে। মৎস্যজীবি সমাজের সীমাবদ্ধতা ও সহজাত সমস্যার বিবেচনায় তাদের সংগঠিত করার একটা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের মানভিত্তিক স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্যবিভাগ দেশের বিশাল জলরাশি ও মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টারত। বদ্ধ জলাশয় সমূহে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্য বিভাগ সকল প্রকার কারিগরী জ্ঞান প্রদান করে থাকে। অনাবাদী পুকুর সমূহে আবাদকল্পে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা দূর করে ঐ সকল জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগের কর্মীগণ প্রকল্প প্রস্তুত পূর্বক ব্যাংক ঋণের সুপারিশ করে থাকে। মৎস্য বিভাগের আওতাধীন মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার হতে উৎপাদিত রেণুপোনা সুলভমূল্যে মৎস্য চাষীদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। সফল ও উৎসাহী মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। গ্রাম পর্যায়ে বেকার যুবকদের সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিক মৎস্য চাষে সংগঠিত করে থাকে।

মক্ত জলাশয় উনত পদ্ধতিতে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্পনার ক্ষেত্রে মৎস্য বিভাগ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে সেগুল হচ্ছে ঃ

- মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ;
- প্রাকৃতিক মজুদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বছর ওয়ারী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় সমূহে পোনা মজুদ করা ;
- মৎস্যজীবিদের অধিকারপত্র পদানের মাধ্যমে জলাশয় অধিকার পতিষ্ঠা করা এবং ইজারা পথা বিলোপের মাধ্যমে মধ্যস্তভোগী জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা ;
- মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে মৎস্য সংরক্ষণ আইন করা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা ;
- উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠিকে মৎস্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করার জন্য অবহিত করা ;

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৎস্য বিভাগের অধীনে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের অধীনে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ট্রলার সংস্থা বা যান্ত্রিক/দেশী-মৎস্য নৌযানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করা, ট্রলার সমূহের সমুদ্র যাত্রা আদেশ প্রদান করা এবং তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মৎস্য

আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখা, সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের **সংরক্ষণ** ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ড সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মৎস্য বিভাগের অধীনে সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন ও জরীপ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও পরিবেশের উপর বিস্তারিত গবেষণা ও সামুদ্রিক মৎস্য মজুদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এসকল কর্মকান্ড ছাড়াও মৎস্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প ভিত্তিক সুফলভোগীদের নির্ধারণ করে মৎস্যসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারী পর্যায়ে মৎস্য বিভাগের এসকল কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্ব প্রদান করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করাও দরকার। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে পারিপার্শ্বিকতা ও সম্পৃক্ত করলেই কি মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ? এসব প্রশ্নের যে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার আছে তা বলার অবকাশ রাখেনা। প্রসঙ্গতঃ জলমহালের ন্যায় সাধারণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পদের সুষম বন্টন এর পাশাপাশি পরিবেশগত ভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরূপণ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যেহেতু মৎস্যসম্পদ এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির অধিকাংশই নিরক্ষর ও সামাজিক ভাবে অনগ্রসর এ মূহূর্তে বিভাগীয় কর্মকান্ডের সাথে এককভাবে তাদের সম্পৃক্ত করলেই ইস্পিত ফল লাভ করা দুরহ হয়ে পড়বে।

বাস্তবতার এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের অবদান নিশ্চত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ছাড়াও যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা এক্ষেত্রে কার্যকর ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মৎস্যসম্পদ ও জলমহাল ব্যবস্পাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীর ইজারা প্রথা বিলোপ ঘটিয়ে সুফলভোগী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অধিকার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ***নয়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি*** প্রবর্তন করে। এই নীতিমালার কার্যকারিতা ও উপযোগীতা যাচাইয়ের জন্য সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও ইকলার্মের কারিগরী সহায়তায় দুই বৎসর মেয়াদী (১৯৮৭-৮৯) একটি পরীক্ষামূলক করিগরী প্রকল্প (মুক্ত জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প) গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবর্তন ঘটিয়ে ইজারা প্রথার পরিবর্তে মাছ ধরার প্রত্যক্ষ অধিকার প্রদান করা হয় প্রকৃত জেলেদের অধিকারপত্র বিতরনের মাধ্যমে। পরীক্ষাধীন নয়া জলমহাল ব্যবস্পাপনা সমীক্ষায় দেখা যায় অধিকারপত্র পাপ্ত মৎস্যজীবিদের আয় ২৫% থেকে ৫০% বৃদ্ধি হয়েছে এবং তার পাশাপাশি সনাতন পদ্ধতিতে আয় কম হচ্ছে।

এই পরীক্ষমূলক প্রকল্পের সুপারিশ অনুযায়ী নয়া নীতিমালার অধীনে দ্বিতীয় পর্যায়ে ***মুক্ত জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় ধাপ)*** গ্রহণ করা হয় (১৯৯১-৯৫)। এই ধাপে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে (এন. জি. ও) জড়িত করা হয়। উক্ত প্রকল্পে ২৬টি জলমহালে বিভিন্ন পরিবেশে অধিকারপত্র বিতরণের মাধ্যমে বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে কাজ আরম্ভ করে। সুফলভোগীদের সুবিধার্থে উল্লেখিত প্রকল্পে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে ঃ

* বিভিন্ন পরিবেশের জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বাছাই করা হয়।

* মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয় যাতে তারা মাছের সংরক্ষণ, মৎস্য আইন এবং মাছ ধরার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লব্ধ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র তাদের আওতাধীন তিনটি জলমহালে ৫২৫ জন মৎস্যজীবিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং মৎস্য অধিদপ্তর উক্ত জলমহালের ১৩১ জন মৎস্যজীবিকে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

* প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার পন্থা বাহির করা এবং পরীক্ষামূলক জলমহালে অধিকারপত্র পাপ্ত মৎস্যজীবিদের ঋণ দেয়া। উল্লেখ্য যে, বাংলার হাওড় জলমহালে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এফ.আই.ভি.ডি.বি.) ১০৪ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ৭,৭১,০০০- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। প্রশিকা মানবিক উনয়ন কেন্দ্র তাদের তিনটি জলমহালের ৯০০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ২৩,৬৬,৫০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

* জাতীয় পর্যায়ে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরী করার ক্ষেত্রে সরকারকে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা। এরই আলোকে প্রকল্পে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ উলেখিত বিষয়ের উপর নীতিমালা পণয়ন করেন যা বাস্বায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

* রাজস্ব আদায়ের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান করা। এই আলোকে বলা যেতে পারে যদিও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন জলমহাল ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের প্রচলিত ব্যবস্থায় মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পরিবর্তে রাজস্ব আদায়ই মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। নূতন নীতিমালার আওতায় জলমহালে রাজস্ব বিগত ৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং আদায়ের হারও সন্তোষজনক (পকল্পাধীন ২৬টি জলমহাল সহ সর্বমোট ২৫৭টি জলমহালে নির্ধারিত রাজস্ব ৫২৫.০৯৪ লক্ষ টাকা ও আদয়কৃত রাজস্ব ৪০৭.৪৫৫ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব আদায়ের শতকরা হার ৭৮%)।

পতিত পুকুর সমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি পুকুর আবাদ যোগ্য পড়ে আছে অথচ এখানে মাছচাষ হচ্ছেনা এর পিছনে কারণ খুজতে গেলে দেখা যায় যে, গ্রাম বাংলার অধিকাংশ পুকুর একাধিক মালিকানাধীন। উপরোক্ত মৎস্য চাষের জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন, অর্থনৈতিক কারণে কেউ এককভাবে তা বহন করতে পারছেনা। এক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী একাধিক মালিককে

মৎস্যচাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজন মৎস্যকর্মী যতটা না উপযোগী হবেন, তার চেয়ে বেশী ফলপ্রসু অবদান রাখতে পারবেন একজন সমাজকর্মী। ঐক্যমত পতিষ্ঠার পর বিনিয়োগের সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে পারে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান যথা ব্যাংক, অথবা কোন এন.জি.ও। ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগ নিশ্চিত হওয়া ইত্যাদির পর আসবে মৎস্যচাষের জন্য মৎস্য বিভাগের কারিগরী সহায়তা প্রদান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে সুফলভোগী অর্থাৎ পুকুর মালিকদের মৎসসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য মৎস্য বিভাগীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি তাদেরকে অর্থ বিনিয়োগ, নিরক্ষরতা দরীকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করার প্রয়োজন আছে।

একটা সময় আসবে যখন এই সকল আপাত দূরহ কাজ সমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তখনই অজিত হবে সফলভোগীদের পকত অংশীদারিতের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা।

সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য *কমিউনিটি বেসড ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার ফিসারীজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভলেপমেন্ট প্রোগ্রাম* শীর্ষক একটি কারিগরী প্রকল্প বর্তমানে অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি কাঠামো উদ্ভাবন করা যা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন এবং একই সাথে বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ে ও প্লাবন ভূমিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্যসম্পদ আহরণ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহণে ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের বিষয়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদন ও গ্রহণের সুপারিশ রাখবে। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প এর লক্ষ্য থাকবে ঃ

* মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন ;
* জলাশয় ব্যবহারে অধিকার এবং মৎস্যসম্পদ আহরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা চিরাচরিত ব্যবস্থা এবং বাস্তবিদ্যা (ইকোলজি) সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ;
* মৎস্যজলা ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা বিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থা সমূহের তুলনামূলক কার্যকারিতা যাচাইকরণ এবং সামাজিক অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ, মৎস্য আহরণ চাপ হ্রাসকরণের বিষয়ে কর্মসূচী উদ্ভাবন ;
* প্রকল্পের আওতাধীন বিষয় সমূহ কারিগরী সহায়তা প্রদান, দিক নির্দেশনা ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা জোরদারকরণ।

পতিত পুকুর সংস্কার করে
মাছের আবাদ করুন
তাতে খাদ্য অর্থ দু'ই পাবেন

ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনা

ডঃ জি.সি. হালদার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মেঃ শহীদুল্লাহ মিয়া, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। একক প্রজাতি হিসাবে ইলিশ সর্ববৃহৎ এবং সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২০-২৫ ভাগ ইলিশ মাছের অবদান। এছাড়া এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২ ভাগেরও বেশী লোক জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ইলিশ মাছের প্রাপ্যতার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অতীতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ ইলিশ মাছ পদ্মা ও মেঘনা নদী সহ দেশের বিভিন্ন নদ-নদী হতে এবং মাত্র শতকরা ৫ ভাগ সমুদ্র হতে আহরিত হতো। কিন্ বর্তমানে শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ ইলিশ মাছ সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা হতে এবং মাত্র শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ বিভিন্ন নদ-নদী হতে আহরিত হচ্ছে। ইলিশ মাছের সামগ্রিক উৎপাদন অতীতের তুলনায় বর্তমানে হ্রাস না পেলেও যে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খুবই নগন্য। বর্তমানে যেভাবে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পরিবেশগত পরিবর্তন হচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র এবং পরিভ্রমন পথের আরও বেশী পরিবর্তন ও নষ্ট হবে। জাটকা নিধনসহ ইলিশ মাছের আহরণ মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী বছরগুলোতে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাবে। কাজেই এ মাছের আহরণ মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনা জরুরী ভাবে আবশ্যক। ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনার জন্য এ মাছের জীবনচক্র, বিস্তৃতি, প্রজনন, কিশোর ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র, স্টক নিরুপন ও প্রাকৃতিক মজুদ নিরুপন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারনা আবশ্যক। বর্ণিত বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ইলিশ মাছের ভৌগলিক বিস্তার

বাংলাদেশ সহ পাক ভারত উপমহাদেশের আরো কয়েকটি দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান এবং মায়ানমারে এ মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর, আরব সাগর, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত এ মাছের বিস্তৃতি। তবে প্রকৃতিগত ভাবেই বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারেই এ মাছ সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মাছ ধরা পড়ে।

ইলিশ মাছের জীবন চক্র ও বৈশিষ্ট্য

অভিপ্রয়ান ঃ এ মাছের জীবন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচিত্রময়। ইলিশ দেশান্তর প্রকৃতির। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উজান স্রোতে সাঁতার কেটে চলে। খাদ্য ও প্রজননের জন্য ইলিশ মাছ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সাগর হতে নদীর মোহনা বেয়ে উজান স্রোত ধরে নদীতে অভিপ্রয়ান করে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে ডিম ছাড়ার পর এরা আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। অপরদিকে ইলিশের রেনু জাটকাতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত (অনধিক ৫-৬ মাস বয়স পর্যন্ত) নদ-নদী ও মোহনায় অবস্থানের পর যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এরাও সমুদ্রে অভিপ্রয়ান করে। পরিপক্কতা লাভের পর একই নিয়মে প্রজননের জন্য এরা পুনরায় সমুদ্র থেকে নদ-নদীতে আসে। বিভিন্ন পরিবেশে ইলিশ মাছের পরিভ্রমন প্রক্রিয়া নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো ঃ

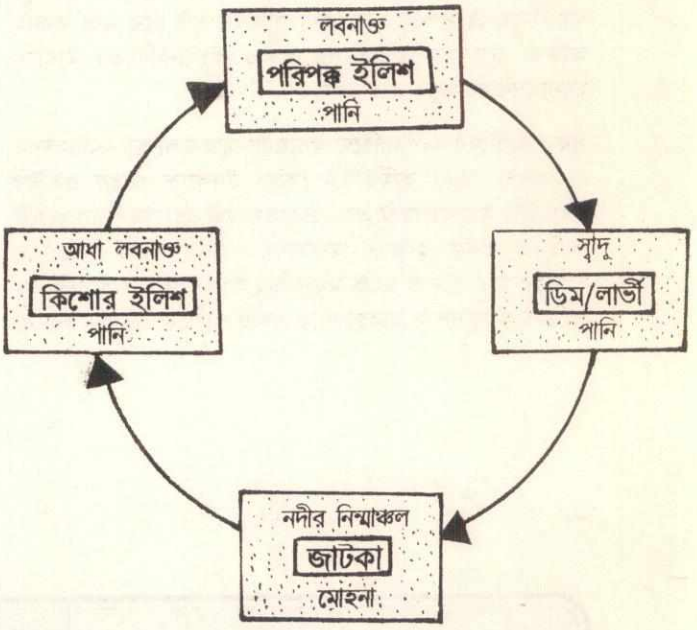

চিত্র ঃ ইলিশ মাছের পরিভ্রমন প্রক্রিয়া।

ইলিশ মাছের পরিপক্কতা ও প্রজনন মৌসুম ঃ ইলিশ কুলে স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার মাছই বিদ্যমান। তবে স্ত্রী মাছের চেয়ে পুরুষ মাছের সংখ্যা বেশী। পুরুষ ও স্ত্রী মাছের অনুপাত ১ঃ০.৯। স্ত্রী ইলিশ মাছ পুরুষ ইলিশ মাছের চেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং আকার বড় হয়। ইলিশ সাধারণতঃ এক বছর বয়স হতে পরিপক্কতা লাভ করে। আকার ভেদে এদের ডিম ধারণ ক্ষমতার তারতম্য ঘটে থাকে। একটি বড় অকারের ইলিশ সর্বোচ্চ ২০-৩০ লক্ষ ডিম ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে এ মাছ প্রায় সারা বৎসরই কমবেশী ডিম পাড়ে এবং দেশের বিভিন্ন নদ-নদী, সাগর মোহনায় প্রায় সারা বৎসরই কমবেশী পরিপক্ক ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। তবে বছরের দু'টি বিশেষ সময়ে যথা ঃ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এবং জানুয়ারী হতে মার্চ মাসে পরিপক্ক ইলিশের প্রাপ্যতার হার সবচেয়ে বেশী। উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে ইলিশ মাছের

পজনন কালকে ২টি পধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ

গ্রীষ্মকালীন প্রজনন কাল -- জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।

শীতকালীন প্রজনন কাল -- জানুয়ারী হতে মার্চ পর্যন্ত।

প্রজনন ক্ষেত্র ঃ পরীক্ষামূলক মাছ ধরার সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চলে বিশেষ করে হাতিয়া, সন্দিপ ও মনপুরার কালিরচর নামক স্থানে জীবিত স্ত্রী মাছের পেট থেকে অনবরত ডিম বের হতে দেখা যায়। এছাড়া ঐ সময় উল্লেখিত এলাকাতে প্রচুর পরিমানে ডিমওয়ালা ইলিশ ও শুক্রানুসহ পুরুষ ইলিশ এবং প্রজননোত্তর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। এরূপ অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত এলাকা ইলিশ মাছের একটি বৃহৎ প্রজনন ক্ষেত্র। বাংলাদেশের অন্য কোন এলাকায় বা শীতকালীন প্রজনন মৌসুমে অনুরূপ অবস্থা কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

কিশোর ইলিশের (জাটকা) বিচরণ ক্ষেত্র ঃ কিশোর ইলিশই *জাটকা* নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ৪-১৫ সেঃমিঃ আকারের ইলিশকে জাটকা বলা হয়। জাটকা দেখতে অনেকাংশ চাপিলা মাছের মত। বাংলাদেশে জাটকার বিস্তৃতি ব্যাপক। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা সহ বিভিন্ন নদ-নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় জাটকা বিচরণ করে এবং তথায় খাদ্য গ্রহণ করে বড় হয়। পরিচালিত গবেষনায় এ পর্যন্ত কিশোর ইলিশের (জাটকার) দু'টি বৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্র সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যথা ঃ

— সর্ব বৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্রটি মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চাঁদপুর নীলকমল হয়ে হাজীমারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

— অপর বিচরণ ক্ষেত্রটি খুলনা জেলার দুবলার চর থেকে পটুয়াখালি জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত।

নিম্নে মানচিত্রে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র ও জাটকার বিচরণ ক্ষেত্র দেখানো হলো ঃ

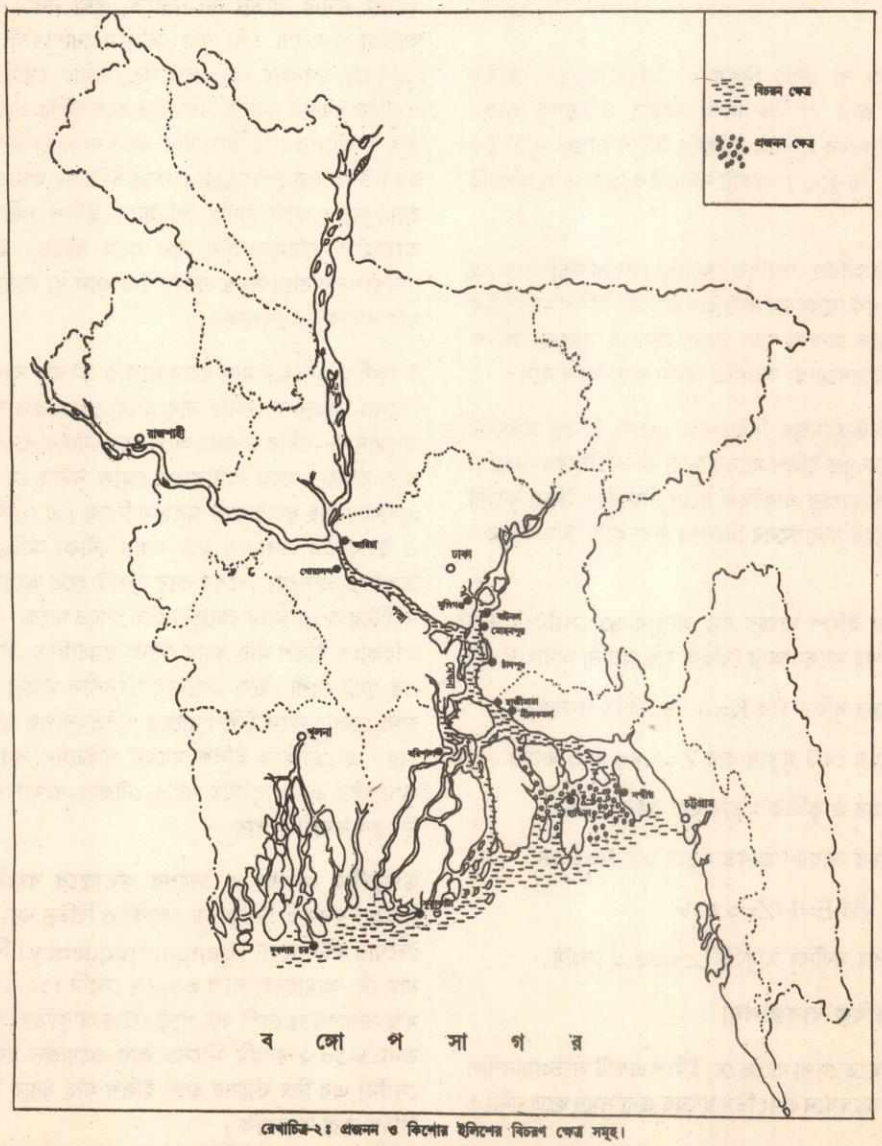

রেখাচিত্র-২ঃ প্রজনন ও কিশোর ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র সমূহ।

জাটকা ধরার মৌসুম ঃ জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস। ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে ১৯৯২-৯৪ সালে পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকা এবং উপকূলীয় এলাকা থেকে জগৎ বের জাল, কারেন্ট জাল ও অন্যান্য জালের সাহায্যে প্রতি মৌসুমে গড়ে প্রায় ৩,৭০৭ টন জাটকা ধরা হয়েছে, সংখ্যাগত ভাবে যার পরিমাণ ৪৬৩ মিলিয়ন। ধৃত জাটকার গড় দৈর্ঘ্য ৭.৩ সেঃমিঃ এবং গড় ওজন ৮.০ গ্রাম। ধৃত জাটকার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই ধরা পড়ে মার্চ মাসে। মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশী পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। ধৃত জাটকার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ধরা পড়ে জগৎ বের জালে, ৪০ শতকরা ভাগ ধরা পড়ে কারেন্ট জালে এবং শতকরা ১০ ভাগ ধরা পড়ে অন্যান্য জালে।

জরীপে আরও দেখা যায় যে, প্রতি বছর যে পরিমাণ জাটকা ধরা পড়ে এর শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগও বাঁচানো সম্ভব হলে দেশে আরো প্রায় ১-১.৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন সম্ভব। উক্ত পরিমাণ ইলিশের বর্তমান বাজার মূল্য (৫০ টাকা/কেজি) প্রায় ৫০০-৭৫০ কোটি টাকা।

ইলিশ মাছের স্টক বা জাত নির্ণয় ঃ ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনার জন্য জাত বা ষ্টক নির্ণয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ইলিশ মাছের দু'টি ষ্টক সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঃ একটি নদীর ষ্টক/রেস এবং অপরটি সমুদ্রের ষ্টক/রেস।

নদীতে ইলিশ মাছের আরও একাধিক ষ্টক/রেস থাকার সম্ভাবনা আছে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষনার প্রয়োজন রয়েছে। ইলিশ মাছের ষ্টক বা রেস সঠিক ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হলে এ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনায় এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে।

ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মজুদ নিরুপণঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বাসস্থান থেকে ধৃত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষন করে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মজুদ নিরুপণে ইলিশ কূলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহের ফলাফলের নিরুপণ করা হয়। উক্ত ফলাফল সমূহ নিম্নরূপ ঃ

* খুবই বয়স্ক ইলিশ মাছের গড় আকার-৬১ সেঃমিঃ। উক্ত আকারের পর মাছের আর দৈহিক বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ K=0
* ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার K=০.৭৪০ প্রতি বৎসর
* ইলিশ মাছের মোট মৃত্যুর হার Z=২.৪০ প্রতি বৎসর
* ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুর হার M= ১.১৬
* ইলিশ মাছের আহরণ জনিত মৃত্যুর হার F=১.২৪
* আহরণের হার E=F/Z=০.৫১৮
* ধৃত ইলিশের সর্বনিম্ন আকৃতি Lc=৩৫.০ সেঃমিঃ

ইলিশ মাছের জৈবিক ব্যবস্থাপনা

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, ইলিশ একটি অভিপ্রয়ানশীল মাছ। এরা খাদ্যের অন্বেষনে এবং ডিম ছাড়ার জন্য সমুদ্র হতে নদীতে অভিপ্রয়ান করে এবং দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে খাদ্য গ্রহণ ও প্রজনন করে। কিশোর ইলিশ ৫-৬ মাস বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন নদ-নদী ও মোহনায় অবস্থানের পর পুনরায় সমুদ্রে অভিপ্রয়ান করে। সমুদ্র হতে নদীতে অভিপ্রয়ান কালীন সময়ে, প্রজননকালীন সময়ে এবং কিশোর ইলিশের (জাটকার) চারণ কালীন সময়ে বাংলাদেশে ইলিশ ও জাটকা ধরা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইলিশ মাছের সুষ্ঠু জৈবিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য্য।

অভিপ্রয়ান পথ মুক্ত রাখা ঃ বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ধরার সময় বিভিন্ন ইলিশের মুক্ত পরিভ্রমন পথ বন্ধ করা হয় বা বাঁধার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত পন্যায় ইলিশ মাছের পরিভ্রমন পথ মুক্ত রাখা যেতে পারে তার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি সমূহ প্রধান। যথা ঃ

নদীতে আড়াআড়ি স্থাপিত বাধ জাল বা গাড়া জাল নিয়ন্ত্রণ করণ ঃ গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ ভাবে শুষ্ক মৌসুমে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা ও মুলাদী থানার বিভিন্ন নদ-নদীতে, পদ্মা নদীর মাওয়া, ভাগ্যকুল, আরিচা এলাকায় এবং বর্ষা মৌসুমে নোয়াখালী জেলার রামগতি, কালিগঞ্জ এলাকায় এবং লক্ষীপুর জেলার হাজিমারা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদীতে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আড়াঁআড়ি বাঁশ ও জালের বেড় দিয়ে বাঁধ জাল বা গাড়া জাল দিয়ে ইলিশ ধরা হয়। উপরোক্ত উপায়ে ধরার ফলে ইলিশের অভিপ্রয়ান পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পর্যাপ্ত পরিমানে ইলিশ নদীর উপরের অংশে আহরণের পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইলিশ মাছের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সমস্ত প্রকার বাঁধ জাল বা গাড়া জাল দিয়ে ইলিশ ধরা বন্ধ করা আবশ্যক।

উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার জাল ও নৌকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করণ ঃ দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার ফলে ইলিশ মাছের অবস্থান নদ-নদীর উপরের অংশ হতে মোহনা এবং উপকুলে দিন দিন সরে যাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ জেলে নদীর মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার জন্য অবস্থান নিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে নদীর মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার নৌকা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখিত এলাকায় বিশেষ করে জুলাই হতে অক্টোবর মাসে প্রতি ৫-৭ মিটার অন্তর অন্তর জেলেরা জাল পেতে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় অধিকাংশ ইলিশ মাছ ধরার নৌকা যন্ত্রচালিত এবং জালের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ খুবই বেশী। উক্ত এলাকায় সহনশীল মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী জাল ফেলার ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমন পথ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে ইলিশ মাছের পরিভ্রমন পথ মুক্ত রাখার জন্য উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার নৌকার সংখ্যা ও জালের পরিমান নিয়ন্ত্রন করা আবশ্যক।

উপকূলীয় এলাকা ও দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ করণ ঃ উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন নদ-নদীতে ধৃত মাছের দৈঘ্যের ঘটনসংখ্যা (Length frequency) বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ৩০-৪৭ সেঃমি (১২-১৯ ইঞ্চি) আকারের মাছ সাধারণতঃ বেশী ধরা পড়ে। উক্ত আকৃতির (দৈর্ঘ্যের) মাছ ধরার জন্য ৯-১০.২ সেঃমি ফাঁসের জাল প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে ৯ সেঃমিঃ এর নিম্ন ফাঁসের জাল ইলিশ মাছ ধরার নিমিত্ত সমগ্র দেশে নিষিদ্ধ করা আবশ্যক।

দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা নিয়ন্ত্রণ করণ ঃ ভারতের গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা নামক স্থানে বাধেঁর ফলে পদ্মা নদী ও এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার নাব্যতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য নদ-নদীও উজান হতে পরিবাহিত পলি জমে নদীগুলো দিন দিন নাব্যতা হারাচ্ছে। ফলে ইলিশ মাছের অনেক প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ঠ হচ্ছে এবং বিচরণ ক্ষেত্র দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। ইলিশ মাছ সাধারণতঃ প্রবল স্রোতে ও গভীর নদ-নদীতে অভিপ্রয়ান করে থাকে। এভাবে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ক্রমাগত ভরাট হতে থাকলে এবং পানি প্রবাহ হ্রাস পেতে থাকলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথও দিন দিন ছোট হতে থাকবে। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় ইলিশ মাছ একসময় নদ-নদীর মোহনা হতে সুদুর ১৩০০ কিঃমিঃ দূরবর্তী গঙ্গা নদীর আগ্রা এবং দিল্লি পর্যন্ত এবং ব্রক্ষপুত্র নদীর তেজপুর (বাংলাদেশ বর্ডার হতে ৩০৬ কিঃমি) পর্যন্ত অভিপ্রয়ান করত। তাই ইলিশ মাছের মুক্ত পরিভ্রমণ পথ বন্ধ হলে একদিকে যেমন এর উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে অন্যদিকে অধিকতর নাব্য অংশে (যেমন ভারত বা মায়ানমারের বিভিন্ন নদ-নদীতে) এ মাছের অভিপ্রয়ানের সম্ভাবনা আছে বলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাই ইলিশ মাছের উৎপাদন অক্ষুন্ন তথা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী।

সর্বোচ্চ প্রজনন কালে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করণ ঃ আমাদের দেশে ইলিশ মাছের শীতকালীন এবং গ্রীষ্ম কালীন দু'টি প্রধান মৌসুম রয়েছে। উক্ত দু'টি প্রজনন মৌসুমের মধ্যে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে হাতিয়া ও সন্দীপ ও মনপুরার কালিরচর নামক স্থানে ইলিশ মাছ সর্বোচ্চ পরিমানে প্রজনন করে থাকে। কিন্ত উল্লেখিত প্রজননকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে ইলিশ মাছ ধরার ফলে তাদের প্রজনন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষিতে ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের জন্য বর্ণিত স্থানে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে ইলিশ মাচের প্রাকৃতিক মজুদ প্রক্রিয়া আবাধ ও অব্যাহত থাকবে। ফলশ্রুতিতে দেশের ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

জাটকা নিধন রোধ করণ ঃ মৎস্য গবেষনা ইনষ্টিট্যুট, নদী কেন্দ্র চাদঁপুর হতে পরিচালিত গবেষনার মাধ্যমে মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চাঁদপুর, হাজিমারার নীলকমল অংশে এবং উপকূলীয় এলাকায় দুবলারচর হতে কুয়াকাট পর্যন্ত জাটকা মাছের দু'টি বৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় যথাক্রমে ডিসেম্বর-মে মাসে এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন জাল দিয়ে ব্যাপক ভাবে জাটকা ধরা হয়। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মজুদ প্রক্রিয়া অবাধ ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বর্ণিত এলাকায় জাটকা ধরা বন্ধ করা আব্যশক। কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করার জন্য উক্ত এলাকাকে জাটকা মাছের অভয়-আশ্রম হিসাবে ঘোষনা করা হলে দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাবে অপর পক্ষে প্রাকৃতিক মজুদ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

উপসংহার ঃ

পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহে ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র চিরতরে হারিয়ে গেছে এবং এ মাছের অবস্থান ক্রমাগত সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছে। অপর পক্ষে ইলিশ একটি দেশান্তর প্রকৃতির মাছ বিধায় বিভিন্ন নদ-নদীতে আড়াআড়ি বাধ দিয়ে এ মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতি বৎসরই মেঘনা নদী ও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন জাটকা ধরার ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মজুদ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। উপরোক্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে আগামীতে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এ প্রেক্ষিতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও তার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

কারেন্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ
এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন
পোনা মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দিন

সেচ প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন

কে, ইউ, এম সহিদুর রহমান, উপ-পরিচালক,
ডঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক,

ভূমিকা

নদী মাতৃক বাংলাদেশ। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, দিঘী আর পুকুর। ঐ সমস্ত জলাশয়ের সম্মিলিত আয়তন ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টরের কিছু বেশী। জাতীয় অর্থনীতি, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় আয়ের ৪.৭ ভাগ এবং কৃষি সম্পদের ১০ ভাগ আসে মৎস্য সেক্টর থেকে। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা দেখা দেয়। দেশের দক্ষিণে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর থেকে আসা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বড় দুর্যোগের কারণ। এ সকল দুর্যোগের ফলে প্রতি বৎসরই ব্যাপক প্রাণহানী, শস্যহানী ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। বন্যা জলোচ্ছাসের কারণে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বন্যার প্রকোপ হতে কৃষি জমি রক্ষা করা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণসহ পানি নিস্কাশন ও সেচ সুবিধা গড়ে তোলা হয়েছে এবং বহু সংখ্যক প্রকল্প বাস্বায়নাধীন রয়েছে। বাস্বায়নের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প। ১৯৮৯ সন পর্যন্ত প্রায় ৩১ লক্ষ হেক্টর জমি এই কার্যক্রমের আওতাভূক্ত হয়েছে।

মৎস্য সম্পদের উপর বাঁধের প্রভাব

দেশের সামগ্রিক আমিষ জাতীয় খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগের উৎস্য হচ্ছে মৎস্য, এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও মৎস্য উপ-খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনের সিংহভাগ আসে উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণশীল মাছ আহরণের মাধ্যমে। উন্মুক্ত জলাশয় বিশেষ করে প্লাবনভূমি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, প্রবৃদ্ধি ও বিচরণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ/পানি নিস্কাশন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পরিবেশের বিরাট পরিবর্তনের বিষয়টি ইতোপূর্বে বিবেচনায় আনা হয়নি। সঞ্চারনশীল নদী-নালার সাথে অভ্যন্তরীণ নিম্নাঞ্চল জলাশয়, বিল, হাওড়, বাওড় ইত্যাদিতে পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে একদিকে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও প্রবৃদ্ধি চক্র বিনষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে প্লাবন ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। বিগত ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৮ লক্ষ হেক্টরের অধিক আয়তনের প্লাবনভূমি তথা মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়েছে। ফলে গত পাঁচ বৎসরের হিসাবে দেখা গেছে গড়ে প্রায় প্রতি বছর ১০ হাজার টনেরও অধিক মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, যার মূল্য নূন্যপক্ষে চল্লিশ কোটি টাকা। সম্প্রতি পরিচালিত ফ্লাড এ্যাকশন প্লান (ফ্যাপ) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হ্রাসের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্যে আমিষ ঘাটতি বেড়েছে, আয় কমেছে এবং কর্মসংস্থানের পথ সংকুচিত হয়েছে। এছাড়াও ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার ফলে অনেক চারণভূমি নিঃশেষ হয়ে গেছে যার ফলে গবাদিপশুর চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রাণীজ সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ নেহাতই কম নয় আর পরিবেশ পরিবর্তনের হিসাবটা যোগ করলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করাটাই দূরহ হয়ে পড়বে। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড বিধায় কৃষি খাতের অন্তর্ভূক্ত মৎস্য উপ-খাতের এই ক্ষতিপূরণের জন্য পরিপূরক কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিস্কাশনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল নতুন প্রকল্পে পানি সম্পদের উপর নির্মিতব্য অবকাঠামোর প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা ও ক্ষতির পরিমাণ নূন্যতম পর্যায়ে রাখা অথবা বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা, সম্পদ রক্ষা এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষ সহ বহুবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে ১৯৯০ সনে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সরকারী কর্মসূচী

যদিও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনস্বীকার্যভাবে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে তবুও সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সৃষ্ট জলাশয়ে নিবিড় মৎস্য চাষের নুতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল জলাশয়ে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাই, অনায়াসে সারা বৎসর মৎস্য চাষ করা যায়। হাঁস-মুরগী পালন, হাঁস-মুরগীর সাথে সমন্বিত মৎস্য চাষ, ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, উন্নত জাতের ঘাস চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রীক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহু সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠির সকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করা সহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন "বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প" নামে ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প ১৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৮টি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকার ১৫,৫২০ হেক্টর বরপিট, খাল, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে খনন, পুনঃখনন ও সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী করে সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেচ প্রকল্প এলাকায় বরপিট, খাল ইত্যাদি খনন, পুনঃখনন ও সংস্কারের কার্যক্রম বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকায় মাছ, গবাদি-পাশু, হাঁস-মুরগী, উন্নত জাতের ঘাস চাষের সমন্বিত কার্যক্রম স্থানীয় ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক, ও মহিলাদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রুপ করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের মৎস্য চাষ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বরপিটে মাছের পোনা প্রতিপালন ও মাছ চাষ, পুকুরে মাছ চাষ, খালে মাছ চাষ, বদ্ধ

নদীতে মাছ চাষ, সমন্বিত মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পেনে ও খাঁচায় মাছ চাষ। উপরোক্ত কার্যক্রমে প্রদর্শনী খামার সৃষ্টি সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও প্রথম বছর প্রদর্শনীতে উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ণের পর প্রকল্পভূক্ত প্রতিটি সুফলভোগী দল বা সমবায় প্রকল্প পরিচালনার সকল ব্যয় বহন করবে এবং সব সুবিধাদী ভোগ করবে।

এই প্রকল্পে পশুসম্পদ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন, ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, বাঁধের দুই ধারে উন্নত জাতের ঘাস যেমন নেপিয়ার, প্যারা, জার্মান, গিনি চাষ সহ প্রদর্শনী খামার স্থাপন।

সমাপ্তির পর প্রকল্পাধীন জলাশয় থেকে বছরে ১২,১০০ মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হবে যার বাজার মূল্য হবে প্রায় ৩৬ (ছত্রিশ) কোটি টাকা। আর হাঁস-মুরগী, গরু, ছাগল, ঘাস, ফল তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপাদনের ফলে বছরে ৮ (আট) কোটি টাকা আয় হবে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কালে ১৫,৬০০ জনের পূর্ণকালীন ও ৪৭,০০০ জনের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান এর সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীত সংস্কার/খনন/পূনঃখনন কর্মসূচীতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের আংশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ মহিলাদের জাল বুনন ও মেরামত, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ (শুটকি), হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন, গরু-ছাগল পালন, শাক-সব্জি, ফলমূল লাগানো, রক্ষণাবেক্ষণে কর্মসংস্থান করা যাবে ফলে অবহেলিত দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

সেচ প্রকল্প এলাকার জলাশয়গুলি বর্তমানে কচুরী-পানা এবং অন্যান্য জলজ আগাছায় পূর্ণ থাকায় এগুলি মশা-মাছির বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রকল্পাধীন এলাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তাবয়ন করার ফলে মশার উপদ্রব কমবে এবং ঘাস ও বৃক্ষ রোপনের ফলে পরিবেশের আরো উন্নতি সাধিত হবে।

ইতোমধ্যেই উল্লেখিত কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। মাছ চাষ উপযোগী চিহ্নিত প্রায় ৩,৪০০ হেঃ জলাশয়ের মধ্যে প্রায় ৪৩০ হেঃ জলাশয় বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমে সংস্কার সাধন করে পরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষের আওতাধীন আনা হয়েছে এবং প্রায় ছয়শত গ্রুপে তের হাজারের ও অধিক সুফলভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আটশত পনের হেক্টর জলাশয় চারশ উনষাটটি গ্রুপের প্রায় নয় হাজার সাতশত সুফলভোগীর নিকট দীর্ঘ মেয়াদে ইজারার বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প ভূক্ত প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত জনকে মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করাা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে মাছ চাষের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রদর্শন সহ অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিস্কাশন, ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মাছ চাষের উপযোগী যে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বরপিট, বদ্ধ নদী, সেচ খাল অন্যতম। এ সমস্ত জলাশয় থেকেও অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

বরপিটে মাছ চাষ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের সৃষ্ট বরপিটগুলো বর্তমানে প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন কোন বরপিটে অবশ্য প্রাকৃতিক ভাবে কিছু মাছের বংশ বৃদ্ধি ঘটে যা দরিদ্র জনগণ আহরণ করে থাকে। এই বরপিটগুলো মাছের পোনা ও দ্রুত বর্ধনশীল মাছ উৎপাদনের একটি চমৎকার ক্ষেত্র হতে পারে। বরপিটগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এর পর মাছ চাষ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ১.২৫ মিলিয়ন পোনা উৎপাদন করা সম্ভব। দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি পাঁচ টনের অধিক মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে বরপিটগুলি খনন/পূনঃখনন সংস্কার করে মাছ চাষের উপযুক্ত করা সম্ভব।

পুকুরে মাছ চাষ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুকুরগুলিতে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। বন্যায় এ সকল পুকুর প্লাবিত হয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতো বলে পুকুরের মালিকগণ সাধারণতঃ মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতেন না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের পর পুকুর প্লাবিত হয়ে যাবার আশংকা না থাকায় পুকুরগুলিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ সকল পুকুর থেকে বছরে হেক্টর প্রতি ৫ টনেরও অধিক মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের ভিতরের জলাশয় রুই জাতীয় মাছের পোনা স্বাভাবিক উপায়ে পাওয়া যায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সংখ্যক বরপিটে/পুকুরে রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করে অনায়াসেই মাছ চাষীদের নিকট সহজলভ্য করে তোলা সম্ভব হবে।

খালে মাছ চাষ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের ভিতরের এলাকা প্লাবনমুক্ত থাকে। খালগুলি পানি সেচ ও নিস্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেচ কার্যক্রম সুবিধা অপরিবর্তীত রেখে ঐ সমস্ত খালে মৎস্য চাষ উপযোগী পানির উচ্চতা রক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করা সম্ভব। স্থানে স্থানে বাঁশের তৈরী বা জালের বেউ তৈরী করে পেনে মাছ চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে হেক্টর প্রতি দুই থেকে চার টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

বদ্ধ নদীতে চাষ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ফলে অনেক নদী বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের ডাকাতিয়া নদীর পাবনা সেচ প্রকল্পের ইছামতি নদী, গংগা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের কুমার নদী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডারে এই ধরনের শতশত নদী বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করে অধিক মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

উপসংহার

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মৎস্য সম্পদের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে সেগুলো উত্তরণের সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশে প্রাপ্ত সম্পদের সুষম ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে প্রকল্প এলাকায় একদিকে যেমন শষ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এগিয়ে যাবে তেমনি বিপুল পরিমাণ মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে আমিষের ঘাট পূরণ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি দেশে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

পার্বত্য জেলা সমূহে মাছ চাষের সম্ভাবনা

আব্দুল মতিন
প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাহাড় ঘেরা আর গাছ-গাছালিতে ছাওয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছুয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি আর বান্দরবন জেলা সমূহের বিস্তৃতি। মগ, মারমা, চাকমা সহ বহু উপজাতির বাস এই পাহাড়ী জেলা তিনটিতে। ফেণী, কর্ণফুলি, সাংগু আর মাতামুহুরী এবং তাদের শাখা উপ-শাখা দ্বারা এই অঞ্চলটি মোটামুটিভাবে চারটি উপত্যকায় বিভক্ত।

পার্বত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং খাদ্য সহ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেরাই প্রস্তুত করে থাকে। ঝুম চাষই উপজাতিদের প্রধান উপজীবিকা। বাঁশ, কাঠ এবং বিভিন্ন ধরণের ফলমূল আহরণ ঐ তিন জেলার অধিবাসীদের জীবিকার প্রধান উৎস্য হলেও জীবিকার আরো অনেক সম্ভাবনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঐ তিন জেলায়। পাহাড়ী জলাভূমিতে মাছ চাষ এমনি একটি সম্ভাবনা।

১৯৬১ ইং সালে হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প নির্মাণের ফলে সৃষ্ট কাপ্তাই লেক পার্বত্য জেলা সমূহে মাছচাষ, মাছ আহরন, এবং মাছের সহজলভ্যতার দ্বার খুলে দেয়। কাপ্তাই লেকের আয়তন ১,৪০,০০০ একর। শুরু থেকেই বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কপোরেশন ঐ লেকে মাছচাষ, মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কাপ্তাই লেকের বার্ষিক মাছ আহরণের পরিমাণ মাত্র ৫,০০০ টন। লেকের আয়তনের তুলনায় মাছ আহরণের পরিমাণ অতি নগন্য। কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে এবং ঐ সুযোগকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে মাছচাষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

কাপ্তাই লেকের মাছের বিশাল ভান্ডার ছাড়াও তিনটি পার্বত্য জেলায় মাছচাষ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির আরো অনেক সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত ক্রীকগুলোর সংস্কার এবং উন্নয়ন ঐ সম্ভাবনার অন্যতম। এছাড়াও আছে অনেক পকর যার অনেকগুলোতে সংস্কার ছাড়াই মাছচাষ করা যায় এবং বাকিগুলো সংস্কারের মাধ্যমে মাছচাষের আওতায় আনা যায়।

পাহাড়ী জেলা সমূহের দীঘি-পুকুর এবং ক্রীকগুলোতে মাছচাষ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে তাই পার্বত্য জেলা সমূহে *মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ* নামে একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বৎসর মেয়াদী ঐ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১.৫ হেক্টর আয়তনের নার্সারী গড়ে তোলা, ৯২ হেক্টর আয়তনের ক্রীক জলাশয় উন্নয়ন এবং মাছচাষের আওতায় আনা, মাছচাষীদের প্রশিক্ষণ পদান এবং মাছচাষীদের পুর্নবাসনের মাধ্যমে সংগঠিত করা।

পার্বত্য জেলা সমূহে মাছচাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকিকরণ এবং চাষের এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা ছাড়াও মৎস্য বিভাগ কতৃক ইতোপূর্বে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলোর সম্প্রসারণ নতুন প্রকল্পের অধীনে রাখা হয়েছে। কাপ্তাই লেকে পোনা মওজুদের সুবিধার্থে মৎস্য বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত রাঙ্গামাটি হ্যাচারী এবং পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির রামগড়ে স্থাপিত রামগড় হ্যাচারীর সংস্থার এবং উন্নয়ন সহ বান্দরবান জেলায় একটি নতুন হ্যাচারী স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। প্রকল্প বাস্তবায়রেন ফলে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা প্রকল্প এলাকার ক্রীক জলাশয়ে এবং পুকুরে মওজুদের সুবিধা ছাড়াও বেসরকারী পুকুর এবং ক্রীক মালিকেরা মাচ চাষ সংক্রান্ত সবধরণের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

পার্বত্য জেলা সমূহে মাছচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের বিশেষ দিক হচ্ছে সরকারী দীঘি-পুকুর এবং ক্রীক উন্নয়নের পর তা পরিচালনার জন্য মৎস্যচাষীদের সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনা করা এবং উন্নীত জলাশয়সমূহের সর্বাধিক ব্যবহার এবং উৎপাদন নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে সমবায়ীদের মধ্যে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন অথাৎ সমন্তি মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সফল বাস্বায়ন। এ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পে উন্নয়নকৃত দীঘি-পুকুর এবং পাহাড়ী ক্রীকগুলো থেকে বছরে ২০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হবে বলে আশাকরা যায় যার আনুমানিক মূল্য হবে প্রায় ৮৫ (পঁচাশি) লক্ষ টাকা।

এ প্রকল্পের সুফল শুধু প্রকল্পভূক্ত মৎস্যচাষীরাই ভোগ করবে না, পার্বত্য জেলা সমূহের জনসংখ্যার এক বিপুল অংশও তার অংশীদার হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে পার্বত্য অঞ্চলের বেকার যুবক ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে পাহাড়ী ক্রীক জলাশয় উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রযুক্তির প্রসার লাভ করবে। এ পকল্পের পশিক্ষণ ও সম্পারণ কর্মসচী বাস্বায়নের ফলে সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে অন্ততঃ ১,০০০ হেক্টর ক্রীক জলাশয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষাবাদ করে ২,০০০ টন মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ফলে ৭-১০ হাজার বেকার যুবক ও প্রান্তিক চাষীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের প্রতি পরিবারে বৎসরে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পাবে। এভাবে পাহাড়ী ক্রীক জলাশয় উন্নয়ন এবং মৎস্যচাষ সম্পসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পাহাড়ী বেকার যুবক এবং প্রান্তিকচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের জন্যে গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রয়াস এবং প্রসার

ডঃ এম এ মজিদ, পরিচালক

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, বেকার ও কর্মহীন মানুষের কাজের সংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস হিসেবে একদিকে যেমন মৎস্য ও চিংড়ি চাষের দ্রুত প্রসার ঘটছে, তেমনি অপরদিকে প্লাবনভূমি, নদী আর মোহনার মত জলাশয়গুলোতে অতি আহরণের মাত্রা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে পরিবেশের বিপর্যয়, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ ও মনুষ্য সৃষ্ট কতিপয় অন্যান্য সমস্যার কারণে আবহমানকাল হতে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে মাছের উৎপাদন মোট ১.১ মিলিয়ন টন। এই উৎপাদন বর্তমান চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে মাথাপিছু গড়ে প্রতিদিন ২৫ গ্রামের বেশী মাছের যোগান দেয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। যদি চাহিদা মোতাবেক মাছের এই সরবরাহ মাথাপিছু প্রতিদিন ৩৮.০ গ্রামে উন্নীত করতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন আরো ৯ লক্ষ টন বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান, উৎপাদন মাত্রা ও মুক্ত জলাশয় সম্পদের জীববৈচিত্র। অনেক মূল্যবান প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে বা হবার পথে-যা সমগ্র জাতির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেই এই সংকট উত্তরণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি সম্ভবপর।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট বিগত দিনে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এবং এর প্রজনন কৌশল ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় যেমন- প্রশিক্ষণ, পুস্তিকা বিতরণ, প্রদর্শণী খামার স্থাপন ইত্যাকার ব্যবস্থাধীনে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ও হস্তান্তরে সফলতা অর্জনের কারণে মৎস্য/চিংড়ি চাষ আজ একটি অতি লাভজনক কর্মকান্ড হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

মাছ ও চিংড়ি চাষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট এ পর্যন্ত গবেষণার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি চাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু উন্নত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এইসব প্রযুক্তি সমূহের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

প্রাকৃতিক উৎস যেমন নদী-নালা ও উন্মুক্ত জলাশয়গুলোতে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া হ্রাস পাওয়ায় দেশের বহু অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের জন্যে অনেক হ্যাচারী স্থাপিত হয়েছে। হ্যাচারী নির্মাণের সাথে সাথে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ও এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিঃসন্দেহে এদেশে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই গবেষণার ফলাফলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কতিপয় কার্প মাছ যেমন -রুই, সিলভার কার্প ইত্যাদি একটি মৌসুমে যেখানে একবার প্রজনন করে থাকে, সেখানে প্রজনন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে বহু প্রজনন প্রক্রিয়ায় এদেরকে এক মৌসুমে দুই থেকে তিনবার প্রজনন ঘটিয়ে পোনা উৎপাদন মাত্রা কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভবপর হয়েছে।

বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট মানের মাছের পোনার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পোনা মাছের লালন পালন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মৎস্য চাষীদের যথোপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় আঁতুড় পুকুরে লালন-পালন কালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পোনার মৃত্যু ঘটে। ইহা বর্তমানে এদেশে মাছ চাষের এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে পোনার সর্বোচ্চ মজুদ হার, সঠিক সার প্রয়োগমাত্রা এবং যথার্থ খাবার প্রয়োগ করে আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নের দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের চারা পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে কৃষকের এক হেক্টর আয়তনের আঁতুড় পুকুরে সিলভার কার্প, রুই, মৃগেল ও মিরর কার্পের ১-৪ দিন বয়সের পোনা প্রজাতি ভেদে ৫০-৬০ লক্ষ হারে মজুদ করে ৩-৪ সপ্তাহ লালন কালের পর ৬০%-৮০% পোনা বেঁচে থাকে। এবং ৩০দিন বয়সের পোনা ২-৬ লক্ষ হারে মজুদ করে পরবর্তী ৮ সপ্তাহ লালন কালের পর বাঁচার হার ৭০-৯০% পরিলক্ষিত হয়।

পুকুরে বিভিন্নস্তরে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক খাদ্যের পুরাপুরি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন প্রজাতির মাছের একত্রে চাষ, যাতে পুকুরে সর্বস্তরে বিদ্যমান খাবার সমভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। স্বল্প মূল্যের সম্পূরক খাদ্য এবং পুকুরের সকল স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহার করে ভিন্ন প্রজাতির মাছের মিশ্র চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে হেক্টর প্রতি বছরে ৩,০০০-৫,০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভজনক। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত মাছ চাষী মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে হেক্টর প্রতি ৯০,০০০-১,০০,০০০ টাকা প্রকৃত মুনাফা অর্জন করছে।

ইনষ্টিট্যুটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে সমন্বিত হাঁস/মুরগী ও মাছ চাষের সফল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে হাঁস ও মুরগীর বিষ্ঠা পুকুরে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের গড়পড়তা মৎস্য উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৮০০-১২০০ কেজি হতে অনেকগুণে বাড়ানো সম্ভব। সমন্বিত হাঁস/মুরগী-মাছ চাষের পুকুরে মাছের জন্য কোন সার বা সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কৃষক পর্যায়ে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের ফলে বছরে গড়ে হেক্টর প্রতি ৪০০০-৫০০০ কেজি

মাছের উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সমন্বিত হাঁস/মরগী ও মাছ চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক হেক্টর আয়তনের পুকুর থেকে শুধুমাত্র মাছ হতে গড়ে ১,৫৪,৭৭৭-১,৭৭,৩২০ টাকা প্রকৃত মুনাফা লাভ করা যায়। উপরন্ত ব্রয়লার মুরগী হতে আরো ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় হয়। লেয়ার মুরগীর ডিম হতেও অনুরূপ বাড়তি আয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রায় প্রত্যেক চাষীর বাড়ীতে বা তার আশেপাশে বিদ্যমান ছোট খাটো পুকুর, মৌসুমী খাড়ি নালা, ডোবায় অতি স্বল্প খরচ ও সহজ ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের কথা চিন্তা করেই ইনষ্টিট্যুটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে গবেষণার মাধ্যমে কতিপয় দেশী মাছ যেমন-সরপুঁটি, পাবদা, গুলশা এবং বিদেশী মাছ যেমন নাইলোটিকা, লাল তেলাপিয়া, থাই সরপুটির প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। নাইলোটিকা ও লাল তেলাপিয়া মৌসুমী জলাশয়ে চাষ করে ৪-৫ মাসে প্রতি হেক্টরে গড়ে ২,৫০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে কৃষকের হেক্টর প্রতি বছরে প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪,০০০ টাকা। আর দেশী ও থাই সরপুঁটি ৫ মাস সময়ে উৎপাদিত হয়েছে যথাক্রমে ১,৩০৪ কেজি এবং ২,০৭৫ কেজি। এতে কৃষকের প্রকৃত মুনাফার হিসাব দাঁড়ায় ৩০,০০০-৪৭,০০০ টাকা। এই সকল প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। পাবদা ও গুলশা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মাছ। মিঠা পানির এই সুস্বাদু মাছ দুটি নদী, খাল-বিল ও হাওড়ে এক সময় প্রচুর পাওয়া গেলেও ইদানিং এই মাছ দারুণভাবে কমে গেছে। ইনষ্টিট্যুট এ মাছ দুটির বিলুপ্তিরোধকল্পে এদের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা লালন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেছে। সরকারী খামারগুলোতে এ মাছ দুটির কৃত্রিম প্রজনন ও চাষের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ২৫ জন খামার ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইনষ্টিট্যুট এ সব খামারে পরিপক্ক মাছ সরবরাহ করছে যাতে করে কৃষক পর্যায়ে এ মাছ দুটির পোনার চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে এখন দেশী ও বিদেশী দুটি মাগুর মাছই বিদ্যমান। মাগুর মাছের স্বাদ ও বিপুল চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এদের নিয়ন্ত্রিত/প্রণোদিত পদ্ধতিতে প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদান এবং নিবিড় চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেয়া হয়। দেশী মাগুরের পাশাপাশি আফ্রিকান মাগুরের কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। হ্যাচিং ট্রেতে (Tubifax) খাবার দিয়ে এবং পরবর্তীতে আঁতুড় পুকুরে সুষম খাবার ব্যবহারে যথাক্রমে ৯৪% এবং ৭০% বাঁচার হার পাওয়া গিয়েছে। দেশী ও আফ্রিকান মাগুরের সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের শংকর মাগুর উদ্ভাবন করা যাচ্ছে যা দেশী মাগুরের চেয়ে অধিক বর্ধনশীল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সকল প্রযুক্তি ইতিমধ্যে বেসরকারী খামার মালিক ও মৎস্য চাষী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়েছে।

প্রাকৃতিক উপায়ে পুকুরে মাছের যে খাবার (শ্যাওলা ও জলজ কীট) উৎপাদিত হয় তা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সম্পুরক খাবার মাছের দ্রুত দেহ বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে। ইনষ্টিট্যুট দেশে প্রাপ্য খাদ্য উপাদান যেমন চালের কুড়া, গমের ভূষি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিসমিল, গরু ছাগলের রক্ত ও নাড়ী ভূড়ি, রেশম কীট এবং জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরীপানা, ক্ষদি পানা, কটি পানা ইত্যাদির সমন্বয়ে মাছের উনতমানের সুষম খাদ্য তৈরীর সুত্র ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। কার্প জাতীয় মাছের আঁতুড় পুকুরে রেণু পোনাকে এই খাদ্য প্রদান করে ৯০ দিন পালনের পর রেণু পোনার বাঁচার হার ৭০-৮০% পাওয়া গিয়েছে। অপরপক্ষে, মিশ্র চাষে উদ্ভাবিত খাদ্য ব্যবহারে প্রতি হেক্টরে ৩,৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছ।

বাংলাদেশে মোট১০.১৪ মিলিয়ন হেক্টর ধানক্ষেত রয়েছে যা মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইনষ্টিট্যুট পরিচালিত কৃষক পর্যায়ের গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে যে, এক একর আয়তনের একটি ধান ক্ষেতে ১,২০০টি পোনা ছাড়া হলে ন্যুনতম ১০০-১২০ কেজি মাছ উৎপাদন হয়। এই পরিমাণ মাছের মূল্য প্রায় ৫-৬ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে পোনার মূল্য ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও শুধুমাত্র মাছ থেকে একর প্রতি ৪-৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয়। এ আয় ধানক্ষেত থেকে বাড়তি আয় যা অন্য কোন উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে অগণিত খাল, নালা, হাওর-বাওড়, বিল রয়েছে। এই সব জলাশয়ে পেন তৈরীর মাধ্যমে মাছ চাষ একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইনষ্টিট্যুটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্র পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। হেক্টর প্রতি ২০,০০০ রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করে মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে বছরে ৩ টন উৎপাদন পাওয়া যায়। পেনে মাছ চাষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ছয় মাস সময়ে হেক্টর প্রতি প্রকৃত মুনাফা ১,২২,৯৪০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব। এরূপ ফলাফল নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক ও অত্যন্ত আশাপ্রদ।

তাছাড়া নদী কেন্দ্রে পাঙ্গাস মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং একক ও মিশ্র চাষের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়। মিশ্র চাষে হেক্টর প্রতি ৮,০০০ পাঙ্গাস, ১,০০০ কাতলা, এবং রুই মাছ মজুদ করে বছরে গড়ে ৫ টন উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে। আর একই ঘনত্বে একক চাষে পাঙ্গাস মাছের গড় উৎপাদন পাওয়া যায় ২.০-২.৫ টন। গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রমাণিত হয় যে, একক চাষের চেয়ে পুকুরে পাঙ্গাস মাছের মিশ্র চাষ অধিক লাভজনক। পাঙ্গাস মাছের গুরুত্ব অনুধাবন করে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯০ সনে থাইল্যান্ড থেকে দ্রুত বর্ধনশীল পাঙ্গাস (Pangasius sutchi) আমদানী করা হয়। মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট বাংলাদেশে প্রথম ১৯৯৩ সালে এই থাই পাঙ্গাসের সফল প্রজনন ও কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়।

ইনষ্টিট্যুটের নদী কেন্দ্রে গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্বল্প মূল্যে ও দেশজ উপাদানে তৈরী এ হ্যাচারী ইউনিট থেকে একটি প্রজনন মৌসুমে ১.৫-২.০ লক্ষ পর্যন্ত গলদা চিংড়ি পোনা উৎপাদন করা যায়। এই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য হলো, দেশের চিংড়ি চাষ এলাকায় ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য হ্যাচারী ভিত্তিক চিংড়ি গ্রাম (Shrimp Hatchery Village) গড়ে তোলা। আশার কথা, এ প্রযুক্তি চিংড়ি চাষীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। চাষী ও উদ্যোক্তাদের অনুরোধে ইনষ্টিট্যুটের প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমের অধীনে গৃহাঙ্গন হ্যাচারীর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে বেশ কিছু উদ্যোগী চাষীকে হ্যাচারী ইউনিট স্থাপনে সহায়তাও দেয়া হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইনষ্টিট্যুটের পুকুরে গলদা

চিংড়ির একক চাষে হেক্টর প্রতি ৮০০-১০০০ এবং মিশ্র চাষে ৩,০০০ কেজি মাছ ও ৪০০ কেজি চিংড়ির ফলন পাওয়া গেছে।

ইনষ্টিট্যুটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে ঘেরে বাগদা চিংড়ি চাষের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সনাতনী পদ্ধতির স্থলে মজুদ-পূর্ব নার্সারীতে পোনার পরিচর্যা করে ঘেরে প্রয়োজনীয় চুন, গোবর ও সার প্রয়োগে, প্রতি হেক্টরে ২০,০০০-৩০,০০০ চিংড়ি পোনা মজুদ এবং নিয়মিত স্বল্প মাত্রায় সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ করে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি বর্তমান উৎপাদন হারের দ্বিগুণ যা অর্থনৈতিক বিবেচনায় অশেষ গুরুত্ব বহন করে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের প্রয়োগ ও প্রসার

পানি সম্পদের মত একটি অতি প্রয়োজনীয় উৎস শুধু গৃহস্থালী, রান্নাবান্না এং কৃষি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় অথচ এইসব কাজকর্মের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মাছ চাষের কাজেও এই পানি ব্যবহৃত হতে পারে। আর এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই সরেজমিন গবেষণার সাথে মাছ চাষকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের নির্বাচিত ৫টি কেন্দ্রে (টাঙ্গাইল, ঈশ্বরদী, রংপুর, চিটাগাং ও রাজশাহী), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের একটি কেন্দ্রে (ফরিদপুর), ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের একটি কেন্দ্রে (ঠাকুরগাঁও) এবং মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ত্রিশাল কেন্দ্রে গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ ইউ এস এইড এর অর্থনৈতিক এবং ইকলার্মের কারিগরী সহযোগিতায় ১৯৯০ সনে সরেজমিন কৃষি গবেষণার সাথে মৎস্য কম্পোনেন্ট সম্পৃক্ত করা হয়। গরীব কৃষকের প্রাপ্ত সকল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট কম পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক মৎস্য উৎপাদনের বেশ কয়টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

১৯৯০-৯৩ পর্যন্ত উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহে যেসব গবেষণা পরিচালিত হয় তা হলোঃ (ক) মৌসুমী পুকুর/ডোবা-নালায় মাছের একক ও মিশ্র চাষ (খ) মেয়াদী পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ (গ) মেয়াদী পুকুরে সমন্বিত হাঁস/মুরগী-মাছ চাষ (ঘ) ধান ক্ষেতে মাছের চাষ ইত্যাদি। মাছ চাষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের পূর্বে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা নির্বাচিত এলাকার একটি আর্থ সামাজিক জরিপ পরিচালনা করে। অতঃপর এলাকার চাষীদের সাথে পরামর্শপূর্বক সরেজমিন গবেষণার ডিজাইন এবং কার্যক্রম নির্ণয় করে। অতি স্বল্প খরচ অথচ অধিক মুনাফা সম্বলিত এইসব মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিমধ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির পুষ্টি ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিন গবেষণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশব্যাপী নির্বাচিত চাষীরা একদিকে যেমন মাছ চাষের বিবিধ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সরাসরি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে আবার অন্যদিকে তাদের কাজকর্ম ও মাছ চাষে সম্পৃক্ত পুকুর সমূহ প্রদর্শনী পুকুর হিসাবে আশেপাশের শত শত চাষীদের মাছ চাষে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট কম পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক মৎস্য উৎপাদনের বেশ কয়টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে এই সকল প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে দ্রুত মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর নানাবিধ কারণে সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্ত প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় এন,জি, ও সমূহ সরকারী সংস্থার উদ্যোগকে অধিকতর কার্যকর করতে পারে। ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর আর্থিক সহায়তায় মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট এবং মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোট ৮টি এন, জি, ও এর মাধ্যমে ২০টি জেলার ৩৫টি থানায় বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রযুক্তির প্রদর্শনীমূলক খামার স্থাপনের কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত করে। (১) কেন্দ্রে এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে হস্তন্তর (২) বাংলাদেশের বিভিন্ন এগ্রোইকোসিষ্টেমে প্রযুক্তি সমূহকে লাগসইকরণ (৩) দেশের এন.জি. ও সমুহকে মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত করা (৪) সরকারী ও এন. জি. ও সম্প্রসারণ কর্মী এবং মাছ চাষীদের মাছ চাষের উন্নত কলাকৌশল বিষয়ে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান (৫) প্রদর্শনী খামার এলাকায় চাষী সমাবেশের মাধ্যমে চাষীদের উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা (৬) এন. জি. ও এর সহযোগিতায় ভুমিহীন কৃষক এবং গ্রামীণ মহিলাদের মাছ চাষে সম্পৃক্ত করতঃ কর্মসংস্থানের এবং আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

উল্লেখিত প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল এন, জি, ও সমূহকে বাছাই করা হয় সেগুলো হলোঃ (১) বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) (২) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (৩) রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আর ডি আর এস) (৪) ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টি এম এস এস) (৫) গান্ধী আশ্রম ট্রাষ্ট (৬) জাগরণী চক্র (৭) উন্নয়ন সংঘ এবং (৮) উত্তরণ। এডাব সকল এন. জি. ও কে সমন্বয়ে সহযোগিতা প্রদান করে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে (১) প্রাথমিক পর্যায়ে এন জি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মাছ চাষের উন্নত কলা-কৌশলের উপর ৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষন দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে ফলো-আপ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মত বিনিময় এবং সে মতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয় (সারণী দ্রষ্টব্য), (২) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এন জি ও সম্প্রসারণ কর্মী দ্বারা মৎস্য চাষীদের মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় (৩) মৌসুমী পুকুর, মেয়াদী পুকুর এবং আঁতুড় পুকুরে উদ্ভাবিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রধানতঃ নাইলোটিকা চাষ, রাজপুঁটির চাষ, মিশ্র চাষ এবং আতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনার প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। (৪) উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলাফল প্রদর্শনের নিমিত্ত খামার এলাকায় যে সকল কৃষকরা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেনি তাদের জন্য চাষী সমাবেশ করা হয়।

বর্তমান বছরে সর্বমোট ৫টি এন জি ও যথাক্রমে প্রশিকা, ব্রাক, টি এম এস এস, জাগরণী চক্র ও বাঁচতে শেখা-কে সম্পৃক্ত করে উল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে।

প্রদর্শণী খামার স্থাপনের বিবরণ

এনজিও	প্রদর্শণী পুকুরের সংখ্যা			চাষী প্রশিক্ষণ	চাষী সমাবেশ
	মৌসুমী	মেয়াদী	আঁতুড়		
প্রশিকা	২০০ টি	১৫০ টি	৩৫ টি	৭৭০ জন	৪০ টি
ব্রাক	২৪০	২০০	৫০	৯৮০	৪৫
টিএমএসএস	২৪	১৫	৫	৮৮	৫
জাগরণী চক্র	১৬	১৫	৫	৭২	৫
বাঁচতে শেখা	২০	২০	৫	৯০	৫

প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন অংশগ্রহণকারী কৃষক আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছেন তেমনি অংশগ্রহণ করেননি এমন কৃষকেরা উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ইনষ্টিট্যুট উদ্ভাবিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষীরা প্রতি হেক্টরে ৩ টনেরও বেশী মাছ উৎপাদন এবং তা থেকে ৫০-৬০ হাজার টাকা প্রকৃত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো এন জি ও এর সহায়তায় ভূমিহীন কৃষক এবং গ্রামীণ মহিলাদের মাছ চাষের মতো একটি উৎপাদনশীল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার

মাছ ও চিংড়ি চাষের মাধ্যমে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সরকারের এই সদিচ্ছার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অগ্রাধিকার ভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। দেশে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তি সমুহের প্রসার একদিকে যেমন দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আবার অন্যদিকে অসংখ্য জনগোষ্ঠির পুষ্টি বিধান ও দারিদ্র মোচনের স্বার্থেও দরকার। তাই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সকলের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মাছ চাষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। রূপালী বিপ্লবেই সমৃদ্ধি সম্ভব।

পুকুর ডোবা বিলে ঝিলে
চাষ করুন সবাই মিলে

ব্যাংক ঋণের জন্য একটি আধা-নিবিড় মৎস্য চাষ খামারের মডেল প্রকল্প

মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
মোঃ মনিরুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	আদর্শ আধা-নিবিড় মৎস্য চাষ খামার প্রকল্প।
২।	উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা	ঃ	
৩।	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	বাংলাদেশের সমতল ভূমির বন্যামুক্ত এলাকা।
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	৫ (পাঁচ) বৎসর।
	ক) প্রকল্প আরম্ভ -	ঃ	জুলাই / ১৯৯৫ ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তি -	ঃ	জুন / ২০০০ ইং
৫।	প্রকল্পের ভূমিকা, যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য		

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দেশে পূর্বে মুক্ত জলাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ আহরণ করা হত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষাবাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর আয়তনের ১৩ লক্ষ পুকুর-দীঘি আছে। তাছাড়া প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর পথিপার্শ্বিক ডোবা-নালা এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকায় করোপিট জাতীয় আধা-বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষাবাদের সুযোগ আছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ মৎস্য চাষ ঋণ প্রদান পদ্ধতি জটিল বিধায় ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের জন্য ব্যাংক সমূহ বর্তমানে সহজ শর্তে এবং ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলের আওতায় জামানত ছাড়া তদারকী মৎস্য চাষ ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নূতন নূতন মৎস্য চাষ খামার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের প্রচলিত কর্মসূচী আরও গতিশীল করার উদ্দোগ গ্রহণ করেছে।

একটি আদর্শ মৎস্য চাষ খামার স্থাপনের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) মাছের উৎপাদান বৃদ্ধি করতঃ প্রকল্প এলাকার মাছের চাহিদা পূরণ করা,
খ) আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
গ) উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি / আধা-নিবিড় মৎস্য চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতঃ জলাশয় মৎস্য চাষের প্রসার করতে সহায়তা প্রদান।

৬। **এক হেক্টর জলায়তন মৎস্য চাষ প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয় / মূলধন খাত (হাজার টাকায়) ঃ**

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্প স্থাপনের প্রধান অংগ সমূহ -	প্রথম বর্ষ	
		পরিমাণ	ব্যয়
১	২	৩	৪
ক)	মৎস্য চাষ খামার নির্মাণের জন্য জমি মূল্য (নিজস্ব)	১.২৫ হেক্টর	৪৫০
খ)	জমি উন্নয়ন / পুকুর উন্নয়ন / পানি বিতরণ-নিস্কাশন নালা ইত্যাদি।	১ হেক্টর জলায়তনের ৫টি পুকুর	২৫০
গ)	অন্যান্য অবকাঠামো, অফিস ঘর / গার্ডশেভ / গুদাম ঘর ইত্যাদি।	১ ইউনিট	৭৫
ঘ)	কাঁটা তারের বেড়া	৫০০ মিটার	৫০
ঙ)	অ-গভীর নলকূপ অথবা লো-লিফট পাম্প	১ সেট	৪০
চ)	মৎস্য চাষের যন্ত্রপাতি (জাল, পাম্প, পেডেল হুইল এ্যারেটর, নিক্তি, বালতি, ট্রে, ইত্যাদি)	প্রতিটির ১ (এক)সেট	৭৫
ছ)	বিধি -	লট	১০
	মোট ঃ		৯৫০

৭। এক হেক্টর জলায়তন পুকুরে ৫ বৎসরের
মৎস্য চাষ পরিচালনা ব্যয় / চলতি মূলধান (হাজার টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালনার	১ম বর্ষ		২য় বর্ষ		৩য় বর্ষ		৪র্থ বর্ষ		৫ম বর্ষ		সার্বমোট	
নম্বর	অংগ সমূহ -	পরি মাণ	ব্যয়	পরি মাণ	ব্যয়	পরি মাণ	ব্যয়	পরি মাণ	ব্যয়	পরি মাণ	ব্যয়	পরি মাণ	ব্যয়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ক)	পানি নিষ্কাশন	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	২৮.০০
খ)	চুন প্রয়োগ	.২৫ টন	২.০০	.২৫ টন	২.০০	.২৫ টন	২.০০	.২৫ টন	২.০০	.২৫ টন	২.০০	১ টন	১০.০০
গ)	পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত	-	৩.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৭.০০	-	৮.০০	-	৩০.০০
ঘ)	কমপোস্ট / জৈবসার	৪ টন	৪.০০	৪ টন	৪.০০	৪.৫ টন	৪.৫০	৪.৫ টন	৪.৫০	৫ টন	৫.০০	২২ টন	২২.০০
ঙ)	রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, টিএসপি এবং পটাশ)।	১টন	৮.০০	১টন	৮.০০	১.২৫ টন	১০.০০	১.২৫ টন	১০.০০	১.৫০ টন	১২.০	৬ টন	৪৮.০০
চ)	পোনা	৭০.০০	৭.০০	৭০০০	৭.০০	৭৫০০	৭.৫০	৭৫০০	৭.৫০	৮০০০	৮.০০	৩৭০০০	৩৭.০০
ছ)	মাছের খাবার, খৈল/ গমের ভূষি / কুড়া/ শুটকী মাছের গুড়া।	৫ টন	৩০.০০	৫.৫ টন	৩৩.০	৬.০০ টন	৩৬.০	৬.৫ টন	৩৯.০	৭ টন	৪২.০	৩০ টন	১৮০.০
জ)	মাছ ধরা / বাজারজত করণ	-	১০.০০	-	১২.০	-	১৩.০	-	১৫.০	-	১৫.০	৬৫.০	
ঝ)	ঔষধ / চিকিৎসা	-	২.০০	-	৩.০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	৫.০০	-	২০.০০
ঞ)	জনবল	১ জন	১৮.০০	১ জন	২০.০	১ জন	২২.০	১ জন	২৪.০	১ জন	২৬.০	-	১১০.০
ট)	আনুসাংগিক (বিদ্যুৎ, জ্বালানী, কর, মনোহরী দ্রব্যাদি।	-	১১.০০	-	১৫.০	-	১৮.০	-	২০.০	-	২১.০	-	৮৫.০
	মোট পরিচালনা ব্যয় ঃ		১০০.০০		১১৫.০		১৩০.০০		১৪০.০০		১৫০.০		৬৩৫.০০

৮। এক হেক্টর জলায়তন পুকুরের ৫ বৎসরের
উৎপাদন / আয় (হাজার টাকায়)

উৎপাদিত মাছের	১ম বর্ষ		২য় বর্ষ		৩য় বর্ষ		৪র্থ বর্ষ		৫ম বর্ষ		সর্বমোট	
বিবরণ	পরিমাণ	আয়	পরিমাণ	আয়	পরিমাণ	আয়	পরিমাণ	আয়	পরিমাণ	আয়	পরিমাণ	আয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারপার্ক, কার্পিও, থাই সরপুঁটি, ইত্যাদি।	৭ টন	২৮০	৭.৫ টন	৩০০	৮ টন	৩২০	৯টন	৩৬০	১০ টন	৪০০	৪১.৫টন	১৬৬০

বিক্রয়মূল্য প্রতি টন ৪০,০০০/- টাকা হিসাবে

৯। প্রকল্প ব্যয়ের উৎস্য

ক) নিজস্ব (জামানত হিসাবে)	ঃ	জমির মূল্য বাবদ	-	৪৫০ হাজার টাকা
খ) ব্যাংক	ঃ	বিনিয়োগ মূলধন	-	৫০০ হাজার টাকা
		চলতি মূলধন	-	১০০ হাজার টাকা
		মোট ব্যাংক ঋণ	-	৬০০ হাজার টাকা।

১০। ঋণের কিস্তি পরিশোধের তফশিল

ক) স্থায়ী মূলধন - ঃ ৫০০ হাজার টাকা (৫ বৎসর মেয়াদী)
সুদের হার - ঃ ৯.৫%
রেয়াতী সময় (১২ মাস)
সুদ সহ আসল - ঃ ৫৪৭.৫০ হাজার টাকা
ঋণ পরিশোধের সূচক (সি আর এফ) ০.১৫৪৭২৮১
কিস্তি (সুদসহ) - ঃ ৮৪.৭১ হাজার টাকা
কিস্তির মেয়াদ - ঃ ৬ মাস অন্তর ৪ বৎসর মেয়াদী মোট ৮টি কিস্তি।

খ) চলতি মূলধন ঃ ১০০ হাজার টাকা (৩ বৎসর মেয়াদী)
সুদ হার - ঃ ১১.৫%
রেয়াতি সময় (৬ মাস) সুদসহ আসল ১০৫.৭৫ হাজার টাকা
ঋণ পরিশোধের সূচক (সি আর এফ) ০.২৪৩৮৯০৬৯
কিস্তি (সুদসহ) ঃ ২৫.৭৯ হাজার টাকা
কিস্তি মেয়াদ - ঃ ৬ মাস অন্তর ৩ বৎসর মেয়াদী মোট ৫টি কিস্তি।

১১। প্রকল্পের কারিগরী সম্ভাব্যতা -

ক) প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিতকরণ ঃ বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকা ছাড়া অভন্তরীণ সমতল ভূমির বন্যামুক্ত যেকোন এলাকা মিঠা পানির মৎস্য খামার স্থাপন করা যায়। তবে, চরাঞ্চল এবং নদী তীরবর্তী নীচু অঞ্চল মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত নয়।

খ) মাটির ভৌত গুণাগুণ ঃ মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটি উত্তম এবং উৎপাদনশীলতা বেশী। পিট মাটি এবং বেলে মাটি পরিহার করা উচিত। লাল মাটি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের শক্ত মাটির উৎপাদনশীলতা কম।

গ) পানির গুণাগুণ ঃ মিঠা পানির মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে পানির উৎস হিসাবে লোনামুক্ত, আয়রনমুক্ত এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসমুক্ত পানি উত্তম।

ঘ) যোগাযোগ / বাজারজতকরণের সুবিধা ঃ সড়ক / রেল / নৌপথে যোগাযোগের সুবিধাদি থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঙ) পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব ঃ আধা-নিবিড় মৎস্যচাষ জলজ পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া নাই।

১২। প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা

ক) ব্যয় ও লাভের অনুপাত ঃ প্রকল্পের বর্তমান মূল্যে হ্রাসকৃত (ডিসকাউন্টেড) ব্যয় ও আয়ের বিশ্লেষনকৃত অনুপাত ১.০০ এর অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় ও আয়ের অনুপাত ১ ঃ ১.১৮।

খ) অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তির হার (আই আর আর) ১৫% এর অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে আই. আর. আর. ২৬.২২%।

গ) নীট বর্তমান মূল্য (এন পি ডি) ঃ প্রকল্পের সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক জীবনকাল অর্থাৎ ১০ বৎসর বাস্তবায়নকালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বর্তমান মূল্যে ধনাত্মক (+) হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আলোচ্য প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য (+) ২৬১.৫৭ হাজার টাকা। উল্লেখ্য যে, জমির মূল্য প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাবে যা প্রকল্প বাস্তাবায়নে আপদকালে ঝুকির সহনশীলতার সূচক হিসেবে কাজ করবে।

ঘ) খরচ উঠানোর সময় (Payback period) ঃ প্রকল্প পরিচালনার সময় প্রতি ৫ বৎসরে অন্ততঃ একটি ফসল বন্যাজনিত অথবা অন্য যেকোন আপদের কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় প্রকল্পের নিম্নতম ১০ বৎসর অর্থনৈতিক জীবনকালে আপদকাল বাদ দিয়ে অর্থৎ ৮ বৎসরে প্রকল্পের মূলধন খাতে ব্যয় উত্তোলন সম্ভব হলে প্রকল্পটি সহনশীল হয়। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাত ৪ বৎসরে মূলধন খাতে ব্যয় উত্তোলন সম্ভব।

১৩। প্রকল্পের কারিগরী ব্যবস্থাপনা

আধা-নিবিড় মৎস্যচাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে লাগসই ও সহনশীল প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রযুক্তিকে বিনিয়োগ খাতে মূলধন ও পরিচালনা বাবদ খরচ কম এবং উৎপাদন ও আয় / লাভ তুলনামূলকভাবে বেশী। আধা-নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প মৎস্যচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনা করা উচিত। প্রকল্পটির নির্মাণ এবং উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য প্রকৌশলী এবং মৎস্য চাষবিদের কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক হেক্টর নীট জলাতনের মৎস্য চাষ খামার স্থাপনে মোট ১.২৫ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। বাকী ০.২৫ হেক্টর পুকুরের পাড়, অফিস, গুদামঘর, গার্ডশেড, ইত্যাদির জন্য ব্যাবহৃত হয়। একটি আধুনিক মৎস্য খামারের প্রয়োজনে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য একটি অগভীর নলকূপ অথবা একটি পাম্পের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, প্রতি পুকুরে সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পানি বিতরণ ও নিষ্কাশন

নালার সংস্থান রাখা ভাল। প্রকল্পের উৎপাদিত মাছের নিরাপত্তার জন্য খামারের চারিপার্শ্বেব কাঁটা তারের বেড়া স্থাপন করতে হবে। মৎস্য চাষের খামারে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি হিসেবে একটি করে টানা জাল, ঝাকিজাল, প্ল্যাঙ্কটন জাল, পেডেল হুইল এ্যারেটর, নিক্তি, বালতি, ট্রে ইত্যাদি রাখা বাঞ্ছনীয়।

উন্নয়নকৃত এক হেক্টর জলায়তন বিশিষ্ট একটি আধ-নিবিড় মৎস্য খামার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৭-১০ টন মাছের উৎপাদন লক্ষমাত্র নির্ধারণ করা যায়। প্রকল্প পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতি বৎসর উৎপাদন লক্ষমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায়। সে অনুপাতে উৎপাদন সামগ্রী এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। উন্নয়নকৃত এক হেক্টর জলায়তন বিশিষ্ট একটি খামারে প্রতি বৎসর চুন ২৫০ কেজি, কমপোষ্ট / জৈবসার ৪-৫ টন, রাসায়নিক সার ১-১.৫ টন, মাছের পোনা ৭-৮ হাজার, মাছের খাবার ৫-৭ টন হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এসব উৎপাদন সামগ্রী উৎপাদন পরিকল্পনা মোতবেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং বাৎসরিক চাহিদা মোতাবেক প্রয়োগ করা উচিত। তাছাড়া, সময়ে সময়ে মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীর উপদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তরের অথবা গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মৎস্য চাষ বিষয়ক পুস্তিকা এবং সম্প্রসারণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে।

" মৎস্য পক্ষ'৯৫ সফল হউক"

বিদেশ হতে সরাসরি আমদানীকৃত মোল্ট-৭, ওয়াই অরগান, এম, এইচ-১০, মাইক্রোব্যাকটর, ষ্টেরিডোল-২০, মাইক্রো ব্লু, মাইক্রোপার্ল-৮০, ইত্যাদি ব্যবহার করুন । ইহা-

- ঘের ও পুকুরে চাষকৃত বাগদা/গলদা চিংড়ির দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়
- চিংড়ির খোলস পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে
- মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়
- চিংড়ি ও মাছের ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং পরজীবি ঘটিত রোগ প্রতিরোধ করে
- ঘের ও পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের সমতা বজায় রাখে
- চিংড়ি ও মাছ চাষে পানি এবং মাটির পরিমিত গুণাগুণ বজায় রাখে ।

একমাত্র আমদানীকারক

'জেনেটিকা'

১১৪,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং (৩য় তলা),ঢাকা ।

খুলনা ও বাগেরহাটের একমাত্র পরিবেশক ঃ	প্রগতি ফিস অনুমোদিত সাব-এজেন্ট ঃ
প্রগতি ফিস লিমিটেড কে ডি এ এভিনিউ,খুলনা । ফোন ঃ ০৪১-২৪৫৭৭ ২২৩৬৭	**ইউনাইটেড ফিস ফিড এন্ড এগ্রিকালচার** হাজী মহসীন রোড, খুলনা। **চিতলমারী পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড** চিতলমারী বাগেরহাট ।

মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও প্রসারে আধা-নিবিড় প্রযুক্তি প্রয়োগ

এস. এন. চৌধুরী, উপ-পরিচালক
মেছবাহউদ্দিন আহমেদ, উপ-প্রধান
শিবব্রত নন্দী, মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ,

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ আছে। তা ছাড়া ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। সামুদ্রিক জলসীমায় রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ এবং ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। এ সমস্ত প্রজাতির বিচরণ ক্ষেত্র ৪৩.০৮ লক্ষ হেক্টর আভ্যন্তরীণ জলাশয় ২.৬১ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় জলাশয় এবং ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলাশয়ে। আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ১৯৯২-৯৩ সনে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন (প্রজেক্টেড) ছিল প্রায় ৮.২৭ লক্ষ টন এবং সামুদ্রিক জলাশয় থেকে উৎপাদন ছিল ২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। উল্লেখিত জলাশয়ের মধ্যে চাষযোগ্য পুকুর, দীঘি, বাঁওড়, ঘের ইত্যাদি রয়েছে। বাংলাদেশে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ (১৪৬,৮৯০ হেক্টর)। মোট মাছ উৎপাদনে মিঠাপানির অবদান প্রায় ৭৬% এবং এর মধ্যে পুকুর সহ বদ্ধ জলাশয়ের অবদান মাত্র ৩৩.২৫% (পুকুরের উৎপাদন ২৭.৯৩% এবং গড় উৎপাদন প্রায় ১১৬১ কিলো/হেক্টর/বছর)।

বিগত ১০ বছরে নানা কারণেই মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ফলে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ ও চিংড়ির খামার এলাকা ও উৎপাদন সম্প্রসারিত হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনে চাষীরা বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো হচ্ছে ব্যাপক (Extensive), উন্নত ব্যাপক (Improve extensive), আধা-নিবিড় (Semi-intensive) এবং নিবিড় (Intensive)।

ব্যাপক পদ্ধতি

ব্যাপক পদ্ধতি বলতে বুঝায় -

* রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা আংশিক দূর
* খুব কম অথবা খুব বেশী পোনা মজুদ
* পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা নেই
* মাঝে মাঝে অপরিকল্পিত সার ব্যবহার
* খামারের আয়তন বড় অথবা ছোট
* অত্যন্ত কম পুঁজি নির্ভর

উন্নত ব্যাপক পদ্ধতি

উন্নত ব্যাপক পদ্ধতি বলতে বুঝায় -

* রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা সম্পূর্ণ দূর
* মাঝারী ঘনত্বে পোনা মজুদ
* মাসে ১-২ বার সার প্রয়োগ
* শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ (যেমন কুড়া/ভুষি, খৈল)
* পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা নেই
* পুকুরের আয়তন মাঝারি
* মাঝে মাঝে মাছ/চিংড়ি আহরণ এবং একসাথে প্রায় সমস্ত মাছ/চিংড়ি আহরণ

আধা-নিবিড় পদ্ধতি

আধা-নিবিড় পদ্ধতি বলতে বুঝায় -

* রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা সম্পূর্ণ দূর
* মাঝারি মজুদ ঘনত্ব
* নিয়মিত সার প্রয়োগ (প্রতিদিন/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক)
* নিয়মিত শর্করা ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ (কুড়া/ভুষি, খৈল, ফিশমিল ইত্যাদি)
* প্রয়োজনে পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা
* পুকুরের আয়তন মাঝারি
* মাছ/চিংড়ি ছাড়ার ৩-৪ মাস পর নিয়মিত আংশিক আহরণ এবং পুনঃমজুদ

নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি

নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি বলতে বুঝায় -

* রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা সম্পূর্ণ দূর
* উচ্চতর মজুদ ঘনত্ব
* উন্নত মানের পরিপূর্ণ খাদ্য প্রয়োগ
* নিয়মিত পানি বদল.ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা
* দক্ষ জনশক্তি
* অধিক মূলধন বিনিয়োগ
* ছোট আকারের পুকুর

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপক ও উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদ অধিকতর প্রচলিত। তবে বিশেষ প্রকল্পভুক্ত (যেমন ঃ ডানিডা সাহায্য নির্ভর) অঞ্চলের চাষীরা উন্নত ব্যাপক থেকে আধা নিবিড় খামার ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হচ্ছেন। এসমস্ত ক্ষেত্রে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন প্রচলিত উৎপাদনের চেয়ে ৩-৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (যেমন - প্রচলিত গড় ৪.৭০ কিলো/শতাংশ/বছর থেকে ১২-২৮ কিলো/শতাংশ/বছর)। ফলে অল্প জায়গা ব্যবহার করে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ক্রম হ্রাসমান মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনের পরিপূরক নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ

পদক্ষেপ-১ ঃ রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা দূর করতে পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভাল। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন অথবা চা বীজের খৈল ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে এদের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ক. রোটেনন (৭% ক্ষমতা সম্পন্ন)	ঃ	১৮-২৫ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি পানি।
খ. চা বীজের খৈল	ঃ	১৪৫-১৫০ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি পানি।

পদক্ষেপ-২ ঃ পুকুরের রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করার পর মাটি ও পানির পিএইচ-৬' এর উপর রাখতে এবং ক্ষারত্বের মাত্রা ২০ মিগ্র/লিটার' এর উপর রাখতে পুকুরে পোড়া চুন (CaO) ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহার মাত্রা হচ্ছে ২-৬ কিলো/শতাংশ। পিএইচ ৩-৫' এ ৬ কিলো ব্যবহৃত হলে, পিএইচ ৬-৭' এ ব্যবহৃত হবে ২ কিলো। চুন পাড় সহ সমস্ত পুকুরেই সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পদক্ষেপ-৩ ঃ চুন প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে পুকুরে জৈব ও অজৈব এ দু'ধরনের সারই ব্যবহার করা উচিত। আধা-নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদে সার এবং সম্পূরক খাদ্য দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সার প্রয়োগে মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য প্রোটোজোয়া, রটিফার, ক্লাডোসিরা, কপিপোড ও পুকুর তলায় বসবাসকারী অন্যান্য কেঁচো জাতীয় প্রাণী দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সারের মাত্রা নির্ভরশীল মাটির গুণাগুণের উপর, যেমন ঃ দো-আঁশ মাটির তুলনায় এটেল ও বেলে মাটিতে সার বেশী লাগে (ক্ষেত্র বিশেষে প্রায় ৩০-৫০% বেশী)।

এক্ষেত্রে সার প্রয়োগের সাধারণ নমুনা মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

সার	প্রস্তুতিকালীন মাত্রা	পোনা ছাড়ার পর দৈনিক মাত্রা
গোবর অথবা	৫-৭ কিলো/শতাংশ	২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ
কম্পোষ্ট অথবা	৮-১০ " "	৩০০-৪০০ " "
হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা	৩-৫ " "	১৫০-২০০ " "
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ	৪-৫ " "
টিএসপি	৫০-৭৫ " "	৩ " "

জৈব ও অজৈব সার ৩-৪ গুণ পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ২৪ ঘন্টা পচিয়ে রোদ্রালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে অধিকতর ভাল মৎস্য খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তবে পুকুরের সাধারণ উৎপাদনশীলতা পরিমাপে সেকী ডিস্ক/গ্লাস/হাতের সহায়তা নেয়া যায়।

পদক্ষেপ-৪ ঃ পুকুরে মিশ্রচাষ (গলদা চিংড়ির সাথে কার্প) করা হলে চিংড়ির জন্যে আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। আশ্রয়স্থলের মূল কাজ ৩ টি ঃ খোলস পাল্টানোর পর দুর্বল চিংড়িকে আশ্রয় দেয়া, খাদ্য সৃষ্টিতে সহায়তা (Periphyton) এবং চিংড়ির বিচরণ ক্ষেত্র বৃদ্ধি। আশ্রয়স্থল উপকরণ হিসেবে তাল/নারিকেলের পাতার ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্যে প্রতি ২ শতাংশে ১টি তাল/নারিকেলের পাতা পুকুরের তলদেশে স্থাপন করলেই চলে।

পদক্ষেপ-৫ ঃ পুকুরের সব কিছু ঠিক থাকলে বড় আকারের পোনা ছেড়ে দ্রুত ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পোনার আকার ১০ সেমি' এর উপর হলে ভাল। সাধারণ ভাবে ২৫-৩০ গ্রাম ওজনের পোনা ছাড়লে বিদেশী কার্প (সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প) ৪-৬ মাসের মাঝেই আংশিক আহরণ (>৫০০ গ্রাম) সম্ভব। বড় আকারের পোনার ক্ষেত্রে শতাংশ পতি মজদ ঘনতের নমনা নিম্নরূপ ঃ

প্রজাতি	কার্পের চাষাবাদ	গলদা কার্প মিশ্র চাষ
কাতলা	৪-৫ টি	৪-৫ টি
সিলভার কার্প	৯-১০ টি	৯-১০ টি
রুই	৭-৮ টি	৭-৮ টি
গ্রাস কার্প	১-২ টি	১-২ টি
মৃগেল	৩-৪ টি	×
মিরর কার্প	২-৩ টি	×
গলদা চিংড়ি	×	৩২-৩৫ টি (>৩ সেমি)

পদক্ষেপ-৬ ঃ পোনা ছাড়ার পর নিয়মিত সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান স্থিতাবস্থায় রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সেকী ডিস্কের দৃশ্যমানতা যেন ২৫-৩০ সেমি' এর মধ্যে থাকে।

পদক্ষেপ-৭ ঃ আধা-নিবিড় পদ্ধতির মাছ চাষ অথবা মিশ্রচাষে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার অপরিহার্য। এক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান, মূল্য এবং প্রাপ্যতা-এ ৩ বিষয় প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আধা -নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদে খাদ্যের মধ্যে ২৫-৩০% প্রোটিন থাকা উচিত। যদি নিয়মিত সার দেয়া হয়, তবে মাছ ও চিংড়ি প্রাকৃতিক খাদ্য থেকেই তাদের প্রোটিন চাহিদার প্রায় ৭০% মেটাতে পারে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে কুড়া/ভুষি, সরিষার খৈল, ফিশমিল/শামুকের মাংস, গবাদি-পশুর রক্ত, ক্ষুদি পানা ব্যবহার করা যায়। খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ হার হচ্ছে ঃ কুড়া/ভুষি- ২০%, খৈল-৫০% এবং ফিসমিল/শামকের মাংস-৩০%। এ মিশণে প্রোটিনের মাত্রা প্রায় ৩০%। মাছ ও চিংড়িকে তাদের দেহের ওজনের ৩-৫% হারে দৈনিক খাদ্য দিতে হয়। কার্পের ক্ষেত্রে খাদ্য দিতে হয় সকাল ১০-১১ টায় এবং চিংড়ির ক্ষেত্রে খাদ্য দিতে হয় সন্ধ্যা ৭ টা ও ৯ টায়। চিংড়ি নিশাচর এবং তলদেশের প্রাণী। খাদ্য দিতে খাদ্যদানী ব্যবহার করলে খাদ্যের অপচয় কম হয়। খাদ্যদানীর সাধারণ মাপ হচ্ছে ৮০৮০ সেমি। প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরের জন্যে এ মাপের দু'টি খাদ্যদানী হলেই চলে।

পদক্ষেপ-৮ ঃ মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের জন্যে মাসে একবার নমুনায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে মোট ঘনত্বের ৫-১০ % জীব ভরের নমুনায়ন উত্তম। নমুনায়নের জন্যে ঝাঁকি জাল ব্যবহৃত হতে পারে। তবে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে জাল ফেলার পূর্বে সর্তকতার সাথে আশ্রয়স্থল উপকরণ তুলে ফেলতে হবে।

পদক্ষেপ-৯ ঃ সার ও খাদ্য ব্যবহারের ফলে পানির গুণগত মান খারাপ হতে পারে। তাই মাসে অন্ততঃ একবার সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল করা হলে ভাল। একই সাথে সপ্তাহে একবার পুকুরে হররা টেনে/বাঁশ পিটিয়ে অক্সিজেন মাত্রা বাড়ানো যায়। তাছাড়া শ্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে একই পুকুরের পানি একই পুকুরে ছিটানোর মাধ্যমে পানির মিশ্রণ, গ্যাসের পুঞ্জিভবন হ্রাস ও অক্সিজেন বাড়াতে হবে।

পদক্ষেপ-১০ ঃ উল্লেখিত ব্যবস্থাপনায় পোনা ছাড়ার ৯০-১২০ দিনের মধ্যে ১০-১৫% গলদা চিংড়ি প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম (মাথা সহ) বা ৬ গ্রেডে চলে আসতে পারে। একইভাবে ১২০-১৫০ দিনের মধ্যে বিদেশী কার্পের প্রায় ৩০% মাছ ৫০০ গ্রামের বেশী ওজনে চলে আসতে পারে।

বড় চিংড়ি ও বড় কার্প বিক্রয় করে বিক্রিত সংখ্যার সাথে অতিরিক্ত ১০% যোগ করে নতুন পোনা ছাড়তে হবে। (গলদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। এভাবে ক্রমাগত আহরণ ও অবমুক্তকরণের মাধ্যমে পুকুর থেকে বছরে শতাংশ প্রতি প্রায় ২০ কিলো কার্প এবং মিশ্রচাষে প্রায় ৩-৪ কিলো/শতাংশ গলদা চিংড়ি আহরণ সম্ভব।

পদ্ধতি নির্বাচনে সতর্কতা ঃ আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন যেমন বেশী, তেমনি অর্থ বিনিয়োগ এবং ঝুঁকিও তুলনামূলক ভাবে বেশী। একজন সম্প্রসারণ কর্মী হিসেবে পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিতঃ

* চাষীর আর্থিক সামর্থ্য।
* চাষীর ঝুঁকি নেয়ার মতো ক্ষমতা (আর্থিক এবং মানসিক)।
* চাষীর অভিজ্ঞতা।
* ভৌত-অবকাঠামোগত অবস্থা।
* উপকরণ সমূহের সহজলভ্যতা।
* সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মী হিসেবে চাষীকে সময় দেয়ার মত যথেষ্ট সময়ের প্রাপ্যতা।

মেসার্স ছিদ্দিক মিয়া চৌধুরী

প্রাম– নোয়াগ্রাম, পোঃ– বাজারচোয়ারা
থানা– কতোয়ালী, জেলা– কুমিল্লা

এখানে উন্নত জাতের রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, বিগহেড, কমন কার্প, থাই সরপুটি, মাগুর, চিংড়ীর পোনা উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়।

রেডিয়েন্ট শ্রীম্প হ্যাচারী এন্ড নার্সারী

সোনারপাড়া, উখিয়া
কক্সবাজার

☞ আপনি কি রোগমুক্ত সুস্থ, সবল বাগদা ও গলদা চিংড়ীর পোনা খোজছেন ?

☞ আমরা আপনাকে ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে রোগমুক্ত, সুস্থ, সবল, বাংলাদেশে চাষাবাদের উপযোগী নিজস্ব হ্যাচারীতে উৎপাদিত চিংড়ির পোনা সরাসরি হ্যাচারী হতে সরবরাহ করে থাকি।

☞ আপনার চাহিদা পত্র সহ আজই নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ–

১৫–বি/৫–বি
ব্লক–এফ
মাদ্রাসা রোড
হোমাম্মদপুর
ঢাকা

সান ফ্লাওয়ার মৎস্য খামার
সিদ্দিরগঞ্জ,পাওয়ার হাউজ
আদমজী, নারায়ণগঞ্জ

নজরুল ইসলাম চৌধুরী
সফিকুর রহমান চৌধুরী
উখিয়া, কক্সবাজার
ফোন– (০৩৪১)৪০৩৯ বা
৪০৫৮–৩৫০

মোঃ ছিদ্দিক মিয়া চৌধুরী
ঝাউতলা, কুমিল্লা
ফোন– ০৮১/৬২৮২

মাছের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা

মুহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসেইন
চেয়ারম্যান (ভাঃ)

হিমালয় পর্বতমালার সন্নিকটে ও বিশ্বের বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল জলসম্পদ। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুর দীঘিতে ভরা বিস্তীর্ণ জলাশয় ও জলাধার রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিসহ প্রায় ২.৬০ লক্ষ হেক্টর বদ্ধ জলাশয়, মোট প্রায় ৪৩.০৭ লক্ষ হেক্টর আভ্যন্তরীণ জলাশয়। তাছাড়াও রয়েছে ৪৮০ কিঃমিঃ বিস্তীর্ণ উপকলীয় জলাশয় ও বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরের ৪৮,৩৬৫ বর্গ মাইল (নটিকেল) জলাশয় রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ।

অর্থ শতাব্দি আগেও বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে বেশ সম্পদশালী ছিল। কালের প্রবাহে জনসংখ্যার বিস্ফোরণসহ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে মৎস্য আহরণের পরিমান হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ছিল ৮.১৪ লক্ষ টন যা হ্রাস পেয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৬.৪৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এ সময়ের পর থেকেই বাংলাদেশ মৎস্য চাষ ও মৎস্য শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলনের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১০.৮৭ লক্ষ টনে পৌঁছে, যার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমান ছিল প্রায় ২.৫০ লক্ষ টন। স্বাধীনতার পর থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার টন থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে যার বৃদ্ধির হার প্রায় ৩০০%। সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের এত দ্রুত বিকাশ নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় অগ্রগতি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৪ইং সনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন সৃষ্টি হবার পর পরই মৎস্য শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯৬৪-৬৮ইং সনে ৬-১২ অশ্বশক্তি সম্পন্ন আউট বোর্ড কেরোসিন ইঞ্জিন দ্বারা সুইডিশ *ফ্রিডম ফম হাঙ্গার কেম্পেইন* পকল্পের অধীনে ২৮৫টি দেশী নৌকা যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ইনবোর্ড ইঞ্জিনযুক্ত যান্ত্রিক নৌকার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৬৬-৭২ সময়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রাক পুঁজি বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে সাগর সন্ধানী ও মীন-সন্ধানী গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণা চালানো হলে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে আবিস্কৃত হয়। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার জন্য রাশিয়ান সরকারের অনুদানে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন ১০টি আধুনিক ট্রলার দ্বারা মৎস্য শিকারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রথম প্রয়োগ ও জনশক্তি প্রশিক্ষণের কাজ হাতে নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে বর্তমানে প্রায় ৭০টি চালু ও অচালু ট্রলার রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি চিংড়ি ট্রলার এবং ১৫টি সাদা মাছ ধরার ট্রলার সহ কম বেশী মোট ৬০টি ট্রলার চালু থাকে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে ১৭টি কোম্পানীর ৪২টি চিংড়ি ট্রলার ৩৯৫৮ টন চিংড়ি ও ৬২৪২ টন সাদা মাছ ধরে। আহরিত মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ রপ্তানী করে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। ১৯৭৫-৮০ইং সময়ে ডেনিশ সরকারের অনুদানে কর্পোরেশন প্রায় সাত শতাধিক ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২২/২৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন চালিত যান্ত্রিক নৌকা তৈরী করে জাল ও সরঞ্জামসহ জেলেদের মধ্যে বিতরণ করে। ইতমধ্যে প্রায় দুই হাজার দেশীয় নৌকাও যান্ত্রিকীকরণ করা হয়। বর্তমানে প্রায় ছয় সহশ্রাধিক যান্ত্রিক নৌকা বঙ্গোপসাগর থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ করছে। মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি পচলনের সাথে সাথে মৎস্য পক্রিয়ারকরণ শিল্পেও এক যগান্তরকারী পরিবর্তন এসেছে। দেশ স্বাধীন হবার সময়ে যেখানে মাত্র ৯টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ছিল বর্তমানে সেখানে প্রায় ১০০টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত- করণ কারখানার সংখ্যা কাঁচামাল (চিংড়ি) সরবরাহের সাথে এতই অসঙ্গতিপূর্ণ যে এদের অনেকগুলোই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। কারখানগুলো গড়ে মাত্র ১৫% ক্ষমতায় চালু আছে। বৎসরে ২০০ দিন চালু রাখার হিসেবে এসব প্ল্যান্ট চিংড়ি ও মাছের চাহিদা প্রায় ১.৫৬ লক্ষ টন যার বিপরীতে মাত্র ২১,০০০ টন রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি ও মাছ হিমায়ন করা হয়ে থাকে। মৎস্য অবতরণ বৃদ্ধির সাথে বরফ কল ও বরফ উৎপদনের পরিমাণও বহুগুণ বেড়ে গেছে। জেলেরা তাদের ধৃত মাছ যথাযথভাবে বরফ ব্যবহার করতেও শিখেছে। তবে ইহা এখনও পর্যাপ্ত নয়।

চিংড়ি চাষ এ দেশে প্রায় নতুন। মাত্র এক দশক আগে এর যাত্রা শুরু। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে ৩,১৭১টি চিংড়ি খামারের ৫১,৮১২ হেক্টর জলাশয়ে ৪,৩৮৬ টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছিল। হেক্টর

প্রতি উৎপাদন ছিল মাত্র ৮৫ কোটি। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে ৬৫৬১টি খামারের ১,০৮,২৮০ হেক্টর জলাশয়ে ২৬,০০০ টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৪০ কেজিতে। যদি উৎপাদনের পরিমাণ দশগুণ বৃদ্ধি করা যায় সেক্ষেত্রে এ খাতে বর্তমানের বছরে আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকার পরিবর্তে দশ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে এবং বেসরকারী প্রচেষ্ট অত্যন্ত তৎপর হওয়ায় এ খাতে দারুণ অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এতকিছু সত্বেও একটি মূল ক্ষেত্র এখনও সম্পূর্ণ অবহেলিত রয়ে গেছে। মাছের গুণগত মান ঠিক রাখতে না পারার ফলে দরিদ জেলে সম্প্রদায় মাছের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পোষ্ট-হার্ভেষ্ট বা মৎস্য আহরণ পরবর্তীতে অনেক মাছ পচে গলে জেলেরা বঞ্চিত হয় ন্যায্য মূল্য থেকে আর নিম্নগুণগত মানের মাছ ভক্ষণ করে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীণ হয়। আভ্যন্তরীণ বাজারে শুধু রপ্তানী বাণিজ্যেও দাম পাওয়া যায় অনেক কম। ফলে দেশ বঞ্চিত হয় পচর বৈদেশিক মদা থেকে। রপ্তানী বাণিজ্যে লোকসানের অন্যতম কারণটি সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের দুর্বলতা বা যথাযথ সংখ্যক আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য বন্দর বা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র গড়ে না উঠা। আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ স্পন একটি সামাজিক সেবামলক কমকান্ড হওয়ায় এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা না থাকায় বেসরকারী খাত এতে পুঁজি বিনিয়োগে মোটেই আগ্রহী নহে। রাষ্টায়ত্ব পতিষ্ঠান বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনই একমাত্র সংস্থা যে আধুনিক মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণে করপোরেশনের পায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত করপোরেশন কক্সবাজার, খুলনা, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, রাজশাহীতে পাঁচটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এসব কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৬৬-৬৭ সন থেকে ১৯৭১-৭২ সনে প্রায় ৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে প্রায় ১২২ একর জমির ওপর জাপান সরকারের অনুদানে এক আধুনিক মৎস্য বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। মৎস্য বন্দরের বেসিনের আয়তন প্রায় ৬.৩১ একর এবং এতে প্রায় ৭০টি ১০০ ফুট লম্বা ট্রলার ভিড়াবার ও মাছ উঠানো নামানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ব্যাপক পলি পড়ার কারণে বেসিনটি চালু রাখা সম্ভব হয়নি। করপোরেশন বরিশাল, পাথরঘাটা ও খেপুপাড়ায়ও একটি করে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। স্বার্থপর একশ্রেণীর মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের প্রভাবের কারণে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপসমূহে এবং উপকূল রেখা বরাবর মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর আহরিত মাছের প্রায় ৩০% বা ৭৫,০০০ টন মাছ গুণগতমান নষ্ট হয়। এবং এর মধ্যে আনুমানিক ২৫,০০০ টন মাছ পঁচে যাওয়ার ফলে জেলে সম্প্রদায় ও দেশ ৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়। নিম্ন মানের মাছকে শুটকি তৈরী করে জেলেরা অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ কমানোর চেষ্টা চালান। এসব শুটকিও প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত থাকে। এসব দিয়ে আজকাল হাঁস-মুরগীর খাদ্য বা ফিসমিল তৈরী করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছের পচন ও গুণগতমান খারাপ হওয়ার ফলেই আমরা প্রতি বছর আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা হারিয়ে থাকি। অথচ এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রতি বছর ১০ থেকে ২০টি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ স্পন করা সম্ব। গুণগতমান খারাপ হবার কারণে চিংড়ি রপ্তানি খাতে দেশ কেজি প্রতি প্রায় ২ ডলার কম পেয়ে থাকে। সে হিসাবে ক্ষতি প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এ অবস্থায় নিরসনে উপকূলীয় অঞ্চলের সেন্ট মার্টিন, টেকনাফ, কক্সবাজার, মহেষখালি, সোনাদিয়া কুতুবদিয়া, আনোয়ারা, বাশখালী, সীতাকন্ড, সন্দীপ, হাতিয়া, ভোলা, হাজিমারা, চরফ্যাশন, রাংগামাটি, কূয়াকাটা, আলীপুর, মহীপুর, গলাচিপা, বাগেরহাট, পারেরহাট, দবলারচরসহ গুরুতপূর্ণ স্থানে আধনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, বরফ কল, হিমাগারসহ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি সৃষ্টি ও তার সম্প্রসারণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই গুরুত্বের দাবী রাখে।

জাপানী অনুদানে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম শহরের মনোরখালী ব্রীজঘাট এলাকায় আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধাদি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা। এখানে বছরে ৫০,০০০ টন মাছ অবতরণ করানো সম্ভব হলে জেলেরা প্রতি বছর প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পেতে পারে কিন্তু বাস্তবে জেলেদেরকে ঐ টাকা ক্ষতি হিসাবেই গুনতে হয়। ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে প্রতি বছরই ঐরূপ একটি কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব। তাই, অবতরণকৃত মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে আভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্য উন্নীতকরণের পাশাপাশি জেলে ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকলকেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাপ্ত সুবিধাদির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ

ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

কৃষি নির্ভর জাতীয় অর্থনীতিতে মাছ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর ও ডোবা। এসব জলাশয়ে অতি সহজেই মাছ চাষ করা যায়। আর তাই মাছ চাষকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে চল্‌ছে নানাবিধ প্রচেষ্টা। অল্প জায়গায় অল্প খরচে অধিক উৎপাদন পাওয়াই এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এদেশের গ্রামে গঞ্জে যেমন রয়েছে বড় পুকুর তেমনিভাবে ছড়িয়ে আছে ছোট পুকুর যেগুলোতে সারা বৎসর পানি থাকে না। আর সে কারণেই এসব ছোট পুকুরগুলোকে মৌসুমী পুকুর বলা হয়। একটু পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিলেই এসব মৌসুমী পুকুরে অনায়াসে লাভজনক ভাবে মাছ চাষ করা যায়। কারণ মাছ স্বল্প জায়গা ও পানিতে স্বাচ্ছন্দে বেড়ে উঠতে পারে। সে কারণেই মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের গুরুত্ব

প্রচলিত তথ্যানুযায়ী এদেশের মোট পুকুরের সংখ্যা ১২.৮৮ লক্ষ যার মোট আয়তন ১.৫০ লক্ষ হেক্টর। ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পভূক্ত ৫টি জেলায় পরিচালিত জরীপ অনুযায়ী সেসব এলাকায় প্রকৃত পুকুরের সংখ্যা প্রচলিত সংখ্যার চেয়ে গড়ে শতকরা ২০০-২৫০ গুণ ও আয়তনের দিক থেকে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বেশী পাওয়া গেছে। এসব পুকুরের মাঝে ২-১০ শতাংশের পুকুরের সংখ্যা গড়ে শতকরা ৪৯.৩৯ ভাগ এবং ১১-২০ শতাংশের পুকুরের সংখ্যা গড়ে শতকরা ২৭.৯০ ভাগ। তথ্যানুযায়ী এসব পুকুরের শতকরা ২৪ ভাগই মৌসুমী পুকুর হিসাবে পাওয়া গেছে। আর এসব পুকুরের মালিক মূলতঃ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠি। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ৫-৬ মাসে মৌসুমী পুকুর থেকে প্রতি শতাংশে ১০-১৫ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব যেখানে উৎপাদন খরচ হয় প্রতি শতাংশে কেবলমাত্র ১২৫-১৫০ টাকা। এতে মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ লাভজনক বলেই বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং দেশের এ বিপুল সংখ্যক মৌসুমী পুকুরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করা গেলে একদিকে যেমন মাছের ঘাটতি পূরণ সম্ভব হবে অপরদিকে দেশের প্রচলিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নও সহজতর হবে। প্রকল্পভূক্ত ৫টি জেলার পুকুরের শতকরা গড় সংখ্যা (আকার অনযায়ী) নিম্নে পদান করা হলো ঃ

সারণী ঃ প্রকল্পভূক্ত ৫টি জেলার

পুকুরের শতকরা গড় সংখ্যা (আকার হিসাবে)

পুকুরের আকার (শতাংশ)	জেলা					গড়
	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	কিশোরগঞ্জ	শেরপুর	জামালপুর	
২-১০	৪৩.৯৫	৪৩.০০	৪১.৩০	৬১.৭০	৫৭.০০	৪৯.৩৯
১১-২০	৩১.৮০	২৬.৫০	৩২.১০	২৫.০০	২৪.১০	২৭.৯০
২১-৩০	১২.৬০	১৪.৪০	১৪.২০	৭.১০	৯.১০	১১.৪৮
৩১-৪০	৫.৮৬	৭.৬০	৬.৫০	২.৯০	৪.২০	৫.৪১
৪০ এর উপরে	৫.৯৪	৮.৬০	৫.৮০	৩.৫০	৫.৬০	৫.৮৮

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের সুবিধা

মৌসুমী পুকুর বৎসরের কয়েকমাস শুকনা থাকে বলে বর্ষাকালে এসব পুকুরে প্রচুর মাছের খাবার তৈরী হয়। মৌসুমী পুকুরের তলদেশ পর্যন্ত সূর্য্যের কিরণ পৌঁছায় বিধায় অক্সিজেনের কোন ঘাটতি দেখা দেয় না। পর্যাপ্ত আলো, চুন ও সার প্রয়োগের ফলে মাছ চাষের সহায়ক পরিবেশ বজায় থাকে। পারিবারিক চাহিদা মিটানোর পরও মাছ বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন করা যায়। এতে যেমন চাষীদের আর্থিক সুবিধা হয় তেমনিভাবে অবহেলিত জলজ সম্পদেরও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

মাছ চাষ পদ্ধতি

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ পদ্ধতি ভিন্নতর কোন পদ্ধতি নয়। অন্যসব পুকুরের মাছ চাষ পদ্ধতিরই সমান্তরাল। নিম্নে এ বিষয়ে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

পুকুর নির্বাচন ঃ বসত বাড়ীর কাছাকাছি প্লাবন মুক্ত এলাকায় পুকুর নির্বাচন করতে হবে। পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পতিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাড় উচু করার সুবিধা থাকতে হবে। পুকুরের আয়তন ৫-২০ শতাংশের মধ্যে হওয়া উচিৎ।

পুকুর প্রস্তুতি ঃ সুবিধামত পুকুরটি নির্বাচন করে তা মাছ চাষের উপযোগী করে নিতে হবে। সাধারণভাবে এসব পুকুরের পাড় ভাংগা, আগাছার উপস্থিতি, পাড়ে ঝোঁপ জঙ্গলের সমারোহ ও রাক্ষুসে প্রাণীর প্রার্চুয্যতা দেখা যায়। তাই এসব পুকুরে মাছ চাষ করতে হলে প্রথমেই পুকুরের পাড় মেরামত, আগাছা অপসারণ ও রাক্ষুসে মাছ দুর করা প্রয়োজন।

আগাছা নিধণ ঃ আগাছা মাছ চাষে মারাত্মক অসুবিধা সৃষ্টি করে। এরা সূর্য্যের আলো পড়তে বাধা দেয়, পুকুরের পুষ্টি শোষণ করে নেয় এবং রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। কাজেই পুকুরে আগাছা রাখা চলবে না। সকল রকম আগাছা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। মৌসুমী পুকুরের আগাছা সাধারণতঃ কায়িক শ্রমের মাধ্যমেই দুর করা যায়।

অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ ঃ শোল, বোয়াল, গজার, আইর, চিতল প্রভৃতি মাছ হচ্ছে রাক্ষুসে প্রকৃতির। পুঁটি, মলা, ঢেলা, লাটি, দারকিনা, চান্দা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত মাছ। এরা রাক্ষুসে মাছের মতই চাষোপযোগী মাছর খাবারে ভাগ বসায় এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করে কাজেই মাছ চাষ শুরু করার পূর্বেই রাক্ষুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন পানি শুকিয়ে, জাল টেনে ও বিষ প্রয়োগে। এগুলোর মাঝে *রোটেনন* নামক বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত মাছ অপসারন অধিক যুক্তিযুক্ত। এজন্যে প্রথমেই পুকুরের পানির পরিমান জেনে নিতে হবে। তারপর ১.৫ পিপিএম অথবা ১৮ গ্রাম রোটেনন প্রতি শতাংশ -ফুটে প্রয়োগ করতে হবে। মোট রোটেননের ভাগ ছোট ছোট বল বানিয়ে এবং বাকী ভাগ পানির সাথে মিশ্রিত করে সমগ্র পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের ১৫-২০ মিনিট পর যাবতীয় মাছ মরে যাবে। অতঃপর তা সরিয়ে নিতে হবে। রোটেনন প্রয়োগে মৃত মাছ খাবারের জন্য সম্পূর্ন নিরাপদ।

চুন প্রয়োগ ঃ মাটি ও পানির গুনগত মান এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য চুন প্রয়োগ করা জরুরী। চুন প্রয়োগের ফলে পানির অম্লত্ব দুর হবে, সারের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভাল থাকবে। কাজেই প্রতি শতাংশ পুকুরে ১.০ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমত ঃ চুন পানিতে ভিজাতে হবে এবং গুলিয়ে পুকুরের সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে।

জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ঃ পুকুরের উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করার জন্য জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা জরুরী। কাজেই চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর নিম্নোক্ত হারে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জৈব সার ঃ প্রতি শতাংশে ১.৭৫ কেজি গোবর কিংবা কম্পোষ্ট পানিতে ছিটায়ে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে সারের মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

রাসায়নিক সার ঃ প্রতি শতাংশ পুকুরে ৬০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৯০ গ্রমি টি. এস. পি. প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সারের পরিমাণ বেশী লাগতে পারে। টি,এস,পি, সার কমপক্ষে ১০-১২ ঘন্টা পানিতে ভিজায়ে রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে ইউরিয়া সারের সাথে মিশিয়ে পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে। সার পানিতে ভালভাবে গুলানোর পর পুকুরের উপরিভাগে ছিটিয়ে দিতে হবে।

বানা কম্পোষ্ট স্থাপন ঃ পুকুরে নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে জৈব সারের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পুকুরের যে কোন এক কোনায় বানা কম্পোষ্ট রেখে দিতে হবে। কম্পোষ্ট ফুরিয়ে যাবার সাথে সাথে বানাটি পরিপূর্ণ করে দিতে হবে। প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য ৭০ কেজি কম্পোষ্টের প্রয়োজন হবে। প্রতি ১০০ কেজি কম্পোষ্টের জন্য ৮৮ কেজি সবুজ উদ্ভিদ, ১০কেজি গোবর, ১ কেজি চুন ও ১ কেজি ইউরিয়ার দরকার হবে। সবুজ উদ্ভিদ হিসাবে কচুরীপানা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমত ঃ সবুজ উদ্ভিদ কেটে টুকরা টুকরা করে নিতে হবে এবং কয়েকদিন সূর্যালোকে শুকাতে হবে। আংশিক শুকনা উদ্ভিদ, গোবর, চুন ও ইউরিয়ার সাথে মিশ্রিত করে *বানাতে* রেখে দিতে হবে। আস্তে আস্তে এগুলো পঁচে পুকুরে পুষ্টি সরবরাহ করবে।

পুকুরে ফিডিং রিং স্থাপন ঃ চার ফুট লম্বা চার টুকরা বাঁশ কিংবা গাছের ডালপালা দ্বারা তৈরী একটি বর্গাকার আবেষ্টনীকে ফিডিং রিং বলা হয়। গ্রাস কার্প ও সরপুঁটি সবুজ উদ্ভিদ খেতে ভালবাসে, তাই

এদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফিডিং রিংয়ে প্রতিদিন সবুজ উদ্ভিদ, ক্ষুদিপানা কিংবা কলা পাতা সরবরাহ করা যেতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে এসব সরবরাহ করলে খাবারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ঘাসকে একটা নির্দিষ্ট আবেষ্টনীতে নির্দিষ্ট স্থানে সরবরাহ করলে খাবারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয় । এই আবেষ্টনী পুকুরের সুবিধাজনক যে কোন স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ ঃ পুকুরের পানি সবুজ রং ধারণ করার সাথে সাথে পুকুরে মাছ মজুত করতে হবে। যেহেতু পুকুরের গভীরতা কম ও অল্পদিন পানি থাকবে, তাই এমন জাতীয় মাছ ছাড়তে হবে যেগুলো তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং ৩-৪ মাসের মধ্যে বাজারজাত করা যায়। রুই-কাতলা জাতীয় মাছের বৃদ্ধির হার কিছুটা মন্থর হওয়ায় মৌসুমী পুকুরে এসব মাছের চাষ না করাই ভাল। এসব মাছের স্থলে সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প, থাই সরপুঁটি প্রতিপালন করাই উত্তম। এ বিষয়ে কয়েকটি নমুনা নিয়ে কাজ চালানোর পর তাদের গড় ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে দুটি নমুনা মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পে চালু আছে। চাষীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এর যে কোন একটি নমুনা অনুসরণ করতে পারেন।

নমুনা - ১

মাছের নাম	আকার	সংখ্যা
সিলভার কাপ	৪-৬"	১৫টি
গ্রাস কাপ	৪-৬"	৩টি
মিরর কাপ	২-৩"	৪টি
কাতলা	৪-৬"	৬টি
সরপুঁটি	২-৩"	২টি
মোট ঃ		৩০টি

নমুনা - ২

মাছের নাম	আকার	সংখ্যা
সিলভার কাপ	৪-৬"	১৫টি
গ্রাস কাপ	৪-৬"	৩টি
মিরর কাপ	২-৩"	৩টি
নাইলোটিকা	২-৩"	৯টি
মোট ঃ		৩০টি

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা ঃ পুকুরে যে পরিমান মাছের খাদ্য উৎপন্ন হয় মাছ মজুত করার কয়েকদিনের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই মাছের খাদ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত ও পরিমিতভাবে পুকুরে রাসায়নিক সার দিতে হবে। তবে বানা কম্পোষ্ট থেকে জৈব সারের সরবরাহ পাওয়া যাবে। পুকুরের পানির রং সবুজ না থাকলে অথবা পানির স্বচ্ছলতা ৩০ সেন্টিমিটার অতিক্রম করলে শতাংশ প্রতি ৬০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৯০ গ্রাম টি. এস. পি. প্রতিবারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

মাছকে সবুজ উদ্ভিদ ও সম্পূরক খাদ্য প্রদান ঃ ফিডিং রিং সব সময় উদ্ভিদ দিয়ে পূর্ণ রাখতে হবে। ক্ষুদি পানা সরবরাহ করতে পারলে ভাল হয়। ক্ষুদি পানা পাওয়া না গেলে গবাদি পশু যে সব ঘাস ও আগাছা খেয়ে থাকে সে সব ঘাস ফিডিং রিংয়ে সরবরাহ করা যেতে পারে। এমনকি কলা পাতাও খাবার হিসাবে সরবরাহ করা যেতে পারে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে মাছকে চালের মিহি কুড়া কিংবা গমের ভূসি খাওয়ানো যেতে পারে। মাছের মোট দৈহিক ওজনের ৪% ভাগ হারে খাবার দুই ভাগ করে একভাগ সকালে ও অপর ভাগ বিকালে নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে দিতে হবে। প্রতি মাসে মাছের নমুনা সংগ্রহ করে পরবর্তী খাবারের মাত্রা বাড়াতে হবে।

মাছের স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধি যাচাই করণ ঃ প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির হার যাচাই করা দরকার। ঝাঁকি জালের সাহায্যে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। মাছের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক না হলে তা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সার ও খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

মাছের রোগ বালাই দমন ঃ মাছের ক্ষত রোগ দেখা দিলে তার প্রতিকারার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগাক্রান্ত পুকুরে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ দেয়া যেতে পারে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে পুকুরের পরিবেশ ভাল থাকলে মাছের রোগ বালাই দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সুতরাং রোগ বালাই হওয়ার ব্যাপারে পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

মাছ আহরণ ও বাজারজাত করণ ঃ মে-জুন মাসে মাছ মজুদ করতে পারলে তিন মাসের মধ্যেই সিলভার কার্প বিক্রি করা যাবে এবং পুনঃরায় নূতন পোনা মজুদ করা যাবে। এক্ষেত্রে যত সংখ্যক মাছ আহরণ করা হয় তার চেয়ে শতকরা ২৫% ভাগ বেশী সংখ্যক মাছ মজুত করা প্রয়োজন। গ্রাস কার্প ও মিরর কার্প ৪-৫ মাসের মধ্যেই বাজারে বিক্রয়যোগ্য সাইজে উপনীত হবে এবং তা বিক্রি করা যাবে। নভেম্বর - ডিসেম্বরের দিকে সমস্ত মাছ বিক্রি করে দিতে হবে। এ নিয়ম - কানুন অনুসরণ করলে প্রতি শতাংশ পুকুর থেকে ১০-১৫ কেজি মাছ পাওয়া যাবে। এবং এ সময়ের মধ্যে গ্রাস কাপ ও মিরর কার্প গড়ে ৫০০-৬০০ গ্রাম ও সরপুঁটি ১০০-১৫০ গ্রাম আকারের হবে। এ নিয়ম মত মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ করলে প্রতি শতাংশ পুকুরে উৎপাদন খরচ হয় ১১৬.৭৪ টাকা এবং মোট আয় হয় ৩২৫.০০ টাকা। এতে নীট লাভ হয় প্রতি শতাংশে ২০৮.২৬ টাকা। নমুনা হিসাবে এর একটি সম্ভাব্য হিসাব নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের সম্ভাব্য

আয় ও ব্যয়ের হিসাব (প্রতি শতাংশ হিসাবে)

ব্যয়				আয়			
খরচের বিবরণ	পরিমাণ	দর(টাকা)	মোট(টাকা)	বিবরণ	পরিমাণ	দর(টাকা)	মোট(টাকা)
১। পুকুর প্রস্তুতি ঃ				ক। সিলভার কাপ	৬.০কেজি	২০	১২০.০০
ক। পাড় মেরামত	—	—	১০.০০	খ। কাতল	১.০কেজি	৪০	৪০.০০
খ। আগাছা পরিস্কারকরণ	—	—	৫.০০	গ। গ্রাস কাপ	১.৫কেজি	৩০	৪৫.০০
গ। চুন	১কেজি	৬.০০	৬.০০	ঘ। মিরর কাপ	১.৫কেজি	৪০	৬০.০০
ঘ। রাসায়নিক সার				ঙ। সরপুটি	১.৫কেজি	৪০	৬০.০০
ইউরিয়া	৬০ গ্রাম	৬.০০	০.৩৬				
টি এস পি	৯০ গ্রাম	৯.০০	০.৮১			১৩কেজি	৩২৫.০০টাকা
ঙ। গোবর	২কেজি	০.২৫	০.৫০				
২। পোনা ক্রয়	৩০টি	১.০০	৩০.০০				
৩। রাসায়নিক সার							
ইউরিয়া	৬০গ্রাম × ২ × ৬.০০ × ৪.২০ = ৭২০ গ্রাম						
টি এস পি	৯০ গ্রাম × ২ × ৬মাস = ১.০৮ কেজি	৯.০০	৯.৭২				
৪। কম্পোষ্ট ঃ							
সবুজ উদ্ভিদ	৬১.৬ কেজি	—	—				
গোবর	৭কেজি	০.২৫	১.২৫				
চুন	০.৭কেজি	৬.০০	৪.২০				
ইউরিয়া	০.৭কেজি	৬.০০	৪.২০				
৫। চালের কুড়া	১৫ কেজি	২.০০	৩০.০০				
৬। মাছ আহরণ	—	—	১০.০০				
মোট			১১৬.৭৪টাকা				৩২৫.০০টাকা

নিট মুনাফা = ৩২৫.০০-১১৬.৭৪

(প্রতি শতাংশে) = ২০৮.২৬ টাকা

হাঁস/মুরগীর সাথে মাছের সমন্বিত চাষ

ডঃ এম. জি. হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
জনাব গৌতম বুদ্ধ দাস, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশে প্রায় ১০(দশ) কোটি হাঁস-মুরগী রয়েছে। এদের বিষ্ঠা কোন উৎপাদন মূলক কাজে ব্যবহার করা হয় না। পাশাপাশি আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই পুকুর রয়েছে। সমন্বিত হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ পদ্ধতিতে হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা পুকুরে সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এ দেশের মৎস্য উৎপাদন অনেক গুণ বাড়ানো সম্ভব। সমন্বিত হাঁস/মুরগী ও মাছ চাষ পদ্ধতিতে হাঁস/মুরগীকে যে খাবার দেয়া হয় তারই উচ্ছিষ্ট এবং হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা ব্যতীত পুকুরে আর অন্য কোন সার বা খাবার প্রয়োগ ছাড়াই উল্লেখযোগ্য পরিমান মাছ উৎপাদন করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে একই জমি দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব বিধায় জমির সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এই পদ্ধতি অবলম্বনে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

* হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার। পুকুরের উপর ঘর তৈরী করে হাঁস/মুরগী পালন করলে কোন প্রকার সার ও মাছের জন্য কোন সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।
* অব্যবহৃত ও পানিতে পড়ে যাওয়া হাঁস/মুরগীর খাদ্য মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
* কিছু কিছু মাছ হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।
* পুকুরের উপর ঘর তৈরী করে হাঁস/মুরগী পালন করলে হাঁস/মুরগীর জন্য আলাদা কোন জায়গার প্রয়োজন হয় না।
* ঘরটি পুকুরের উপর হওয়াতে মাটির সংস্পর্শে থাকে না বলে হাঁস/মুরগীর রোগ বালাইও কম হয়।
* মাছকে আক্রান্ত করে এমন কিছু পরজীবির জীবনচক্র নষ্ট করে হাঁস পুকুরের পরিবেশকে উন্নত রাখে।
* সমন্বিত হাঁস/মুরগীর চাষ খামার থেকে সহজে মাছ, ডিম ও মাংস পাওয়া যায়।

পুকুরের উপর হাঁস/মুরগী পালন পদ্ধতি

পুকুরের উপর হাঁস/মুরগীর ঘর তৈরী

পুকুরের উপর হাঁস/মুরগীর ঘরের আয়তন কত হবে তা নির্ভর করে ঐ ঘরে কতটি হাঁস/মুরগী রাখা হবে তার উপর। সাধারণতঃ প্রতিটি হাঁসের জন্য ১.৫-১.৭৫ বর্গফুট জায়গা দিতে হবে। প্রতিটি ডিম পাড়া মুরগীর জন্য ২.০ বর্গফুট এবং ব্রয়লার মুরগীর জন্য ১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। পুকুরের উপর হাঁস/মুরগীর ঘর তৈরী করলে ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী করতে হবে এবং মেঝেতে এক বাতা হতে অন্য বাতার দুরত্ব ১.২৫ সেঃমিঃ অথবা আধা ইঞ্চির চেয়ে একটু কম হওয়া উচিত যাতে বাতার ফাঁকে মুরগীর পা না ঢুকে আবার ফাঁক দিয়ে মুরগীর বিষ্টা ও উচ্ছিষ্ট খাবার সরাসরি পানিতে পড়তে পারে। হাঁস/মুরগীর ঘরটি পাড় থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দুরে হতে হবে যাতে শুকনা মৌসুমে পানি কমে গেলেও হাঁস/মুরগীর বিষ্টা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য মাটিতে বা শুকনায় না পরে। দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য ঘর দোতালা করে করাই উত্তম। ঘরের মেঝে থেকে ৪ ফুট উঁচুতে চালা করতে হবে। হাঁসের ঘরের বেলায় ঘরের চারিদিকে ২ ফুট উচ্চতা (মেঝে থেকে) পর্যন্ত বাঁশের শক্ত চাটাই বা তল্লা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। বেড়ার উপর থেকে চালা পর্যন্ত চতুর্দিকে বাকী ২ ফুট জালেরমত কেচি বেড়া বা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যাতে ঘরে সঠিকভাবে আলো বাতাস ঢুকতে পারে। হাঁস/মুরগী পালনের ক্ষেত্রে ছনের ঘরই উত্তম। কারণ শীত ও গ্রীস্ম উভয় ঋতুতেই ছনের ঘরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

হাঁস/মুরগীর জাত নির্বাচন

* হাঁসের জাত
(১) খাকি ক্যাম্বেল
(২) ইন্ডিয়ান রানার
(৩) জিন্ডিং
(৪) ক্রস ব্রীড

উপরোক্ত হাঁসের জাতগুলো বৎসরে ২৪০-২৫০ টি ডিম দিতে সক্ষম।

* মুরগীর জাত
ডিমপাড়া মুরগী ঃষ্টারক্রস -৫৭৯
ইছা ব্রাউন
ইছা ব্যবকক
হাই লাইন ব্রাউন
হাইসেক্স
হোয়াইট লের্সহর্ণ
ফাউমি
মাংস উৎপাদনকারী মুরগী ঃ সেভার ষ্টারবো -১৫
আরবার একার
রস
হার্বাড

হাঁস/মুরগীর সংখ্যা

প্রতি বিঘা পুকুরের উপর ৬৬-৭৫ টি হাঁস/মুরগী পালন করলে মাছ উৎপাদনের জন্য কোন প্রকার সার বা খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। হাঁস/মুরগীর এই ঘনত্বে পুকুরের পানি দূষিত হয় না বলে পারিবারিক অন্যান্য কাজেও পানি ব্যবহার করা যায়।

হাঁস/মুরগীর যত্ন ও ব্যবস্থাপনা

১ দিনের হাঁস/মুরগীর বাচ্চাকে ২৮ দিন পর্যন্ত ইলেকট্রিক বাল্ব বা হিটার দ্বারা তাপ দিতে হবে। সাধারণতঃ ১ থেকে ১৪ দিন বয়স পর্যন্ত ৯৫ ডিঃ-৮৫ ডিঃ ফাঃ এবং ১৫ দিন থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত ৮৫-৭৫ ডিঃ ফাঃ তাপ মাত্রার প্রয়োজন পড়ে। হাঁস/মুরগীকে সর্বদা বিশুদ্ধ পানি দিতে হবে এবং ঘরটি পরিস্কার রাখতে হবে। হাঁস/মুরগীর ঘরে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে তার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে।

হাঁস/মুরগীর সুষম খাবার

হাঁস-মুরগীকে সর্বদা ভাল সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে হাঁস/মুরগীর বয়স অনুসারে একটি সুষম রেশনের তালিকা দেয়া হলো।

খাদ্য উপকরণের নাম	(০-৮)সপ্তাহ	(৯-১৭)সপ্তাহ	(১৮-২৮)সপ্তাহ
	%	%	%
* গম ভাংগা/ভুট্টা ভাংগা	৪৮.০	৪৫.০	৪৪.০
* অটোমেটিক মিলের বা ঢেঁকিছাটা চাউলের কুড়া	২০.০	২৪.৫	২৫.০
* শুটকী মাছের গুড়া বা শামুক ঝিনুকের ভিতরের মাংস	১৬.০	১৫.০	১২.০
* তিলের খৈল	১৪.০	১৩.০	১১.০
* ঝিনুকের গুড়া	১.৫	২.০	৭.৫
* লবণ	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০%	১০০%	১০০%

* ১০০ কেজি মিশ্রিত খাদ্যের মধ্যে এমবাভিট জি.এস.১৭ সপ্তাহ পর্যন্ত ২৫০গ্রাম এবং ১৮ সপ্তাহ হতে এমবাভিট 'এল' ২৫০গ্রাম উত্তম রূপে মিশ্রিত করতে হবে।

মাছ চাষ পদ্ধতি

হাঁসের সাথে বা মুরগীর সাথে সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি প্রায় একই ধরণের। এজন্য পুকুর প্রস্থতি অভিন্ন। তবে মাছের প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য হয়।

পুকুর প্রস্থতি ঃ পুকুর প্রস্থতি বলতে প্রধানতঃ পুকুরে মাছের জন্য যে সমস্থ ক্ষতিকারক প্রাণী বা বস্তু থাকে সেগুলোর অপসারণ বা ধ্বংস, পারিপার্শিক অবস্থার উন্নয়ন, চুন দ্বারা মাটি ও পানি শোধন এবং মাছের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীকে বুঝায়। পুকুরের পানি শুকানোর সুবিধা থাকলে প্রথমেই পুকুরের পানি অপসারণ করে পুকুর হতে রাক্ষুসে মাছ এবং বাজে মাছ সম্পুর্ণ ভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের পানি শুকানোর সুবিধা না থাকলে জালটেনে অথবা বিষ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে বা বাজে মাছ মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। রাক্ষুসে বা বাজে মাছ মারার জন্য প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩৭ গ্রাম রোটেনন ব্যবহার করা যেতে পারে। পুকুর হতে পানি শুকানোর পর বিঘা প্রতি ২৫ কেজি চুন পুকুরের তলদেশে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের পানি শুকানো সম্ভব না হলে বিঘা প্রতি ৩৩ কেজি চুন পানিতে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন দেওয়ার অন্ততঃ ৭ দিন পর পুকুরে মাছ ছাড়তে হবে।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়ার হার ও ঘনত

প্রতি বিঘা পুকুরে ৯০০-১৪০০ টি, ৩-৪ ইঞ্চি আকারের পোনা ছাড়া যেতে পারে।

মাছের প্রজাতি	শতকরা আনুপাতিক হার	সম্ভাব্য বার্ষিক একক ওজন
কাতলা	১০	৮০০ গ্রাম
সিলভার কার্প	৩০	১ কেজি
রুই	২৫	৭০০ গ্রাম
মৃগেল	২০	৭০০ গ্রাম
গ্রাস কার্প	১০	২ কেজি
মিরর কার্প/কার্পিও	৫	২ কেজি

* এর সাথে অতিরিক্ত রাজপুঁটি প্রতি শতাংশে ২০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে।

* গ্রাস কার্পকে প্রতিদিন খাদ্যের জন্য পুকুরে কচি ঘাস বা ক্ষুদে পানা বা কলা পাতা সরবরাহ করতে হবে।

মাছের ওজন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রতি মাসে একবার জাল টেনে মাছ ধরে পরীক্ষা এবং ওজন নিয়ে মাছের ওজন স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে কিনা তা দেখা দরকার। ইদানিং মাছের গায়ে মাঝে মাঝে লাল ক্ষত চিহ্ন বা ঘাঁ দেখা যায়। এ অবস্থায় প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন পানিতে মিশিয়ে ছিটেয়ে দিলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং এ রোগের বিস্থার রোধ হয়।

মাছ ধরা

সাধারণতঃ ১০ থেকে ১২ মাস চাষ করার পর প্রতিটি মাছের ওজন বিক্রয় উপযোগী হয়। কিন্তু সিলভার কার্প মাছ মাত্র ৬-৭ মাসেই ১ কেজির মত ওজন হয়ে থাকে। এ সময়ে উল্লেখিত মাছ সমূহ বাজার জাত করে পুনরায় ৩-৪ ইঞ্চি সাইজের সিলভার কার্পের পোনা পুকুরে ছাড়া হলে ১ বছর পূর্তি হতে এগুলো আকার বড় হবে এবং মাছের মোট উৎপাদন অনেক বেশী হবে।

সমন্বিত মুরগী ও মাছ চাষ পদ্ধতিতে ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরে বিপনণযোগ্য মুরগী ও মুরগীর ডিম ও মাছের বার্ষিক উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের হিসাব।

খাত	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
ব্যয়		
বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা	১ বিঘা	১,০০০.০০
* পুকুরের বার্ষিক পত্তনী ও সংস্কার		
* মুরগীর ঘরের অবচিত মূল্য (ঘরের মূল্য ২,৫০০.০০ টাকা, আয়ুস্কাল ২ বৎসর)	—	১,২৫০.০০
* মজুরী	—	১,০০০.০০
* বিবিধ	—	২০০.০০
উপকরণাদি		
* চুন	২৫ কেটি	৭০.০০
* মুরগীর বাচ্চা ১ দিন বয়স ২৬.০০ টাকা প্রতিটি	৬৬ টি	১,৭১৬.০০
* মুরগীর খাদ্য	২৩৭৬ কেটি	১৪,২৫৬.০০
* মুরগীর খাবারদানি ও পানির পাত্র	—	১৫০.০০
* ঔষধ	—	৩০০.০০
* মাছের পোনা	১,৩২০ টি	১,৩২০.০০
* বিবিধ	—	৫০০.০০
	মোট ব্যয়	**২১,৭৬৭.০০**
মূলধণের উপর ব্যাংক সুদ	১৬% হারে	৩,৪৮২.৭২
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	**২৫,২৪৯.৭২**
আয়ঃ		
* ডিম @ টাকা ৮.০০/চারটি	১১,৫৯২ টি	২৩,১৮৪.০০
* মাছ @ টাকা ৩৫.০০/কেজি	৬০০ কেজি	২১,০০০.০০
* মুরগী (১ বৎসর পালনের পর গড় মূল্য ১০০.০০ টাকা প্রতিটি	৬৩ টি	৬,৩০০০.০০
	সর্বমোট আয়	**৫০,৪৮৪.০০**

বিঘা প্রতি প্রকৃত মুনাফা (আয় ৫০,৪৮৪.০০-ব্যয় ২৫,২৪৯.৭২) = ২৫,২৩৪.২৮ টাকা।

পুকুরে হাঁস ও মাছের একত্র চাষ অভিজ্ঞতার নিরীখে এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরে বিপননযোগ্য হাঁস, হাঁসের ডিম ও মাছের বার্ষিক উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের হিসাব।

খাত	পরিমান	মূল্য (টাকা)
ব্যয়		
বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা		
* পুকুরের বার্ষিক পত্তনী ও সংস্কার	১ চিঘা	১,০০০.০০
* হাঁসের ঘরের অবচিত মূল্য (ঘরের মূল্য ২,০০০.০০ টাকা, আয়ুস্কাল ২ বৎসর)	—	১,০০০.০০
* মজুরী	—	১,০০০.০০
* বিবিধ	—	১৫০.০০
উপকরনাদি		
* চুন	৩৩ কেজি	৯৯.০০
* হাঁসের বাচ্চা (৩ সপ্তাহ বয়স)	৭০ টি	১,৪০০.০০
* হাঁসের খাদ্য	২,৪৭৪ কেটি	১৩,৫১৩.০০
* হাঁসের খাবারদানি ও পানির পাত্রের অবচিত মূল্য (পাত্রের মূল্য ৫০০.০০ টাকা, আয়ুস্কাল ৪ বৎসর)।	—	১২৫.০০
* ঔষধ	—	২০০.০০
* মাছের পোনা	১,৩২০ টি	১,৩২০.০০
	প্রকৃত ব্যয় ঃ	২০,১৫৭.০০
মূলধনের উপর ব্যাংক সুদ	১৫% হারে	৩,০২৩.৫৫
	সর্বমোট ব্যয় ঃ	২৩,১৮০.৫৫
আয়ঃ		
* ডিম @ টাকা ৮.০০/প্রতি চারটি	১২,০৪০ টি	২৪,০৮০.০০
* মাছ @ টাকা ৩৫.০০/প্রতি কেজি	৬০০ কেজি	২১,০০০.০০
* হাঁস (১ বৎসর পালনের পর গড় মূল্য @ ৩৫.০০ টাকা প্রতিটি	৭০ টি	২,৪৫০.০০
	সর্বমোট আয় ঃ	৪৭,৫৩০.০০

বিঘা প্রতি প্রকৃত মুনাফা (আয় ৪৭,৫৩০.০০-ব্যয় ২৩,১৮০.৫৫) = ২৪,৩৪৯.০০ টাকা।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকদের সীমিত খামার সম্পদের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার করে মোট খামার উৎপাদন বাড়াতে সমন্বিত হাঁস -মুরগী চাষ অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এই চাষ পদ্ধতিতে হাঁস -মুরগীর বর্জ্য ও বিষ্ঠা জৈব উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে একমাত্র মাছের পোনার খরচ ব্যতীত বিনা খরচে মাছের উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি করা যায়। মাছ ও পুকুরের উপরে হাঁস-মুরগী চাষ সরেজমিনে গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভূতপূর্ব ফল পাওয়া গেছে।গ্রামীণ মহিলারা এধরনের চাষ পদ্ধতি সহজেই পরিচালনা করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ঃ একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি

মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, উপ-প্রধান
ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ডঃ গৌতম বড়ুয়া, উর্ধ্বতন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

এদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় ভাতের সাথে মাছ থাকবে এটাই ঐতিহ্য। এভাবে দেশের আমিষের শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। তথাপি দেশের মাছের উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সে তুলনায় মাছের উৎপাদন বাড়ছেনা। ফলে মানুষের মাথা পিছু মাছ গ্রহনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক তাই মাছের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ছোট-বড়, হাজা-মজা সব জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। আর সে সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তেমনি একটি সম্ভাবনাময় নতুন প্রযুক্তি হলো *ধান ক্ষেতে মাছ চাষ।*

প্রযুক্তির দিক থেকে *ধান ক্ষেতে মাছ চাষ* নতুন হলেও আবহমান কাল থেকে এ দেশে বর্ষা মৌসুমে ধানক্ষেতে নানান জাতের দেশী মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। অতিরিক্ত মাছ ধরার চাপ, মাছের ক্ষত রোগ, প্রতি বৎসর বন্যা বা খরা, মাছের বংশ বৃদ্ধির স্থানগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং ধানক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে আগের মত মাছ পাওয়া যায় না। এ সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্নভাবে মাছের উৎপাদন বাড়ানো দরকার। অল্প খরচে এবং অল্প শ্রমে পরিকল্পিত ভাবে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ধান বাংলাদেশের প্রধান শস্য। এদেশের আবাদি জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়। আবার সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়াতে বোরো ধানের চাষও বাড়ছে। সুতরাং খুব সহজেই সামান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সব ধানের জমিতে মাছ চাষ করা যায়। ধানের সাথে মাছ চাষে বাড়তি ফসল হিসাবে শুধু মাত্র মাছ পাওয়া যায় তাই নয়, বরং মাছ ধানের অনেক ক্ষতিকর পোকা খেয়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া ধানক্ষেতে মাছ চাষের সুবিধা গুলো হলো ঃ

অল্প শ্রমে এবং স্বল্প ব্যয়ে করা যায়।

অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না।

ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।

ধানের আগাছা দমনে সহায়তা করে।

মাছের বর্জ্য ধানের সার হিসাবে কাজে লাগে।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের পদ্ধতি

ক্ষেতের অবস্থা ও অবস্থান অনযায়ী মাছ চাষ দ'ধরণের হতে পারে ঃ

ধানের পরে মাছ চাষ ঃ যে সব নীচু জমিতে বর্ষাকালে ধান চাষ করা সম্ভব হয় না, সেখানে বোরো মৌসুমে ধান চাষের পর আমন মৌসুমে (বর্ষাকালে) মাছ চাষ করা যায়।

ধানের সাথে মাছ চাষ ঃ বোরো এবং আমন উভয় মৌসুমেই ধানের সাথে মাছ চাষ করা যায়। ধানের সাথে মাছ চাষ করার জন্য করণীয় কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে নীচে বণনা করা হলো ঃ

স্থান নির্বাচন ঃ বাড়ীর কাছে যে জমিতে ৩-৪ মাস পানি থাকে বা সেচের মাধ্যমে পানি রাখা সম্ভব মাছ চাষের জন্য এমন জমিই সবচেয়ে ভাল।

ক্ষেত প্রস্তুত করণ ঃ যে জমিতে মাছ চাষ করা হবে তার চার পাশের আইল এমন ভাবে উঁচু করে বাধঁতে হবে যাতে বন্যার পানিতে বা অতি বৃষ্টিতে মাছ পালিয়ে যেতে না পারে।

গর্ত খনন ঃ মাছ আহরণে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মাছের আশ্রয়ের জন্য জমির এক কোনে একটি ১.০-১.৫ মিটার গভীর গর্ত করতে হবে। গর্তের আয়তন সমস্ত জমির শতকরা ৩-৪ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়।

নালা খননঃ সমস্ত জমি থেকে মাছ যাতে সহজেই গর্তে চলাচল করতে পারে এজন্য জমিতে প্রয়োজনীয় নালা তৈরী করতে হবে। নালার প্রশস্ততা ০.৩ মিটার এবং গভীরতা ০.৩ মিটার হলেই চলবে।

জমিতে পানি প্রবেশ এবং অতিরিক্ত পানি বের করার জন্য প্রয়োজনীয় পথ তৈরী করতে হবে এবং পথে জাল স্থাপন করতে হবে যাতে মাছ পালিয়ে যেতে না পারে।

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ ঃ জমি সমতল করে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভালভাবে চাষ ও মই দিতে হবে। মাটির উর্বরতা ও ধানের জাতের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়া, ১৫৩ কেজি টি.এস.পি., ৭৭ কেজি এম.পি এবং ১২৮ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া সারের মোট পরিমাণ তিনভাগে ভাগ করে তিন কিস্তিতে ধান রোপনের ৩০, ৪৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য এ সব রাসায়নিক সার মাছের কোন ক্ষতি করে না।

ধানের জাত ঃ যে কোন জাতের ধানের সাথেই মাছ চাষ করা যায়। তবে যে সব ধান বেশী পানি সহ্য করতে পারে এবং গাছ বেশী লম্বা হয় না, এমন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান লাগানো উচিত।

ধান রোপন ঃ ধান সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেঃ মিঃ এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেঃ মিঃ হতে হবে।

পোনা মাছ ছাড়া ঃ সাধারণত দ্রুত বর্ধনমীল এবং অল্প সময়ে খাবার যোগ্য হয় এবং ধানের ক্ষতি করে না এমন প্রজাতির পোনা সে সব মাছ ছাড়তে হবে। দেখা গেছে ধান ক্ষেতে সরপুটি, কমন কার্প বা মিরর কার্প এবং নাইলোটিকা ভাল ফলন দেয়। এ সব মাছের মিশ্রছাষ সবচেয়ে লাভজনক। এককচাষের ক্ষেত্রে সরপুঁটি বা নাইলোটিকার বেলায় হেক্টর প্রতি ২৫০০-৩০০০ পোনা এবং কমন কার্পের বেলায় হেক্টর প্রতি ২৫০০-৩০০০ পোনা ছাড়া যায়।

দুই প্রজাতির চাষের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার মাছ অর্ধেক সংখ্যায় ছাড়তে হবে।

তিনি প্রজাতির চাষের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২০০০ সরপুঁটি, ২০০০ কমন কার্প এবং ১০০০ নাইলোটিকা ছাড়তে হবে। মাছের পোনা যথা সম্ভব বড় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধান রোপনের ১৫-২০ দিন পর যখন ধান ভালভাবে জমিতে লেগে যাবে এবং দু' একটি কুশি ছাড়বে তখন জমিতে পানি দিয়ে পোনা ছাড়তে হবে।

ধানের পরিচর্যা ঃ ধান রোপনের পর ১৫-২০ দিন পর্যন্ত জমিতে ৩-৪ সেঃ মিঃ পানি রাখতে হবে এবং এর মাঝে ধানের দু'-একটি কুশি ছাড়লে জমিতে ১০-১২ সেঃ মিঃ ইঞ্চি পানি ঢুকিয়ে মাছ ছাড়তে হবে। ধান ও মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে পানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। মাছ থাকা অবস্থায় সব সময় জমিতে পানি রাখতে হবে। মাছ ধানের আগাছা জন্মাতে বাধা দেয়। তথাপি বেশী আগাছা জন্মালে তা' হাত বা নিড়ানী দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। ধানের পোকা বা রোগ দেখা দিলে প্রথমেই কীটনাশক প্রয়োগ না করে *সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা* পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পোনা দমনের নিম্নলিখিত ৫টি পদ্ধতির কার্যকর সমন্বয় ঃ

১) জৈবিক পদ্ধতি - পাখী, মাছ,ব্যাঙ, উপকারী পোকা ইত্যাদি।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি - হাত জাল, আলোক ফাঁদ ইত্যাদি।

৩) বালাই সহনশীল জাতের ধান লাগানো অর্থাৎ যে সব ধানে পোকার আক্রমন কম হয়।

৪) আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি- সুস্থ বীজ, সঠিক দূরত্বে ধান লাগানো, পরিমিত সার প্রয়োগ, জমি আগাছা মুক্ত রাখা ইত্যাদি।

৫) রাসায়নিক পদ্ধতি -সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার।

উল্লেখ্য ধানের পোকার আক্রমন কমানোর জন্য বীজতলায় সিস্টেমিক কীটনাশক যেমন ডাইমেক্রন ব্যবহার করা যায়।

মাছের পরিচর্যা ঃ ধান ক্ষেতে মাছের জন্য বৈচিত্রময় প্রচুর খাদ্য থাকে। সুতরাং মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ আবশ্যকীয় নয়। তথাপি মাছকে তাড়াতাড়ি বড় করার জন্য নিয়মিত গোবর, ক্ষুদিপানা এবং মাছের দেহের ওজনের ২-৩ শতাংশ পরিমাণ চাউলের কুঁড়া দেয়া যেতে পারে। অনেক সময় ধান ক্ষেতের পানি খুব গরম হয়ে যায়। এ সময়ে মাছকে আশ্রয় দানের জন্য গর্ত বা নালায় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় টোপাপানা দেয়া যেতে পারে। স্বল্প সময়ের জন্য ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের রোগ কোন সমস্যা নয়। এছাড়া যদি ধান ক্ষেতে কীটনাশক ছিটানো প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে পানি কমিয়ে দিয়ে মাছ গুলিকে গর্ত এবং নালায় নিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ধান ও মাছ আহরণ ঃ আহরণের পূর্বে ক্ষেতের পানি কমিয়ে দিয়ে মাছ গুলিকে গর্তে নিয়ে প্রথমে ধান কাটতে হবে, এর পর নালা ও গর্ত থেকে পানি সেচে মাছ আহরণ করতে হবে। এভাবে সঠিক উপায়ে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করলে ৮০-৯০ দিনে প্রতিটি সরপুঁটি ও নাইলোটিকা গড়ে প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম এবং প্রতিটি কমন কার্প গড়ে ১৫০-১৬০ গ্রাম হতে পারে। ধান ক্ষেতে মাছের বাঁচার হার সাধারণতঃ শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। একক চাষের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২০০-২২৫ কেজি এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি প্রায় ২৫০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পোনার মূল্য ও আনুসাঙ্গিক কিছু খরচ বাদ দিয়েও শুধু মাত্র মাছ উৎপাদনের মূল্য বাবদ একর প্রতি প্রায় ৫-৬ হাজার টাকা আয় করা যায়। ধান ক্ষেত হতে এটি একটি বাড়তি উৎপাদন যা প্রত্যেক ধানচাষী অনুসরন করতে পারেন। এভাবে বাংলাদেশের ধানের আবাদী জমিকে মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের এ বিপুল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এন. জি. ও. এর সম্প্রসারণ কর্মীগণ বহুত্তর দিনাজপর, রংপর, ময়মনসিংহ এবং নোয়াখালী জেলাসমহে সীমিত সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করেছেন এবং আগ্রহী সংযোগ চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। স্থাপিত প্রদর্শনী প্লট গুলো হতে প্রাপ্ত ফলাফল ধান ক্ষেতে মাছ চাষের কর্মসুচী দ্রুত সম্পসারণের সম্ভবনাকে উজ্জল করেছে। এ'লক্ষে কষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের সম্পৃক্ত করা হলে ধান ক্ষেতে মাছ চাষের প্রযুক্তি আরও প্রসার ও ফলপ্রসু হবে। যেহেতু ধান ক্ষেতে মাছ চাষ একটি সমন্বতি কর্মসুচী, সেহেতু কৃষকদের নিকট উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মৎস্যচাষ এবং কৃষি বিষয়ক সম্বন্নিত কর্মসূচী অধিক কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া ধান ক্ষেতে মাছ চাষ সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যাদি কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং গবেষকদের সম্বন্নিত প্রচেষ্টার ফলে সমাধা করা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশে প্রায় ১০ মিলিয়ন হেক্টর ধান ক্ষেত রয়েছে যা মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধান ও মাছ সমন্বিত ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে কয়টি সাদৃশ্যময় পরিবেশ প্রয়োজন তা আমাদের দেশে বিরাজমান রয়েছে। এ পদ্ধতি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু বর্তমান প্রানীজ আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়- যা হবে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

Crescent®

FARMING

THE REAL INNOVATORS OF AGRO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Crescent Farming Complex is a privately owned composite agricultural and aquaculture project. The project started with 13 acres of undeveloped land in 1983. Since then through the diligent work ethic and planning of its founder Chairman Mr. Khalilur Rahman, CFC now holds 120 acres of land with 52 ponds, a complete hatchery for fish breeding, a modern and well equiped laboratory for research work, cattle rearing facilities, plantation comprising various type of trees. Recently CFC has engagged itself in shrimp culture and tissue culture. It has already developed the facilities for both.

For his outstanding achievement in agro-industrial sector, company Chairman was given the President award in 1990. CFC's development and acheivement spread beyond its boundry. It has inspired the local farmers to involve themselves in agro-industries. CFC hopes to help alleviate poverty of the major population of the country by contributing in agro-industrial sector.

CRESCENT FARMING COMPLEX

CORPORATE HEAD OFFICE : CRESCENT CENTRE
36, TOPKHANA ROAD, DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONES : PABX. 865231, 245476, 242969
FAX : 880-2-867148.

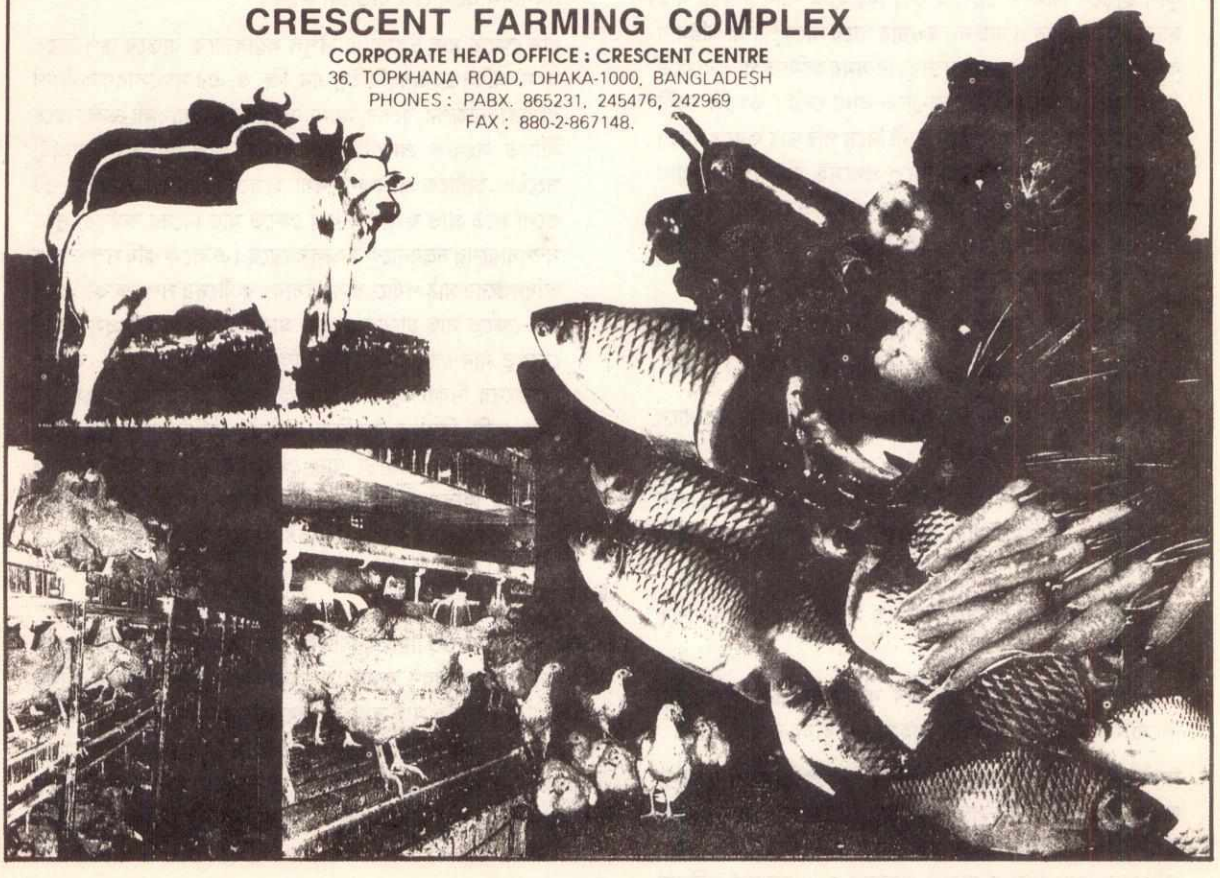

মৎস্য প্রজননে অন্তঃপ্রজনন ও সংকরায়ণ জনিত সমস্যা ও সমাধান

ডঃ এম. জি. হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,
এস, এন, চৌধুরী, উপ-পরিচালক

মাছ চাষ বাংগালীর আবহমানকালের ঐতিহ্য। এই দেশের এমন একটি বাড়ী নেই যে সেখানে একটি দীঘি বা ছোট পুকুর নেই। এইসব দীঘি/পুকুরে বর্ষার পানি হওয়ার সাথে সাথে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে সংগৃহীত পোনা ছাড়া হত। ষাট দশকের মাঝামাঝি হ্যাচারীতে মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের পর থেকেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সরকারী হ্যাচারীর পাশাপাশি ইতোমধ্যে প্রচুর ব্যক্তিগত হ্যাচারী গড়ে উঠেছে। অবাক হওয়ার বিষয় যে, ১৯৮৫ সালে যেখানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার পরিমাণ ছিল ৯,০০০ কেজি তা ১৯৯৩-এ ৪৮,৯৬৪ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত পোনার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে ৫,০০০ কেজিতে নেমে এসেছে। দেশে মাছের পোনা উৎপাদনের প্রবনতা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ দশকের শুরু থেকেই হ্যাচারীতে কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যা দেখা দেয়। হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার অনোৎপাদনশীলতা, দৈহিক বিকৃতি, ব্যাপক মরক ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে ধারনা করা হয় যে, পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন, অপরিকল্পিত সংকরায়ণ ও ছোট আকারের বা নিম্নমানের ব্রুড মাছ ব্যবহারের জন্য এসব সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থার ক্রম অবনতির কথা চিন্তা করেই মার্চ, ১৯৯৪-তে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী ময়মনসিংহে এবং পরবর্তীতে মার্চ, ১৯৯৫-তে মৎস অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী রাজশাহী, যশোর এবং ফরিদপুরে কতিপয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব কর্মশালায় ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারী ও নার্সারী অপারেটর, সরকারী খামারের ব্যবস্থাপক ও কতিপয় সংস্থার প্রতিনিধিদের ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে হ্যাচারীতে প্রজনন সক্ষম মাছের ব্যবস্থাপনা ও অন্তঃপ্রজনন সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মত বিনিময় করা হয়।

প্রাকৃতিক জলাশয়ে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন ভীষনভাবে হ্রাস পাওয়া এবং বর্তমানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা ও প্রজনন সক্ষম ব্রুড ষ্টকে গুনগত মানের অবক্ষয় ও অন্তঃপ্রজনন জনিত সমস্যার প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে মৎস চাষের উন্নয়ন তথা *রূপালী বিপ্লবের* জাতীয় উদ্যোগ দারুনভাবে ব্যাহত হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। তাই দেশের উদ্যোগী হ্যাচারী অপারেটর, প্রান্তিক চাষী ও উৎসাহী জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে এ প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয় ও সমস্যাদির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সমস্যা উত্তরণের জন্য কতিপয় সুপারিশ ও নিয়মাবলী প্রদত্ত হল।

হ্যাচারিতে সৃষ্ট সমস্যাদি

অন্তঃপ্রজনন ঃ হ্যাচারী অপারেটরদের অজ্ঞতার কারনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাদের অনেকেই জানেনা যে, একই জোড়া ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা (যারা ভাই বোন সম্পর্কীয়) পরবর্তীতে লালন করে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হলে বংশকুলে কী সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। কেননা, পোনার ভাই বোনদের প্রজননের মাধ্যমে বংশ পর্যায়ে জীনের সমসত্বতার জন্যে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা বা কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। অন্তঃপ্রজননের কুফল প্রভাব ফেলে সরাসরি মাছের জীবন চক্রের উপর। ফলে অবক্ষয় নেমে আসে এদের প্রজননে, স্বাস্থ্যে এবং বর্ধনশীলতায়। অন্তঃপ্রজনন সমস্যায় জর্জরিত মাছের ষ্টক - পোনা উৎপাদনে সহায়ক হতে পারেনা।

অপরিকল্পিত সংকরায়ণ ঃ মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবনই সংকরায়ণের প্রধান এবং মূল উদ্দেশ্য। ভিন্ন জাত বা ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ হতে পারে। সেজন্যে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ডিজাইন। দুটো ভিন্ন ষ্টক বা প্রজাতির মধ্যে কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবধান অর্থাৎ সার্বিক অসামঞ্জস্যতা বেশী হলে সংকর জাত স্থিতিশীল বা টেকসই হয়না। এমনকি কিছু নিগেটিভ বা বিপরীতধর্মী গুনাগুনের জন্যে পরবর্তী জেনারেশনে এর বিরূপ প্রভাবে কৌলিতাত্ত্বিক শুদ্ধতার সমস্যা বা অবক্ষয় দেখা দিতে পারে।

ইদানিং আমাদের দেশে কিছু কিছু এলাকার হ্যাচারী অপারেটরগণ কোন বাছবিচার ছাড়াই রুই জাতীয় মাছের সংকর পোনা উৎপাদনে উদ্যোগী হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে এক শ্রেনীর হ্যাচারী অপারেটর রুই মাছের ডিমের সংগে কাতল মাছের শুক্র মিশিয়ে বা মিরর কার্পের ডিমের সাথে কাতল বা রুই মাছের শুক্র সংমিশ্রনে সংকর পোনা তৈরী করে কাতলের পোনা বলে চড়া দামে অসাধু ঠিকাদার বা নার্সারী অপারেটরদের নিকট বিক্রি করছেন। এতে জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং দেশীয় শুদ্ধ জাতের কার্প ও অশুদ্ধ সংকর মাছের ক্রসের ফলে প্রাকৃতিক ষ্টকে কৌলিতাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

কম বর্ধনশীল ও ছোট আকারের ব্রুড ফিস ব্যবহারের প্রবণতা

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ হ্যাচারী বা নার্সারী অপারেটরগণ নিজেদের হ্যাচারী বা খামারে উৎপাদিত মাছের পোনার সিংহভাগ বিক্রয়ের পর অবিক্রিত পোনামাছ নিজস্ব পুকুরে লালন-পালন করে থাকেন। বেশী মুনাফার জন্যে মৌসুমের শেষদিকে ঐ ষ্টক থেকে বড় বড় পোনা বেছে বিক্রি করে দেন, আর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের কম বর্ধনশীল পোনাগুলো নিজেদের হ্যাচারী বা খামারে ব্রুড ষ্টক হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে রেখে দেন। তাদের অজ্ঞতার কারণে অজান্তে তারা তাদের উৎপাদন কর্মসূচীতে একটি বড় সর্বনাশ ডেকে আনেন। কারণ অসচেতনভাবে নির্বাচিত এই কম বর্ধনশীল ব্রুড থেকে পরবর্তীতে যেসব পোনা উৎপাদিত হবে সেগুলো বংশগত কারণেই অনুন্নত ও নিম্নমানের হবে। নিম্নমানের পোনার মজুদ সব সময় মাছ উৎপাদন কর্মসুচীতে ঋণাত্বক বা উৎপাদনশীলতা হ্রাসের সর্বনাশ ডেকে আনে।

সমস্যা নিরসনের কতিপয় সুপারিশ ও নিয়মাবলী

ব্রুড মাছ সংগ্রহ

(ক) নদী উৎস থেকে ঃ নদী উৎস থেকে রেনু, ধানী বা অংগুলি পোনা সংগ্রহ করে তা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ আলাদা করে ব্রুড ষ্টক তৈরী করাই উত্তম। প্রথমবার নদী থেকে এভাবে ব্রুড সংগ্রহ করার পর প্রতি তিন বা পাঁচ বৎসর পর পর হ্যাচারীর মোট ষ্টকের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ বিক্রি করে দিয়ে তা নদীর ষ্টক দিয়ে পূরণ করে নেয়া উচিত। এতে প্রজনন কাজে হ্যাচারী অপারেটরগণ সব সময় সুস্থ্য ও সবল পোনা উৎপাদনে সক্ষম হবেন।

(খ) দূরবর্তী হ্যাচারী থেকে ঃ নদী উৎস থেকে ব্রুড মাছের জন্যে পোনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে অন্ততঃ এক হ্যাচারী থেকে অন্য হ্যাচারীতে ব্রুড মাছ বিনিময়ের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। এক হ্যাচারীর প্রজনন সক্ষম স্ত্রী মাছের সাথে অন্য হ্যাচারীর পুরুষ মাছের বিনিময় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার প্রতিকার অনেকটা সম্ভব।

(গ) নিজস্ব হ্যাচারীর পোনার ষ্টক থেকে ঃ ব্রুড মাছ বাছাইয়ের জন্যে নিজস্ব হ্যাচারীর উৎপাদিত পোনা বড় করে তা থেকে সব সময় প্রতি লটের সবচেয়ে বড় বা দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যেক লট থেকে সংগ্রহ করা পোনা একসাথে করে আলাদা পুকুরে মজুদ ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ব্রুড মাছের পরিচর্য্যা ও নির্বাচন

ব্রুড মাছ যেহেতু পোনা উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃতব্য ষ্টক, তাই পুকুরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এদের পরিচর্য্যা করতে হবে। ব্রুড মাছের মজুদ হার হেক্টর প্রতি ১২০০-১৬০০ কেজির বেশী হওয়া উচিত নয়। পরিমিত পরিমাণ পরিস্কার পানি, সুষম প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ, রোগ বালাই হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রজনন উপযোগী কার্প জাতীয় ব্রুড মাছ বাছাই-এ সব সময় নিম্নে বর্নিত সাইজের ও ওজনের ষ্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা আবশ্যক। কেননা ছোট আকারের ব্রুড থেকে কখনো উন্নত মানের পোনা উৎপাদন সম্ভব নয়।

কাতলা ঃ বয়স কমপক্ষে ৩ + বৎসর, ওজন ৩ + কেজি
রুই ঃ বয়স কমপক্ষে ২ + বৎসর, ওজন ১ + কেজি
মৃগেল ঃ বয়স কমপক্ষে ২ + বৎসর, ওজন ১ + কেজি
গ্রাসকার্প ঃ বয়স কমপক্ষে ২ + বৎসর, ওজন ২ + কেজি
সিলভারকার্প ঃ বয়স কমপক্ষে ২ + বৎসর, ওজন ১.৫ + কেজি
বিগহেড কার্প ঃ বয়স কমপক্ষে ২ + বৎসর, ওজন ২ + কেজি
কমনকার্প ঃ বয়স কমপক্ষে ১ + বৎসর, ওজন ১ + কেজি
রাজপুঁটি ঃ বয়স কমপক্ষে ১ + বৎসর, ওজন ০.২ + কেজি

প্রজনন পদ্ধতিগত বিষয়

(ক) নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাত উৎপাদন ঃ উন্নত জাতের মাছ উদ্ভাবন ও উৎপাদনে নির্বাচিত প্রজনন একটি সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দুটো কিংবা তিনটা নদী উৎস থেকে ব্রুড ষ্টক সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে লাইন ব্রিডিং বা ক্রস ব্রিডিং করে পরবর্তী জেনারেশনে সর্বোত্তম গুণাগুণ যেমন সাইজ, স্বাস্থ্য ও বাহ্যিক দিকগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে দুই/তিন জেনারেশনেই শতকরা ৪০-৫০ ভাগ উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব।

(খ) ভাই-বোন সম্পর্কীয় বা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ষ্টকের মধ্যে প্রজনন পরিহার করা ঃ কৌলিতাত্ত্বিক সমসত্বতার জন্যে যেহেতু ভাইবোন সম্পর্কীয় বা অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছের প্রজনন অন্তঃপ্রজনন সমস্যার সৃষ্টি হয় -সেহেতে এটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। হ্যাচারী অপারেটরদের এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে এবং ষ্টকের সমসত্বতার আশংকা নিরসনের জন্যে হ্যাচারীসমুহের মধ্যে ব্রুড ষ্টক বিনিময়ের উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) সংকরায়ণের উদ্যোগ বন্ধ করা ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারী অপারেটরদের মাছের সংকরায়ণের মত একটি জটিল প্রজননের উদ্যোগ পরিহার করাই উত্তম। এতে করে অপরিকল্পিত সংকরায়ণের ফলে মাছের অশুদ্ধ জাত উৎপাদনের প্রবনতা হ্রাস পাবে।

ডিম ও পোনার পরিচর্য্যা

পোনার গুনগত মান রক্ষা এবং অধিক বাঁচার হার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারী অপারেটরদের ইনকিউবেটিং জার, ফানেল এবং সার্কুলার ট্যাংকে পরিমিত ঘনত্বে নিষিক্ত ডিম ও রেনুপোনা রাখতে হবে। অতি ঘনত্বে ডিম/সদ্যফোটা পোনা যে কোন সময় বিনষ্ট হতে পারে। হ্যাচিং সিষ্টেমের সর্বদা পরিস্কার শীতল পানির সরবরাহ চালু রাখতে হবে।

সরকারী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানর ভূমিকা

প্রাইভেট হ্যাচারীতে উন্নত ব্রুড মাছ সরবরাহের জন্যে সরকারী উদ্যোগে ব্রুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া আশু প্রয়োজন। পোনা উৎপাদনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে যেমন যশোর, বগুড়া, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে এই সব প্রস্তাবিত ব্রুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

পোনা উৎপাদন কাজে ছোট আকারের ব্রুড মাছের ব্যবহার প্রয়োজনবোধে সরকারী আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা বাঞ্চনীয়। এ আইন ভংগকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান চালু করা যেতে পারে।

হ্যাচারী অপারেটরদের প্রজনন সক্ষম ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্য্যা ও নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়ে অভিজ্ঞ করার জন্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মৎস গবেষণা ইনষ্টিট্যুট দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রজনন মৌসুমে যেসব এলাকায় কার্প জাতীয় মাছের পোনার ব্যাপক মৃত্যুহার, রোগ বালাইসহ অন্যান্য সমস্যা পরিলক্ষিত হয় সেসব এলাকায় মৎস গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ও মৎস অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

উপসংহার

মাছ চাষের মাধ্যমে সমৃদ্ধি এই জাতীয় শ্লোগানকে কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশে মাছের কৃত্রিম প্রজননে সম্ভাব্য কৌলিতাত্ত্বিক বিপর্যয়জনিত সমস্যাকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। সেজন্যে প্রয়োজন মৎস চাষী, খামার ব্যবস্পক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ এবং পরিকল্পনাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

পুষ্টির উৎস হিসেবে মাছ

মোঃ মোহসীন, সহকারী সচিব

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই নানা প্রকার অপুষ্টি ও অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। পুষ্টির অভাব আর্থ-সামাজিক বিকাশে মারাত্মক অন্তরায়। সুস্থ্য ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত বলেই বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে *জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে*। অপুষ্টির ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় রোগ সংক্রামনের হার বেড়ে যায়। অপুষ্টি, রোগ, কর্মক্ষমতা ও আয় কমে যাওয়া নিম্নোক্ত দুষ্ট চক্রের মত আবর্তিত হয় ঃ-

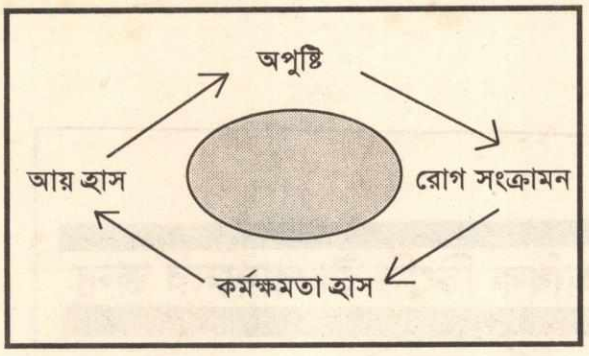

পুষ্টিহীনতা রোধে মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে। কারণ মাছের পুষ্টিমাণ মাংসের পুষ্টিমাণের চেয়ে কম নয় বরং মাছের স্বল্প পুষ্টিমাণ সম্পন্ন *স্ট্রোমা আমিষের* পরিমাণ কম থাকায় তা মাংসের চেয়েও বেশী পষ্টিমাণের হয়। মাছের পুষ্টিরমাণ সম্পকে Dr. C.B.L. Srivastava তাঁর ***A text Book of Fishery Science and Indian Fisheries" বই এ লিখেছেন "Nutritional studies have proved that fish proteins rank in the same class as chicken protein and are superior to milk, beef protein and egg albumen***। মাছে আমিষ, তেল, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন ছাড়া আরো অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশে মিঠা পানির মাছের প্রজাতির সংখ্যা ২৭২ এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির সংখ্যা ৪৭৫। প্রচলিত ধারণা হলো বড়-দামী অর্থাৎ রুই, কাতলা, পাঙ্গাস, চিতল ইত্যাদি মাছের পুষ্টিমাণ বেশী। কিন্তু এ ধারণাটি মোটেই ঠিক নয়। কারণ সব মাছের পুষ্টিমাণ প্রায় সমান।

পুষ্টি উপাদানগুলির মধ্যে আমাদের দেশে আমিষের অভাবই অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখা যায়। বয়স্কদের চেয়ে শিশুরাই এর শিকার হচ্ছে বেশী। আমিষ শরীর গঠনের প্রধান উপাদান। এটি দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করে। প্রতিদিন একজন সুস্থ লোকের জন্য ৪৩.৩০ গ্রাম আমিষের প্রয়োজন। এর মধ্যে ১৫ গ্রাম প্রাণীজ আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়। বাংলাদেশে প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগ আসে মাছ থেকে। মাছে গড়ে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ আমিষ থাকে। মাছের আমিষ অত্যন্ত উন্নত মানের। কারণ এতে দশটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড (Lysine, Arginine, Histidine, Leucine, Isoleucine, Valine, Threonine, Methionine, Phenylalamine and Tryptophan) রয়েছে যা মানুষের জন্য জরুরী। তা ছাড়া এ আমিষ সহজে হজমও হয়।

পুষ্টি উপাদানের মধ্যে খনিজ লবণের গুরুত্বও অপরিসীম। শৈশবে, কৈশোরে ও প্রসূতি অবস্থায় দেহ গঠন ও বৃদ্ধির জন্য খনিজ লবণ প্রয়োজন। মানব দেহের খনিজ লবণের ৪ ভাগের ৩ ভাগই ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। ক্যালসিয়াম শরীরের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ছোট মাছ কাঁটা সহ খেলে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। দেহে নতুন জীবকোষ সৃষ্টিতে এবং দেহ বৃদ্ধিতে ফসফরাসের প্রয়োজন। মাছে ফসফরাসের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। লৌহজাতীয় খনিজ লবণ অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। এ উপাদানটি রক্ত তৈরীতে সাহায্য করে। দেহে এর অভাব হলে দুর্বলতা ও কাজকর্মে অনীহা সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। মাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লৌহ জাতীয় খনিজ লবণও বিদ্যমান।

আয়োডিন নামক মৌলিক পুষ্টি উপাদানের অভাবে মানব দেহে গলগন্ড, বিকলাঙ্গ শিশু, প্রসবোত্তর মৃত্যু, স্নায়বিক বৈকল্য, বধিরতা, বাকশক্তি হীনতা, মানসিক প্রতিবন্ধকতাসহ আরো অনেক রকমের রোগ দেখা দেয়। আয়োডিন শরীরের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর অভাব মানব দেহে ভয়াবহ পরিনাম ডেকে আনতে পারে। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ আয়োডিনের অভাবে ভুগে। এদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই অধিক কারণ তাদের আয়োডিনের চাহিদা বেশী। মূল্যবান এই খনিজ লবণটি সামুদ্রিক মাছে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

মাছের তেলে ওমেগা থ্রিএস নামে এক ধরণের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আছে যা রক্তের অনুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যায়। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেষ্ট্রেরলের মাত্রা কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে যার ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। উল্লেখ্য মাছের তেল দেহের ক্ষতিকারক কোলেষ্ট্রেরল কমায় অপরদিকে উপকারী কোলেষ্ট্রেরলের পরিমাণ বাড়ায়।

ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। মাছে সব রকমের ভিটামিনই আছে, তন্মধ্যে ভিটামিন "এ" এবং "ডি" এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর এদেশের প্রায় ৯ লক্ষ শিশু ভিটামিন "এ" এর অভাবে রাতকানা রোগের শিকার হয়। এ কারণে বছরে প্রায় ৩০,০০০ শিশু অন্ধ হচ্ছে। ভিটামিন "এ" এর অন্যতম উৎস হচ্ছে মাছের তেল। মলা, ঢেলা সহ বিভিন্ন ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" রয়েছে। একজন মানুষের প্রতিদিনের ভিটামিন "এ" এর চাহিদা মেটাতে কয়েকটি ছোট মাছই যথেষ্ট। ভিটামিন "ডি" আমাদের দেহের জন্য একটি জরুরী উপাদান। এর অভাবে রিকেট

নামক রোগ ও হাড় দূর্বল হয় এবং শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন "ডি" থাকে।

মাছের এ সমস্ত পুষ্টি উপাদান ছাড়াও আরো এমন অনেক পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা মানুষের শরীরকে পরিপুষ্ট, রোগমুক্ত ও কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

মাছ শুধু আমাদের প্রিয় খাদ্যই নয় বরং দেহের সকল পুষ্টি সরবরাহের অন্যতম উৎস। এ কারণেই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরী হয়ে পড়ছে। সাথে সাথে উৎপাদিত মাছের বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ মাছ একটি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য। সুষ্ঠুভাবে মাছকে সংরক্ষণ না করলে এর পুষ্টিমাণ অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু মাছ চাষী, মাছ ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন নয়।

একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যবান জাতি। কিন্তু পুষ্টির উন্নয়ন না হলে সুস্থ্য ও সবল জাতি গড়া এবং প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকার দেশের জনসাধারণের পুষ্টি অবস্থা (Nutritional Status) বিবেচনা করে এবং ক্রমবৃদ্ধিমান পুষ্টি সমস্যার সামাধানকল্পে যে সমস্ত দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা অন্যতম। মাছ আমাদের দেহকে সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য অদ্বিতীয় পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নূন্যতম পরিমাণ মাছ রাখতে পারলে স্বাস্থ্যবান, রোগমুক্ত ও অপুষ্টিহীন একটি জাতি গড়া সম্ভব।

বাহারী মাছের একোরিয়াম ব্যবস্থাপনা

আবদুল্লাহ জাহিদ,উপ-সহকারী পরিচালক।
নজরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,

সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত বাহারী মাছ যখন একটি স্বচ্ছ কাঁচের জলজ বাগানে স্বাচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় তা দেখে আমাদের চোখ জুড়ায়। একোরিয়াম হচ্ছে এমনি ধরণের কাঁচের তৈরী কৃত্রিম জলাধার যেখানে বিভিন্ন ধরণের বর্ণালী মাছ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে লালন পালন করা হয়। একোরিয়ামে বাহারী মাছ পোষা এক ধরণের সখ। এই সখ কেবল যে আমাদের বিনোদনের খোরাক জোগায় তাই নয় পানির অতলের জীবিত শীতল প্রানীর রহস্যকেও আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। মাছের আকর্ষনীয় বর্ণচ্ছটা ও মাছ পালনের উপকরণের কিঞ্চিত সহজলভ্যতার কারণে একোরিয়ামে রঙ্গীণ মাছ পোষার সখ এখন আমাদের দেশেও প্রসারতা লাভ করেছে। একোরিয়ামে বাহারী মাছের ব্যবস্থাপনার জন্য যেটি প্রয়োজন তা হল এ বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহ ও যথাযথ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। এখানে একোরিয়ামে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ-

কাঁচ

একোরিয়ামে কাঁচ ব্যবহারের উদেশ্য পানি ধারণ করা এবং মাছ, উদ্ভিদ ও ভিতরকার পরিবেশকে পরিস্কারভোবে দৃশ্যমান করে তোলা, সাধারণতঃ পানির চাপের উপর নির্ভর করে ৬০ মিলি মিটার থেকে ৯০ মিলি মিটার পুরু স্বচ্ছ কাঁচ ব্যবহার করা হয়।

আকৃতি

একোরিয়াম আকৃতিতে বর্গাকার, আয়াতাকার, যেমনই হোক, খেয়াল রাখা দরকার যেন মাছগুলো ভিতরে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। লোহা, এলুমিনিয়াম ও প্লাষ্টিকের কাঠামো ছাড়াও আজকাল বিশেষ ধরণের কাঁচের আঠা ব্যবহার করা হয় যাতে কোন বাড়তি কাঠামোর প্রয়োজন হয় না। একোরিয়ামের ভার বহণকারী হিসেবে লোহা বা কাঠের ষ্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়। পানিসহ ৯০ সেন্টিমিটার একটি একোরিয়ামের ওজন প্রায় ২৫০ পাউন্ড। কাজেই একোরিয়ামের আকৃতির অনুসারে ধারক বা ষ্ট্যান্ড মজুবত হওয়া প্রয়োজন।

আলো ও ঢাকনা

একোরিয়ামে জলজ উদ্ভিদ থাকলে খোলামেলা জায়গায় রাখতে হবে যাতে উদ্দিদ কিছটা হলেও পাকতিক আলো পায়। একোরিয়ামের ঢাকনা হিসাবে টিন, প্লাষ্টিক ও কাঠ ব্যবহৃত হয়। ঢাকনা প্রয়োজন অনুসারে খোলা বা বন্ধের ব্যবস্থা রাখা উচিত। একোরিয়ামের ভিতরে বা ঢাকনাতে বৈদ্যুতিক বাল্ব, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ব্যবহার করা হয়। যাতে দিনরাত সব সময়ই ভিতরটি সুন্দরভাবে দেখা যায়।

পানি

মাছ পানিতে বাস করে। কাজেই একোরিয়ামে ব্যবহৃত পানি দূষণ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ওয়াসার পানিতে যথেষ্ট ক্লোরিন থাকে। কাজেই এ পানি ব্যবহারের আগে কমপক্ষে একদিন পৃথকভাবে স্থিরাবস্থায় রেখে পরে একোরিয়ামে দেয়া উচিত। পানির রং ঘোলা হলে, পানি বেশী সবুজ বা পানিতে গন্ধ হলে তা সাথে সাথেই পরিবর্তন করতে হবে। পানি পরিবর্তনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো সাইফন পদ্ধতি, এতে প্লাষ্টিক বা রবারের নল ব্যবহার করা যায়। পানি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পূর্বে অবশ্যই একোরিয়ামের মাছ অন্য পাত্রে সরিয়ে ফেলতে হবে।

তাপমাত্রা

একোরিয়ামের ভেতরকার তাপমাত্রা ৭২-৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এ স্থিত রাখা প্রয়োজন। এ জন্য তাপযন্ত্র, থার্মোমিটার বা তাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়।

একোরিয়াম ফিল্টার

ফিল্টার দুই ধরণের ঃ বর্ণার ফিল্টার ও তলদেশের ফিল্টার। পানিতে মাছের মল, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ ইত্যাদি ফিল্টার পরিশোধন করে। ফিল্টারের যথাযথ ব্যবহারে একটি বড় একোইরিয়াম অন্ততঃ দু'মাস পানি বদলানোর প্রয়োজন হয় না।

বায়ু সঞ্চালণ

যেহেতু একোরিয়াম একটি কৃত্রিম ছোট জলাধার, তাই মাছের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ূ সঞ্চালন আবশ্যক। বায়ূ সঞ্চালণ যন্ত্র বা এ্যারেটর দিয়ে বাতাল পাম্প করে পানিতে মেশানো হয়।

মাছের প্রজাতি

আমাদের দেশে একোরিয়ামে বাহারী মাছের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৪০ প্রজাতির বিদেশী বাহারী মাছ পাওয়া যায়। অধিকাংশ আসে ভারত, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর থেকে। বিদেশী প্রজাতির মধ্যে সোডটেইল, এনজেল, ডি অকাস, এলিফ্যান্টনোজ, পোরামি, অসকার, গার্জি, গোল্ড ফিস, ব্লাকমলি, টাইগার, সমকার, গার্জি, টাইগার বার্ব, সার্ক, টেট্রা, জেব্রা, সিলভার ডলার ইত্যাদি মাছ সৌখিন একোরিয়াম

চর্চাকারীদের কাছে পরিচিত নাম। এছাড়া আমদের দেশী অনেক প্রজাতি যেমন - খলিশা, পুটি, বানি, গুতুম, বউ, বাইন ইত্যাদি বাহারী মাছ একোরিয়ামে লালন পালন করা যেতে পারে। একোরিয়ামে কোন প্রজাতির মাছ রাখবে তা নির্ভর করবে মাছের স্বভাব ও আকৃতির উপর। যে সমস্ত মাছ শান্ত প্রকৃতির ও ধীরগতি সম্পন্ন তাদের সাথে রাক্ষুসে বা উগ্র প্রজাতির মাছ রাখা সংগত নয়।

মাছের সংখ্যা

একোরিয়ামে মাছের সংখ্যা নির্ভর করে একোরিয়ামের আকৃতি এবং মাছের আকৃতির উপর। ৫ সেন্টি মিটার আকারের এক জোড়া মাছের জন্য ১৬০ বর্গ সেন্টি মিটার স্থান প্রয়োজন। একোরিয়ামে মাছের মজুদ বেশী করা ঠিক নয়।

খাদ্য সরবরাহ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন মাছেরও তেমনি খাদ্যের প্রয়োজন। টিউবিফেক্স, টেনিপাম লার্ভা ইত্যাদি জীবিত খাবার মাছের জন্য সর্বোত্তম। এ ছাড়া সুষম খাবার সমৃদ্ধ প্যাকেট বা টিনজাত বিদেশী মাছের খাদ্যও সরবরাহ করা যেতে পারে। রেনু পোনার খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া লার্ভা ব্যবহার করা হয়। মাছকে কখনও বেশী খাবার দেবেন না, এতে পানি দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

মাছের রোগ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি

একোরিয়ামে মাছের ফুলকা পঁচা, ড্রপসি, উকুন ও ছত্রাকের আক্রমন ও ক্ষতরোগ দেখা দিতে পারে। কপার সালফেট, মেলাকাইট গ্রীণ, পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট, লবণ, ম্যালাকাইট গ্রীণ, ফ্লোরোমাইসেটিন, মিথিলিন ব্লু ইত্যাদি মাছের রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া একোরিয়াম নির্বীজকরণ বা জীবানুমুক্ত করার কাজে ফরমালিন, স্যাভলন, লবন ব্যবহার করা যায়। মাছের রোগমুক্তির জন্য বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য এবং প্রয়োগ মাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেয়া হ'ল ঃ

রাসায়নিক দ্রব্য	মাত্রা/ ঘনত্ব	প্রয়োগের মেয়াদ	যে রোগের জন্য প্রযোজ্য
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	১০-২০ মিগ্রাঃ /লিটার	৩০ মিনিট	পরজীবি, মাছের উকুন
ম্যালাকাইট গ্রীণ	০.১-০.২ "	একটানা ৭ দিন	ছত্রাক, সাদা ফুটকি, ভেলভেট
কপার সালফেট	০.১৫-০.৩ "	একটানা ৪ সপ্তাহ	প্রটোজোর আক্রমনে
ফরমালিন (৪০%)	১৫-২৫ "	একটানা কয়েক দিন	ফুলকা পচা
লবণ	১০ গ্রাঃ/লিঃ		ক্ষতরোগ

বাংলাদেশে বাহারী মাছ ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা

এদেশে ১৯৯০ পর্যন্ত হাতে গোনা ৫/৬টি দোকান রঙীণ মাছের ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৯১ সালে ঢাকায় কাটা বনের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রতিষ্ঠার পরে এখানে প্রায় ৩০টি বাহারী মাছের দোকান গড়ে উঠে। ঢাকা ছাড়া বিভাগীয় সদর ও অন্য কয়েকটি জেলায় একোরিয়ামের দোকান হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি মাছ ও একোরিয়ামের আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানী করছে। যারা নতুন করে একোরিয়াম চর্চা করতে চান তারা সোজা কাটা বনের দোকানগুলোতে যেতে পারেন। এখানে পছন্দের মত দেশী বিদেশী বাহারী মাছ একোরিয়াম, পাম্প, ফিল্টার, মাছের খাবার, একোরিয়াম সজ্জা করন সামগ্রী পাওয়া যায় এবং এগুলো কিনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সখটি সফল করা যেতে পারে।

উপসংহার

একোরিয়াম যে শুধু ঘরের শোভা বর্ধন করে তাই নয় ছেলে বুড়ো সবাইকে অনাবিল আনন্দ দেয়। আর দেশী বিদেশী বাহারী মাছের প্রজনন করাটি যদি রপ্ত করা যায় তবে ঘরে একোরিয়ামে বাহারী মাছের ব্যবস্থাপনা একটি চমৎকার শিল্পকর্ম। এই শিল্পের প্রসারতার সাথে সাথে আত্মিক ও অর্থিক সুবিধাসহ লাভবান হওয়া যাবে।

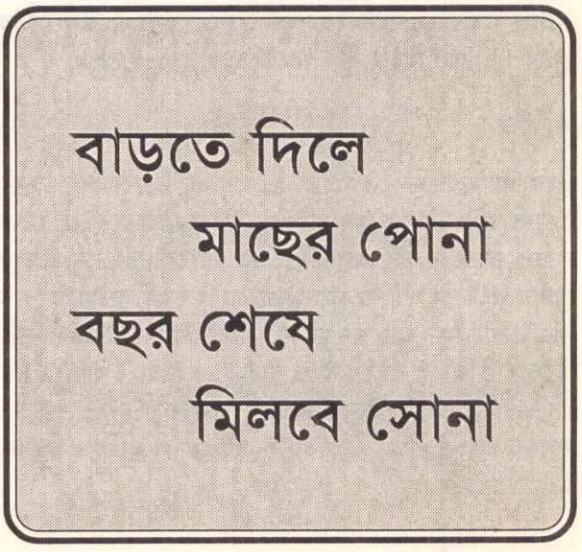

ক্ষুদ্রায়তন গলদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা

প্রফেসর (ডঃ) মাহমুদ -উল- আমীন

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের তৃতীয় বৃহত্তর উৎস্য হচ্ছে চিংড়ি। চিংড়ি চাষ লাভজনক হওয়ায় বগদার সংগে সংগে গলদা চিংড়ি চাষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির পুকুর এবং খাল-বিল নদীর ঘেরে গলদা চাষ সম্ভব বলে এবং ধানচাষ ও কৃষি কাজের সংগে বাগদার মত গলদা চিংড়ির কোন বৈরী সম্পর্ক নেই বলে গলদা চাষের আরো বিস্তৃতি লাভের সম্ভবনা উজ্জল। তবে, এর প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে গলদা পোনার সহজলভ্যতা। এক হিসেব অনুসারে ২০০০ সন নাগাদ বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০-১২ কোটি গলদা পোনার প্রয়োজন হতে পারে। হ্যাচারী উৎপাদিত পোনাই এই প্রয়োজন মেটাতে পারে। হ্যাচারীর মাধ্যমে উৎপাদিত পোনার চাহিদা মেটানো সম্ভব হলে নদী-নালা থেকে পোনা সংগ্রহের ফলে অন্যান্য মাছের বংশ বৃদ্ধিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা কম হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বড় হ্যাচারীর পরিবর্তে ক্ষুদ্রায়তন গলদা হ্যাচারী স্াপনা একটি লাগসই প্রযুক্তি হতে পারে।

গলদা চিংড়ির হ্যাচারী থেকে পোনা উৎপাদনের জন্য গুরুতপূণ বিষয়গুলো হচ্ছে

* লার্ভা লালনের জন্য ১০-১২ পিপিটি বিশিষ্ট লবণাক্ত পানির সরবরাহ,
* হ্যাচারীর প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো ,
* পানির এ্যারেশন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য প্রজনন মৌসুমে ২৪ ঘন্টা অবিরত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা,
* সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিমওয়ালা চিংড়ি প্রাপ্তি,
* লার্ভার জন্য সুষম খাদ্য,
* হ্যাচারীতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা এবং লার্ভা যাতে পারজীবি দ্বারা রোগাক্রান্ত এবং হ্যাচারীতে পানি দূষিত না হয় সে বিষয়ের ব্যবস্থাপনা,
* উৎপাদিত পোনার সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা,
* দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল,
* সুদক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

এ বিষয়গুলোকে মূলত ঃ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়

- ❒ ভৌত অবকাঠামো ও ভৌত পরিবেশ,
- ❒ জৈব বা জ্যান্ত প্রাণী সম্পর্কিত বিষয়, এবং
- ❒ অর্থ ও জনবল ব্যবস্থাপনা।

এসব বিষয়গুলোর সামনে রেখেই ক্ষুদ্রায়তন গলদা চিংড়ি হ্যাচারীর জন্য স্থান নির্বাচন,নক্সা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিধি ঠিক করা দরকার।

স্থান নির্বাচন ঃ

যে কোন হ্যাচারী স্থাপনের জন্য এমন জায়গায় স্থান নির্বাচন করা উচিত, যেখানে -

- ◆ যাতায়াত ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল, কারণ উৎপাদিত পোনা ক্রেতারা যাতে সহজেই পরিবহন করতে পারে।
- ◆ হ্যাচারী পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ সহজে পাওয়া যায় ।
- ◆ প্রচার কাজের জন্য টেলিফোন সুবিধা থাকা বাঞ্চনীয়।
- ◆ হ্যাচারীর জন্য উঁচু জমি প্রয়োজন যেখানে বর্ষার পানি জমবে না এবং হ্যাচারীতে পানির সহজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকবে
- ◆ লার্ভা লালনের জন্য প্রয়োজনীয় লবনাক্ত পানির (১০-১২ পিপিটি) সহজলভ্যতা।

তিন রকম উৎস থেকে হ্যাচারীর জন্য লবনাক্ত পানি পাওয়া যেতে পারে ঃ

- ☞ সাগরের পানি লবণাক্ততা সাধারণতঃ ৩০-৩৪ পিপিটি হয়। এর সঙ্গে পরিমাণমত মিঠা পানি মিশিয়ে হ্যাচারীতে ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে,
- ☞ লবণ তৈরীর ঘের (সল্ট পিটস) থেকে অতি লবণাক্ত পানি (৬০-৭০ পিপিটি) বা ব্রাইন পরিবহণ করে এনে মজুদ করা এবং পরে পরিমাণমত মিঠা পানি যোগ করে হ্যাচারীতে ব্যবহারযোগ্য করা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ গলদা হ্যাচারীতে লার্ভা লালনের জন্য ব্রাইন ব্যবহার করা হচ্ছে,
- ☞ উপকুলীয় অঞ্চলে বহুস্থানে বিশেষ করে চর অঞ্চলে, ভূগর্ভে অল্প গভীরে লবণাক্ত পানির স্তর (সেলাইন এ্যাকউইফার) আছে। এদের লবণাক্ততা ১৩ পিপিটি পর্যন্ত হতে পারে। নোয়াখালীর চর জব্বারে অবস্থিত গলদা হ্যাচারীতে এ ধরণের পানি লার্ভা লালনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

হ্যাচারীর নক্সা

হ্যাচারীর নক্সা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে হ্যাচারীর বিভিন্ন অংশে যে কাজগুলো হবে সেগুলোকে যেন সুচারুভাবে এবং যতদুর সম্ভব কম খরচে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা। হ্যাচারী অবকাঠামো নির্মাণে লোহা বা অন্য ধাতব পদার্থ পরিহার করা উচিত কেননা, এথেকে লার্ভায় বিষক্রিয়া হতে পারে। একটি গলদা হ্যাচারীর ভৌত কাঠামোর প্রধান প্রধান অংশগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের পুকুর, চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চাগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহ বা এ্যারেশন ব্যবস্াপনা, ইত্যাদি।

পুকুরঃ পরিপক্ক স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ি বা ব্রুড প্রণ মজুদ রাখার পুকুর বা ব্রুড পন্ড এবং অবিক্রিত পোনা রাখার জন্য নার্সারী পুকুর।

পুকুরঃ পরিপক্ক স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ি বা ব্রুড প্রণ মজুদ রাখার পুকুর বা ব্রুড পন্ড এবং অবিক্রিত পোনা রাখার জন্য নার্সারী পুকুর।

চৌবাচ্চা ঃ গলদা হ্যাচারীতে প্রধাণত ৪ ধরনের চৌবাচ্চা ব্যবহার করা হয় ঃ

- প্রসেসিং ট্যাংক-এ ট্যাংকে সাগরের পানি/ব্রাইন/ভূগর্ভস্থ পানিকে লার্ভা লালনের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় মিঠা পানি বা অপরিশোধিত লবণ মেশানো হয় এবং পানি থেকে লৌহ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ অপসারণের জন্য অবিরতভাবে ৩৬-৪৮ ঘন্টা এ্যারেশান করা হয়,
- স্টোরেজ ট্যাংক-প্রসেসিং ট্যাংক থেকে ফিল্টারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা পানিকে এখানে সঞ্চিত রাখা হয় এবং লার্ভা লালনের জন্য এখানে থেকে পানি আর একটি ফিল্টারের মাধ্যমে সরাসরি রিয়ারিং ট্যাংকে নেয়া হয়। এ পানিও অবিরতভাবে এ্যারেশান করা হয়,
- রিয়রিং ট্যাংক-এখানে ব্রুড প্রণ থেকে অবমুক্ত লার্ভা সংগ্রহ করে ৫-৬ সপ্তাহ তাদের লালন করা হয় যতক্ষণ না এরা পোষ্ট লার্ভা বা পোনায় পরিণত হয়,
- হোল্ডিং ট্যাংক-লার্ভা, পোষ্ট লার্ভা বা পোনাতে রুপান্তরিত হলে বিক্রির আগে পর্যন্ত মিঠাপানিতে মজুদ রাখার জন্য চৌবাচ্চা। এসব চৌবাচ্চার সর্বক্ষণিক ব্যবহার নেই, সাময়িকভাবে বিক্রি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

উপরোক্ত প্রথম তিন ধরনের ট্যাংকের, বিশেষ করে রিয়ারিং ট্যাংকের জন্য বায়োফিল্টার নির্মাণ করা প্রয়োজন। বায়োফিল্টারের উচ্চতা অপেক্ষা তলক্ষেত্রের (সারফেস এরিয়া) আয়তন গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া প্রজননযোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি একত্রে রাখা, পরিপক্ক ডিম অবমুক্তায়ন ও লার্ভা সংগ্রহ এবং লার্ভার খাদ্য হিসাবে আরর্টিমিয়া সিস্ট ফোটানোর জন্য ছোট ছোট চৌবাচ্চার বদলে বড় মাটির চাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সর্বোচ্চ সন্তোষজনক ফল পেতে হলে রিয়ারিং ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা থেকে স্টোরেজ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা দেড় থেকে দুগুণ এবং প্রসেসিং ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা দু' থেকে আড়াইগুণ বেশী হওয়া দরকার। ঐ রকম ধারণক্ষমতা বিশিষ্ট শুধুমাত্র একটি ট্যাংক না বানিয়ে একাধিক ছোট ট্যাংক বানালে প্রজনন ও পরিক্ষুটন কাজ নির্বিঘ্নে করা যায় এবং উত্তম ফল পাওয়া যায়। আয়তাকার এর পরিবর্তে গোলাকার গড়নের রিয়ারিং ট্যাংক লার্ভা ব্যবস্থাপনায় সহজতর এবং কম সময় সাপেক্ষ। রিয়ারিং ট্যাংকের খাদ্য ব্যবহার যতটা না পানির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল ততটা লার্ভার সংখ্যা (ঘনত্ব)-র উপর নয়। বড় ট্যাংকে তাই অনেক সময় অযথা বেশী খাদ্য এবং আর্টেমিয়া ব্যবহার করতে হয়, ফলে উৎপদান ব্যয় অযথা বৃদ্ধি পায়। রিয়ারিং ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা ২-৩ টনের মত হলে ভাল হয়। ছোট আকারের একাধিক রিয়ারিং ট্যাংক ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

হ্যাচারী চালু থাকার সময় প্রসেসিং, স্টোরেজ এবং রিয়ারিং ট্যাংকগুলো সর্বদাই ব্যবহৃত হয় এদের সার্বক্ষণিক এ্যারেশন এবং এক ট্যাংক থেকে অন্য ট্যাংকে পানি পরিবহণের সুবিধার জন্য এদের একটি সিরিজে অবস্থান সুবিধাজনক। ধাপে ধাপে বিভিন্ন উচ্চতায় এসব ট্যাংক তৈরী করলে পাম্প ছাড়াই স্রোতের মাধ্যমে একটি থেকে আর একটিতে পানি গড়ানো যায়। পানি প্রবাহের সুবিধার্থে সবচেয়ে উঁচুতে প্রসেসিং এবং সবচেয়ে নীচুতে রিয়ারিং ট্যাংকগুলো রাখা প্রয়োজন। হ্যাচারীর পানি যেন সহজেই গড়িয়ে যেতে পারে এবং কোন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরিক্ষুটনকালে মূল এয়ারব্লোয়ার থেকে সব ট্যাংকে প্রবল বেগে বায়ূ প্রেরণ করা হয়। সেজন্য এয়ারব্লোয়ার এবং পানির ট্যাংকগুলো একই সরল রেখায় রাখা হলে এ্যারেশন ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পায়।

প্রসেসিং এবং স্টোরেজ ট্যাংকের আচ্ছাদন টিনের চালা হতে পারে, তবে টিনের নীচে পলিথিন লাইনিং দেয়া ভাল, যাতে ছাদ থেকে ঘনীভুত বাষ্প পানি হয়ে না পড়তে পারে। রিয়ারিং ট্যাংকের ছাদ জুট প্লাষ্টিকের বা খড়ের হতে পারে। খড়ের ছাউনি হলে ভিতরে পলিথিন লাইনিং দেয়া প্রয়োজন। রিয়ারিং ট্যাংকের উপর যাতে কিছু আলো পড়ে সেজন্য ছাদে কয়েকটি স্বচ্ছ জুট প্লাষ্টিক সীট দেয়া যেতে পারে। রিয়ারিং ট্যাংকগুওেলা যেখানে থাকবে তার চারপাশে ছন/মূলী/মাটি/ইটের দেয়াল দেয়া উচিত এবং দেয়ালের ভিতর দিকে কালো পলিথিন বা পেইন্ট ব্যবহার করা উচিত। এতে ঘরের অভ্যন্তরে তাপ সংরক্ষিত হয় আর লার্ভা উচ্চ তাপমাত্রায় তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়।

হোল্ডিং ট্যাংকের জন্য এবং নার্সারী পুকুরে পানি কমে গেলে তা পূরণ করার জন্য মিঠা পানির দরকার হয়। কাছাকাছি বড় পুকুর থাকলে সেখান থেকে অন্য টিউবওয়েলের মিঠা পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কারিগরী ব্যবস্থাপনা

ব্রুড ব্যবস্থাপনা ঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিমওয়ালা চিংড়ির অভাবে অনেক সময় গলদা হ্যাচারীর কর্মদিবস কমে যায়। সে কারণ হ্যাচরীর নিজস্ব ব্রুড পন্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক বড় গলদা চিংড়ি মজুদ রাখা উচিত। সুস্থ্য ও সবল পোণা পেতে হলে বিভিন্ন স্থান থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ করা উচিত।

লবণ পানি ব্যবস্থাপনা ঃ রিয়ারিং ট্যাংকে একই সময় বহু সংখ্যক লার্ভা থাকে বলে এদের বর্জ্য এবং খাদ্যর অবশিষ্ঠাংশের পচনের ফলে সহজেই ট্যাংকের পানি দূষিত হতে পারে। পানি দূষণ মুক্ত রাখার জন্য প্রধাণতঃ দুটি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে - (১) রি-সাইক্লিং অর্থাৎ রিয়ারিং ট্যাংকের পানি সবসময় একটি বায়োফিল্টারের মাধ্যমে ঘুরিয়ে

আনা যাতে দূষিত পদার্থের বিরাট একটি অংশ বায়োফিল্টার শোষণ করে নেয় এবং (২) পানি বদলানো অর্থাৎ প্রতিদিনই রিয়ারিং ট্যাংকের খানিকটা (২০-৫০%) ফেলে দিয়ে স্টোরের ট্যাংক থেকে পানি এনে সমপরিমাণে ভর্তি করা। অল্প পরিমাণ পানির ক্ষেত্রে রিসাইক্লিং ব্যবস্থায় ভাল ফল পাওয়া যায় কিন্তু বেশী পরিমাণ পানি থাকলে এক্সচেঞ্জ ভাল কাজ করে।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ঃ প্রজনন প্রক্রিয়ায় রিয়ারিং ট্যাংক থেকে অতিরিক্ত খাদ্য কণা ও ট্যাংকের গায়ে যে ময়লা জমে প্রতিদিন অন্ততঃ দুবার তা সাইফন করে ফেলে দেয়া প্রয়োজন আর রোগ সংক্রমন প্রতিহত করার জন্য প্রতিটি রিয়ারিং ট্যাংকের জন্য আলাদা আলাদা সরঞ্জাম সেট ব্যবহার করা উচিত।

লার্ভার সাইজ অনুযায়ী খাদ্যকণার সাইজ ছোট বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য বিভিন্ন মাপের স্টেইনলেস স্টীলের ছাকনী ব্যবহার করা দরকার। সরবরাহকৃত খাদ্যের গুণগত মান কোনক্রমেই খারাপ হতে দেয়া উচিত নয়। রোগ সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রিয়ারিং এলাকায় কোন লোক বা প্রাণীকে প্রবেশ করতে দেয়া ঠিক না। জ্যান্ত খাবার হিসেবে এবং লার্ভার খাদ্য ভিটামিন উপদান হিসেবে আর্টেমিয়ার নপ্লিয়াস লার্ভা সরবরাহ করতে হয়। ভাল ব্রান্ডের আর্টেমিয়া ব্যবহার করা উচিত। আর্টেমিয়া বেশ ব্যয়বহুল। হ্যাচারী চালাতে হলে আগাম আর্টেমিয়া মজুদ থাকা বাঞ্ছনীয়।

জনবল ঃ হ্যাচারী কর্মীদের সামান্য ভুলের জন্য হাজার হাজার লার্ভা / পোষ্ট লার্ভা মারা যেতে পারে। সেজন্য হ্যাচারী ম্যানেজার ও টেকনিসিয়ান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রোগ দমন ঃ পৃথিবীর সর্বত্রই চিংড়ি হ্যাচারীতে মাঝে মাঝে রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব এবং মরক দেখা দেয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বস্তুতঃ এই রোগ আক্রমনের জন্য বাংলাদেশের চিংড়ি হ্যাচারীগুলোতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক এবং লাভজনক নয়। নোয়াখালী চিংড়ি হ্যাচারীর পানি, মৃত লার্ভা এবং চৌবাচ্চা থেকে মোট ১২ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে কয়েকটি রোগ উৎপাদন করতে পরে। হ্যাচারীতে যে সমস্ত পরজীবি পাওয়া যায় তাদের দ্বারা সংগঠিত রোগ সমূহের দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন না করতে পারলে হ্যাচারী থেকে পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা যাবে না। বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।

মৎস্য পক্ষ '৯৫ উদ্‌যাপনে
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

বই জার্নাল ও মৎস্য সম্পর্কিত
দ্রব্যাদির বিশ্বস্ত সরবরাহকারী

প্যারাগন এন্টারপ্রাইজেস লিঃ
১৩/৫ আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা।

লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে উপকূলীয় চিংড়ি চাষ উন্নয়ন

ডঃ এম, এ, হোসেন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

দ' দশক পুর্বেও বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানী অপ্রচলিত পণ্য হিসেবেই বিবেচিত হতো। আজ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী করে দেশ বছরে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এর বেশীর ভাগই আসছে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষকৃত চিংড়ি রপ্তানী করে। মোটামুটি ভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে।

দূর্ভাগ্যক্রমে এই বিপুল পরিমান জমি থেকে যে পরিমান চিংড়ি উৎপাদন হবার কথা তার ভগ্নাংশ মাত্র আমরা পাচ্ছি প্রতিবছর। বহু বছরের প্রচেষ্টার পরও বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদনের গড় পৃথিবীর সর্বনিন্মদের মাঝে অন্যতম। এর কারণ সিংহভাগ চিংড়ি খামারেই সত্যিকার অর্থে কোন চাষ প্রক্রিয়াই হাতে নেওয়া হয় না। চাষ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পোনা ছাড়া ও চিংড়ি আহরণের মাঝে সীমাবদ্ধ। আসলে বাংলাদেশে উপকূলীয় চিংড়ি চাষের গোড়াপত্তন শুরু হয় কাক্তালীয়ভাবে। লবণ চাষীরা লক্ষ্য করেন বর্ষা মৌসুমে বাধ দেওয়া বিশাল লবণ ক্ষেত্রে জোয়ারের পানির সাথে আসা বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়িকে আবদ্ধ করে রাখলে শুষ্ক মৌসুমের প্রারম্ভে বেশ কিছু পরিমান বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা যায়।

ইতোমধ্যে চাষীরা বাগদা চিংড়ির পোনা সনাক্তকরণ, আহরণ ও পরিবহণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এর উপর ভিত্তি করে খামারে পোনা ষ্টকিং শুরু হয়। এর পর ধীরে ধীরে খামারে সার প্রয়োগ, পানি পরিবর্তন, রাক্ষুসে মাছ দমন, কৃত্রিম খাবার প্রয়োগ সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটে। ৪/৫ বছর পূর্বে দেশে হ্যাচারী প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগদার পোনা উৎপাদনে সফলতা আসে। সারা দেশের চিংড়ি চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার সুষম ভাবে অগ্রসর হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনার আলোকে না করে দ্রুত আধা-নিবিড় এবং নিবিড় চাষের প্রচলনের ফলে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। তদুপরি ১৯৯৫ সালে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত বাগদা পোনার পরিমান দারুন ভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে বহু খামারে পোনা ছাড়া সম্ভব হয়নি।

নানাবিধ জটিলতা ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রজননক্ষম বাগদা চিংড়ি আহরণ কমে যাওয়া অথবা প্রাকৃতিক উৎসে এদের স্বল্পতার কারণে হ্যাচারী প্রযুক্তি যে হারে প্রসার লাভ করার কথা তদ্রুপ হয়নি। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদেশ থেকে বাগদা ও গলদার পোনা আমদানী শুরু হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে ব্যাপক চিংড়ি মড়ক দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঐ সব দেশ সমূহ থেকে পোনা আমদানীও ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমানে, এসব বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের চিংড়ি চাষ উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ভৌগোলিক-ও পরিবেশগত অবস্থার প্রেক্ষিতে উৎপাদন মুখী প্রযুক্তি ব্যবহার করার পূর্বে তা দীর্ঘ দিনের জন্য টেকসই হবে কিনা বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপকূলীয় চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে যে সব প্রযুক্তির আশু প্রয়োজন তা হলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে পীড়ন (Stress) বিহীন ব্রুড আহরণ। হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন, চিংড়ির সুষম খাবারের উৎপাদন বা যোগান দান, অধিক ঘনত্বে চাষকৃত খামারে পানি উত্তোলন ও নিস্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন, পানিতে ভাসমান এরেটর স্থাপন, রোগ বালাই রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাষকৃত চিংড়ি আহরণের পর এর গুণগতমাণ সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানের হিমায়িত প্রক্রিয়া ব্যবহার।

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন না ঘটিয়ে, ভৌত সুবিধাদির মানোন্নয়ন না করে, পর্যাপ্ত কাঠামোগত পরিবর্তন না করে অতিদ্রুত নিবিড় এবং আধা নিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষের প্রসার বাংলাদেশে বিশেষ করে কক্সবাজারের খুরুশকুল অঞ্চলে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ১৯৮৭ সাল থেকে খুরুশকুল এলাকায় একাধিক আধা-নিবিড় খামার অতি চমৎকার ফলন দিয়ে আসছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে একই এলাকায় হঠাৎ করে ১০/১৫টি খামার একযোগে আধা-নিবিড় ও নিবিড় চাষ শুরু করে। এতে পরিবেশের উপর অহেতুক অধিক চাপ পড়ে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দুষিত হয়ে পড়ে, এক খামারের দুষিত বর্জ্য অন্য খামারে অবাধে প্রবেশের সুযোগ পায়। পরিনামে ১৯৯৪ সালে অজ্ঞাত রোগ (যা বর্তমানে চায়না ভাইরাস হিসেবে পরিগনিত) দেখা দেয় এবং ছড়িয়ে পড়ে যা চিংড়ি মড়কের জন্য দায়ী বলে ধারনা করা হয়। চিংড়ি খামারে বা পুকুরে উৎপাদিত হলেও - এর ব্যবস্থাপনা আশে পাশের পরিবেশের উপর যেমন নিভরশীল -তেমনিভাবে খামারের কার্যক্রম ও পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। অথচ দেশের চিংড়ি সম্পদের উন্নয়ন তথা বেশী উৎপাদনের জন্য একক জমিতে তুলনামুলক উচ্চ ঘনত্বে এর চাষ করা প্রয়োজন। চিংড়ির উৎপাদন অবশ্যই বাড়াতে হবে। আর তা করতে হবে সুপরিকল্পিত উপায়ে।

আমরা যখনই টেকসই অথবা লাগসই প্রযুক্তির কথা বলি তখনি মনে রাখতে হবে -একটি প্রযুক্তি বা কৌশল ক্ষেত্র বিশেষে টেকসই না হলেও অন্যত্র তা টেকসই বা লাগসই হতে পারে। তাইওয়ান, জাপান অথবা থাইল্যান্ডে যে প্রযুক্তির ব্যবহারে চিংড়ি চাষের উন্নয়ন ঘটেছে - হুবহু একই প্রযুক্তি বাংলাদেশেও অপরিবর্তিত ভাবে ব্যবহারে একই ফলাফল দেবে ভাবা ঠিক হবে না। লাগসই প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝবো মৌলিক কিছু পরিবর্তন না করে আর্থ -সামাজিক-ভৌগলিক-জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে একটা কৌশলের কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এর সুষ্ঠু ও লাভজনক ব্যবহার।

উপকুলীয় চিংড়ি চাষে লাগসই যে সব প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো।

চিংড়ি ব্রুড ও পোনা ঃ উপকূলীয় চিংড়ি চাষে প্রথম যে কাঁচামালটির প্রয়োজন তাহলো পোনা। প্রথম দিকে ধারনা করা হতো -সমুদ্রের

বাগদা পোনা সম্পদ অফুরন্ত। মনে রাখা দরকার একমাত্র লবন ছাড়া সমুদ্র সম্পদের কোনটাই অফুরন্ত নয়। যাহোক, টেকসই প্রযুক্তি বিহীন এই সম্পদের আহরণ-চিংড়ি চাষকেই শুধুমাত্র হুমকির মুখে ঠেলে দেয়নি বরং সমুদ্রের মৎস্য সম্পদেরও দারুন ক্ষতি করেছে। বাস্তব কারনে প্রাকৃতিক পোনা আহরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে এর উপর চাপ কমাতে হবে। প্রাকৃতিক পোনার বিকল্প উৎস হচ্ছে হ্যাচারী উৎপাদিত পোনা। হ্যাচারী প্রযুক্তি আমাদের জানা থাকলেও বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝা যাচ্ছে বাংলাদেশে হ্যাচারী প্রযুক্তি একাধিক কারণে লাগসই হয়নি। প্রথমতঃ হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের জন্য প্রজননক্ষম চিংড়ি প্রয়োজন। সমুদ্রে এর পরিমান এবং সর্বাধিক কি পরিমান কোন সময় কোন স্থান থেকে কি ধরনের ব্যবস্থায় ধরতে হবে -এ সম্পর্কে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্রুড চিংড়ি আহরণের কোন নেটওয়ার্কও গড়ে উঠেনি। পরিনামে হ্যাচারী শিল্প মুখ থুবরে পড়ার মুখে। অথচ উৎপাদন শুধু বাড়ানোর জন্যই নয় -বর্তমান উৎপাদন স্তরে থাকতে হলেও আমাদের হ্যাচারীতে প্রচুর পোনা উৎপাদন করতে হবে। হয় আমাদের সমুদ্র থেকে ব্রুড সংগ্রহ করতে হবে নতুবা সাময়িক ভাবে ব্রুড আমদানী করতে হবে। হয় আমাদের সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে নতুবা সাময়িকভাবে ব্রুড আমদানী করতে হবে পোনা আমদানী অপেক্ষা ব্রুড আমদানী সহজতর। তবে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে দেশের জলসীমার প্রাকৃতিক উৎস থেকে এর আহরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বিকল্প ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মূলত বাগদা চিংড়িই চাষ করা হয়ে থাকে। এরা দ্রুত বর্ধনশীল। পোনা সংকট এভাবে চলতে থাকলে উৎপাদন না বেড়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়বে। এই প্রেক্ষিতে বিকল্প হিসেবে বাগদার উপর চাপ কমানোর জন্য কিছু কিছু খামারে এককভাবে অন্য প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি যথা সাদা চিংড়ি (*পেনিয়াস ইন্ডিকাস*) চাষ যেমন করা যায়- তেমনিভাবে বাগদার সাথে এর মিশ্র চাষ করাও সম্ভব।

এতদিন ধারনা করা হতো যে সাদা চিংড়ি মৃদু লবণাক্ত পানিতে বাঁচেনা এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এফ, আর, আই এর সামুদ্রিক কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক চাষে দেখা গেছে সাদা চিংড়ি ৩-৪ পি, পি, টি লবণাক্ততায় দ্রুত বাড়ে এবং ৩-৪ মাসেই বাজার উপযোগী হয়।

প্রাকৃতিতে সাদা চিংড়ির পোনা এখনো পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে পোনা সংগ্রহকারীরা ১টি বাগদার পোনা আহরণকালে একাধিক সাদা চিংড়ির পোনা নষ্ট করে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত সাদা চিংড়ির পোনা ব্যবহারের সাথে সাথে হ্যাচারীতে এদের পোনা উৎপাদন ও সহজতর হবে। কারণ ৯-১২ মাসে চাষকৃত সাদা চিংড়ি প্রজননক্ষম হয় এবং চাষকৃত সাদা চিংড়ি পোনা উৎপাদনে ব্যবহার করে সামুদ্রিক কেন্দ্র ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পেয়েছে। খামারে উৎপাদিত সাদা চিংড়ি সহজেই পোনা উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যাবে। একই খামারে যদি Crop rotation পদ্ধতিতে প্রতিবছর ১টি বাগদা ও একটি সাদা চিংড়ির ফসল তোলা হয়, তবে তা লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাবনা বাগদার একক চাষ অপেক্ষা উজ্জ্বল।

প্রাকৃতিক সম্পদের লাগসই ব্যবহার ঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বাগদা, সাদা চিংড়ি অথবা অন্য যে কোন প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ির চাষই করা হোক না কেন প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীলতা অদুর ভবিষ্যতেও কমবে বলে মনে হয় না। তা- সে ব্রুডের জন্যই হোক অথবা পোনার জন্যই হোক। তাই লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহারে চিংড়ি চাষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রাপ্ত সম্পদের পরিকল্পনা মাফিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার। বাগদা চিংড়ির পোনা ও ব্রুডের সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী নিম্নোক্ত বিষয় সমুহ ঃ

* পরিকল্পনা বিহীন পোনা আহরণ, যা সম্পদ সংরক্ষনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।
* নির্বিচারে ম্যানগ্রোভা বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে চিংড়ি পোনার নার্সিং গ্রাউন্ড বিনষ্ট করছে।
* বিহুন্দি জালের ব্যাপক ব্যবহারে প্রচুর পরিমানে জুভেনাইল ধরা পড়ার কারণে সমুদ্রে রিক্রুটমেন্টের উপর চাপ পড়ে।
* বাণিজ্যিক ভাবে ব্রিডিংগ্রাউন্ড হোক পূর্ণবয়স্ক ও প্রজননক্ষম চিংড়ি আহরণে ব্রুড ও পোনার উপর চাপ পড়ে।

তাই উপরোক্ত বিষয় সমূহ নিয়ন্ত্রন করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ চিংড়ি চাষ উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে।

খামার ব্যবস্থাপনা ঃ চিংড়ি শুধুমাত্র খামার, পোনা, খাদ্য ও পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে চাষ করা যায় না। খামার ব্যবস্থাপনা উচ্চ ঘনত্বে চিংড়ি চাষে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আসলে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সিংহ ভাগই খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অধীনে যেমন অনবরত উৎপাদন ও রোগবালাই প্রতিরোধের মাধ্যমে উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব - তেমনি ভাবে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি চিংড়ি চাষকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। খামার ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা একক খামারের ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে গোষ্ঠি খামার ব্যবস্থাপনার (Community farm management) কথাও বোঝাতে চাই। খামার ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হচ্ছে খামারে যে হারে পোনা ছাড়া হবে সেই অনুপাতে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লাগসই প্রযুক্তি আপেক্ষিক বিষয়। লক্ষ্যমাত্রার আলোকে লাগসই প্রযুক্তি ও সনাতনী খামারের লাগসই প্রযুক্তি আধা - নিবিড় খামারে কোন কাজে আসবে না। আবার আধা-নিবিড় প্রযুক্তি দিয়ে নিবিড় চাষ করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

তবে যে কোন প্রযুক্তিই তখন লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন এর পূণপণিক প্রয়োগ মোটামুটি একই ধরনের ইস্পিত ফলাফল দেবে। খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পোনার ষ্টকিং হার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চাষীরা বেশী উৎপাদনের আশায় অধিক হারে পোনা ছাড়তে আগ্রহী। খামারে পোনার ঘনত্ব বেশী হলে সেই অনুপাতে প্যাডেল হুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পুকুর তৈরীর সময় তলার জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ মাটি সম্পূর্ণ অপসারণ করতে হবে। নিয়মিত পানি পরিবর্তন ও পরিমিত সুষম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে। এ সব গেল খামারের

ব্যবস্থাপনা। এছাড়া গোষ্ঠী ব্যবস্থাপনার যে উৎস থেকে লবণাক্ত পানি সংগ্রহ করা হবে তার গুনগতমান যৌথ উদ্যোগে দুষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। এক এলাকার একটি মাত্র খামারের বর্জ্য যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে তা অন্য সব খামারের চিংড়িকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে।

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষীরা অনেক ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে টেকসই প্রযুক্তি গ্রহন না করে ক্ষেত্রবিশেষে যৌথ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এক খামারে রোগ দেখা দিলে চাষীরা তাড়াহুড়া করে চিংড়ি ধরার পর দূষিত পানি পরিবেশে ছেড়ে দেয়-পরিনামে সমুদ্র এলাকায় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। অথচ যৌথ উদ্যোগে পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা নেয়া হলে তা হবে টেকসই এবং রোগবালাই প্রতিরোধে সর্বোত্তম পন্থা। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় -একগুচ্ছ খামারে পানি গ্রহননালা একদিকে হলে এবং নিস্কাশন নালা সম্মিলিত ভাবে বিপরীত দিকে থাকলে সবার পক্ষে জোয়ারের দূষণমুক্ত পানি গ্রহণ এবং দূষিত বা ব্যবহৃত পানি নিস্কাশন সহজতর হবে এবং চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

চিংড়ি খামারে লাগসই প্রযুক্তির আরেকটি দিক হলো প্যাডেল হুইলের সুষ্ঠু ব্যবহার। প্যাডেল হুইল শুধুমাত্র পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হতেই সাহায্য করে না, বরং এ্যামোনিয়া দূরীকরণ, পানিতে একমুখী স্রোত সৃষ্টি এবং বর্জ্য পদার্থকে কেন্দ্রাভিমুখি করে। কিন্তু প্যাডেল হুইলের স্থান নির্বাচন এবং পানির গভীরতা পরিমিত না থাকলে প্যাডেল হুইল লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে ইস্পিত ফলাফল দেবে না। এছাড়া বৈদ্যুতিক উৎসের ব্যাপারে বাংলাদেশে প্যাডেল হুইলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চিংড়ি খামারসমূহে কোন অবস্থাতেই আধা-নিবিড় চাষের উপরে যাওয়া উচিৎ নয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হলে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে আধা-নিবিড় চাষের মাধ্যমে চিংড়ি চাষে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তবে কোন অবস্থাতেই বর্তমান পর্যায়ে নিবিড় চাষে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। আধা -নিবিড় চাষ বলতে আমরা অন্যান্য ভৌত সুবিধাদির প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে চিংড়ি পোনার ষ্টকিং সর্বাধিক প্রতিবর্গ মিটারে ২৫টির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখাকে বুঝাচ্ছি। প্রাথমিক পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে ১০-১৫টি/বর্গমিটার হারে পোনার সাহায্যে আধা-নিবিড় চাষ ব্যাপক হারে শুরু করা হলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। এই ঘনত্বে খাদ্যের পরিমান এবং বর্জ উৎপাদন পানির প্রাকৃতিক পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বাধাগ্রস্থ করতে পারে না। এর চেয়ে উচ্চ ঘনত্বে অধিক খাবার প্রয়োগের ফলে যে হারে বর্জ্য উৎপাদিত হয় তা পানির প্রাকৃতিক পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বাধাগ্রস্থ করে।

বাংলাদেশে যে পরিমান জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয় তার ভগ্নাংশ মাত্র আধা-নিবিড় বা নিবিড় চাষাধীন। অথচ লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে ইতিমধ্যে উন্নত সনাতনী চাষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এই পদ্ধতির চাষের মাধ্যমে একর প্রতি ৫০০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি আহরণ সম্ভব। এতে চিংড়ি চাষাধীন সিংহভাগ জমিতে উন্নত সনাতনী চাষের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন বর্তমান অবস্থা থেকে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। এর পাশাপাশি কিছু কিছু খামারে আধা-নিবিড় চাষ করা হলে পরিবেশের উপর অহেতুক চাপ পড়বে না। এবং চিংড়ি রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজতর হবে।

বর্তমান পর্যায়ে চিংড়ি চাষ প্রধানতঃ দুটো কারণে হুমকির সম্মুখীন। একটি হচ্ছে পোনার স্বল্পতা, অপরটি হচ্ছে চিংড়ি মড়ক। ইদানিং কালের চিংড়ি মড়ক ইতিপুর্বেকার অপরাপর চিংড়ির রোগ বালাই অপেক্ষা ভিন্নতর । বিশেষজ্ঞদের মতে খামার ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণেই আধা-নিবিড় খামার সমুহে এই মড়ক দেখা দেয়। বর্তমান অবস্থায় রোগমুক্ত চিংড়ি উৎপাদনই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় লাগসই প্রযুক্তি হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন রোগ প্রতিরোধে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। প্রাথমিক অবস্থায় খামার থেকে সম্পূর্ন ব্ল্যাক সয়েল অপসারিত করে এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে তা খামারে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে খামারের তলদেশে ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রয়োগ করে মাটির অম্লতা দূরিকরণের সাথে সাথে পানিতে বাফার সৃষ্টি করতে হবে। পরিমিত পরিমান সার প্রয়োগের মাধ্যমে পানিতে প্ল্যাংকটনিক খাবার সৃষ্টি করে পোনার প্রাথমিকভাবে জীবন্ত খাবারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

খামার যদি আধা-নিবিড় চাষাধীন হয় তবে প্রথম অবস্থা থেকে প্যাডেল হুইলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সর্বাধিক ১ একরে ১ লক্ষ অর্থাৎ প্রতিবর্গমিটারে ২৫টি পোনা হলে -একর প্রতি ১০টি প্যাডেল হুইল ব্যবহার করতে হবে। প্যাডেল হুইল ব্যবহারের সময় খামারে পানির গভীরতা ১.২-১.৫ মিটার রাখা ভালো। এবং এর স্থাপনা পাড় থেকে এমন দুরত্বে স্থাপন করতে হবে যাতে পাড়ের কাছের তলা থেকে ২০ ফুট দূরে থাকে। এতে সব গুলো প্যাডেল হুইল ডিম্বাকারে স্থাপনের ফলে একমুখী স্রোতের সৃষ্টির কারণে বর্জ্য খামারের কেন্দ্রে জড়ীভূত হবে। এতে ফিডিং জোন বর্জমুক্ত থাকবে এবং চিংড়ির রোগাক্রান্ত হবার ভয় কমে যাবে।

যে কোন রোগের ক্ষেত্রেই দেখা যায় -প্রাথমিক অবস্থায় দুর্বল চিংড়ি এতে আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত তা সুস্থ্য চিংড়ির মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। দুর্বল ও আংশিক রোগাক্রান্ত চিংড়ি খামার থেকে দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে খামারে একর প্রতি ৮/১০টি ছোট সাইজের রাক্ষুসে মাছ যেমন ভেটকি তাইল্যা ছেড়ে দেওয়া হলে এরা দুর্বল ও রোগাক্রান্ত চিংড়ি ধরতে সহজ বিধায় এদের শিকার করে রোগ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পরিশেষে বলতে হয় লাগসই বা টেকসই প্রযুক্তি কোন নতুন প্রযুক্তি নয় বরং আমাদের জানা শোনার মাঝের প্রযুক্তি বা কৌশল যার সুষ্ঠু ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী সুফল দেয় এবং তুলনামূলক কম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বৈদ্যুতিক মটর একটি প্রযুক্তি, এর লাগসই ব্যবহার গৃহে ফ্যান ঘোরানোর কাজে, কৃষিক্ষেত্রে পাম্প চালানোর কাজে, কারখানার লেদমেশিন ঘোরানোর কাজে এবং চিংড়ি চাষে এক্সসেল পাম্প চালানো এবং প্যাডেল হুইল ঘোরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা

মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক
স্বপন চন্দ্র পাল, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের প্রসার যথাসময়ে পর্যাপ্ত চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বাগদা চিংড়ি পোনার প্রধান উৎস প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্রের মোহনা ইত্যাদি। সাম্প্রতিক জরীপ তথ্যানুযায়ী বৎসরে তিনশত কোটি চিংড়ি পোনা প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরিত হয়। উন্নত ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ শুরু হওয়ার ফলে চিংড়ি পোনার চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছেন। চিংড়ি পোনার ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দেয়ার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এ যাবৎ স্বল্প সংখ্যক চিংড়ি হ্যাচারী গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে গলদা চিংড়ি পোনা উৎপাদনক্ষম হ্যাচারীর সংখ্যা মাত্র ৪টি। আরো ৬টি হ্যাচারী নির্মাণাধীন। এছাড়া আরো বেশ কিছু সংখ্যক হ্যাচারী অচিরেই নির্মিত হতে যাচ্ছে। হ্যাচারী হতে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি বাগদা চিংড়ি পোনা উৎপন্ন হয় , যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

হ্যাচারীর স্থান নির্বাচন

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারীভাবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে জরীপ করে বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী নির্মাণের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সম্ভাব্য স্থানের উপযুক্ততা যাচাই পূর্বক কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হতে টেকনাফ সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত মোট ১৯৮টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী নির্মাণের উপযোগী স্থান চিহ্নিত করেছে। খুলনা অঞ্চলেও বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনের উপযোগী স্থান নিবাচনের কাজ পক্রিয়াধীন রয়েছে। বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী পরিচালনার জন্য সমুদ্রের পানির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলীর মাত্রা ও পরিসর নিম্নরূপ ঃ

পানির লবনাক্ততা	*২৮-৩২ পিপিটি*
দ্রবীভূত অক্সিজেন	*৫ মিগ্রাম/লিটার*
তাপমাত্রা	*২৮-৩১ সেঃ*
পি এইচ	*৭.৫-৮.৫*
নাইট্রেট-নাইট্রোজেন	*০.০২ মিগ্রাম/লিটার*
আন্আয়োনাইজড অ্যামোনিয়া	*০.১ মিগ্রাম /লিটার*
বি ও ডি	*১.০ মিগ্রাম /লিটার*
হাইড্রোজেন সালফাইড	*০.১ মিগ্রাম/ লিটার*
ভারী ধাতু	*০.০১ নিযুতাংশ*
পানির ঘোলাত্ব	*৫০.০ এফ, টি, ইউ*

হ্যাচারীর স্থান নির্বাচনের সময় নিম্ন বর্ণিত বিষয় গুলো যথাযথ ভাবে বিবেচনা করতে হবে ঃ

'মা' চিংড়ির উৎস ঃ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত 'মা' বাগদা চিংড়ি যাতে স্বল্প সময়ে চিংড়ি হ্যাচারীতে পরিবহণ করা যায় এবং হ্যাচারীতে উৎপাদন মৌসুমে পর্যাপ্ত 'মা' চিংড়ির প্রাপ্যতা চিশ্চিত থাকা আবশ্যক।

লোনা পানি ঃ সাধারণত ঃ ৩০-৩২ পিপিটি লবণাক্তার স্বচ্ছ সমুদ্রের পানি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারীর জন্য আবশ্যক। তাই উক্ত গুনাগুণ সম্পন্ন পানি যাতে সহজে পাম্প করে আনা যায় এরূপ স্থানে হ্যাচারী হওয়া আবশ্যক।

মিঠা পানি ঃ ভূগর্ভস্থ পানিই সাধারণতঃ হ্যাচারীতে মিঠা পানির উৎস। লৌহ দ্রবণমুক্ত ও নিউট্রাল পিএইচ মান সম্পন্ন পানি স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প দ্বারা সহজেই উত্তোলন করা যায় এরূপ স্থানে হ্যাচারী স্থাপন করতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ হ্যাচারীতে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন - এয়ার ব্লোয়ার পাম্প, রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি চালানোর জন্য অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

যাতায়াত ঃ হ্যাচারীর মাল-পত্র, যন্ত্রপাতি, 'মা' চিংড়ি, পোনা ইত্যাদি পরিবহনের জন্য যথাযথ যাতায়াত ব্যবস্া থাকা আবশ্যক।

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারীর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতি

একটি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ অবকাঠামোগত সুবিধাদি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি একান্ত প্রয়োজন। হ্যাচারীতে লার্ভা, পোষ্টলার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক, এ্যাল্‌জি অথবা উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন, আর্টেমিয়া, স্পনিং এবং ব্রুডষ্টক ট্যাংক থাকা আবশ্যক। এছাড়া এয়ার ব্লোয়ার, পানির পাম্প সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি অবশ্যই হ্যাচারীতে সংকুলান করতে হবে।

লার্ভা ও পোষ্ট লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক ঃ সাধারণতঃ ১ থেকে ২০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক হ্যাচারীতে ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক ২.৫-৫.০ টন এবং পোষ্টলার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক ৬-১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া উত্তম। উভয় ক্ষেত্রেই গভীরতা ১ মিটার হওয়া প্রয়োজন। একটি ২.৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে ১,৫০,০০০-৩,০০,০০০টি নপ্লিয়াস প্রতিপালন করা যায়, যাহা সাধারণতঃ ১টি 'মা' চিংড়ি একবারে প্রসব করে।

কংক্রীট সিমেন্ট অথবা ফেরোসিমেন্ট দ্বারা ট্যাংক তৈরী করা যায় (চিত্র)। বৃত্তাকার, আয়তাকার অথবা বর্গাকৃতি ঢালু তলদেশ বিশিষ্ট ট্যাংক নির্মাণ করা যায়। ট্যাংকের দুই সারির মাঝে কমপক্ষে ২ মিটার ফাঁকা রাখা আবশ্যক যাতে অন্যান্য কাজ-কর্মের সুবিধা হয়। সম্পূর্ণ হ্যাচারীর ফ্লোর সমান করে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে দেয়া আবশ্যক।

এ্যালজি অথবা উদ্ভিদ প্লাংকটন এবং আর্টিমিয়া ট্যাংক ঃ সাধারণতঃ এই ট্যাংক ক্ষুদ্রাকৃতি অনধিক ১ টন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ০.৫ মিটার গভীরতার ফাইবারগ্লাস দ্বারা তৈরী করা যায়।

এয়ার সাপ্লাই সিষ্টেম ঃ এরেশন/বায়বীয়করণ হ্যাচারীতে অত্যাবশ্যকীয়। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক এয়ার ব্লোয়ার দ্বারা বায়বীয়করণ সম্পন্ন করা হয়। ক্ষুদ্র ব্যাসের বিভিসি পাইপ দ্বারা প্রতিটি ট্যাংকে এয়ার ব্লোয়ার সংযোগ দেয়া হয়। পিভিসি পাইপের মুখে সরু প্লাষ্টিক পাইপ ও এয়ার ষ্টোনের সাহায্যে ট্যাংকের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। অবিরাম এরেশনের জন্য হ্যাচারীতে একটি জেনারেটর রাখা আবশ্যক। বৈদ্যুতিক গোলযোগের সময় জেনারেটর ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে।

লোনা পানি সরবরাহ পদ্ধতি ঃ হ্যাচারী পরিচালনার জন্য ২৮-৩২ পিপিটি লবণাক্ততা পর্যন্ত লোনা পানি সরবরাহ প্রয়োজন। সমুদ্র হতে সরাসরি পাম্পের সাহায্যে অথবা ভূগর্ভস্থ পাম্পের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা যায়।

ফিল্ট্রেশন ঃ সরবরাহকৃত লোনাপানি, বালি ও নুড়িপাথরের পরিশ্রাবকের মাধ্যমে ঘোলাত্বমুক্ত করে নিতে হয়। এছাড়া পানিতে অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের ডিম অথবা বাচ্চা পানি পরিশ্রাবনের মাধ্যমে দূরীভূত করা যায়।

পানি মজুদ ও সঞ্চালন ব্যবস্থা ঃ প্রত্যেক হ্যাচারীতে পানি মজুদের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পানি মজুদ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা সাধারণতঃ হ্যাচারীতে দৈনিক ব্যবহৃত পানির পরিমাণের ৩০-৫০% হওয়া উচিৎ। মজুদ ট্যাংক একটু উঁচুতে তৈরী করা প্রয়োজন যাতে সহজেই চিংড়ি পোনা প্রতিপালন ট্যাংকে সরবরাহ করা যায়। মজুদ ট্যাংক হতে পিভিসি পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন ট্যাংকে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হ্যাচারীর যন্ত্রপাতিঃ

* বিকার বা প্লাষ্টিকের ২০০ মিঃ লিটার হতে ১ লিটার ক্যাপাসিটি দাগ কাটা পাত্র।
* থার্মোমিটার-পানির তাপমাত্রা পরিমানের জন্য।
* হেমসাইটোমিটার প্লাংকটন ও এ্যালজি কোষ গণনার জন্য।
* রিফ্রেক্টোমিটার-পানির লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য।
* মাইক্রোসকোপ-বিভিন্ন লার্ভা ষ্টেজ পর্যবেক্ষণ ও ট্যাংকের পানিতে খাদ্য পর্যবেক্ষনের জন্য।
* রিফ্রিজারেটর-লার্ভা ও পোষ্টলার্ভার খাদ্য সংরক্ষণের জন্য।
* হার্ভেষ্টিং বক্স-চিংড়ি পোনা আহরণের জন্য।
* স্কুপনেট-পোনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পোনা আহরণের জন্য।

লার্ভা ষ্টেজ সমূহ

হ্যাচারী কর্মীদের বিভিন্ন লার্ভার পর্যায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ডিম ছাড়ার ১২-১৫ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। নবজাত বাচ্চা বা নপ্লিয়াস কিছুই খায় না। এরা শরীরে জমানো কুসুমের উপর বেঁচে থাকে। প্রটোজুইয়া ষ্টেজে খাওয়া শুরু হয়। এই অবস্থায় সাধারণতঃ এ্যালজি বা উদ্ভিদ প্লাংকটন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে মাইসিস ষ্টেজে এ্যালজি ছাড়াও আর্টেমিয়া বা প্রাণী প্লাংকটন খাদ্য হিসাবে দেয়া হয়। মাইসিস এর পরবর্তী অবস্থা পোষ্টলার্ভা। পোষ্টলার্ভা দেখতে সম্পূর্ণ একটি চিংড়ির সদৃশ্য।

লার্ভা প্রতিপালন

চিংড়ি পোনা উৎপাদনের সফলতা লার্ভা প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল।

স্পনিং এবং হ্যাচিং ঃ ডিম ছাড়ার উপযুক্ত 'মা' চিংড়ি এরেশনযুক্ত পরিস্রাবিত পরিস্কার সমুদ্রের পানিতে (২৮-৩২) পিপিটি লবণাক্ততা এবং ২৮-৩০ সেঃ তাপমাত্রায় ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে বাগদা চিংড়ি ডিম পাড়ে। একটি চিংড়ি ডিম ছাড়তে ২-৭ মিনিট সময় নেয়।

সম্পূর্ণ স্পনিং এ একটি চক্ষুদন্ড উৎপাটিত 'মা' বাগদা চিংড়ি ১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ ডিম দেয় এবং সমুদ্র হতে আহরিত একটি 'মা' বাগদা চিংড়ি ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ডিম দেয়। ১২-১৫ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে নপ্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়।

নপ্লিয়াস অবস্থায় লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। সাধারণতঃ লিটার প্রতি ৫০-১০০টি নপ্লিয়াস প্রতিপালন ট্যাংকে মজুদ করা যায়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ হ্যাচারীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য এবং খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে হ্যাচারী অপারেটরের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এ্যালজি/উদ্ভিদ প্লাংকটন চাষ ঃ লার্ভা ট্যাংকে খাদ্য প্রয়োগ শুরু করার ২/৩ দিন পূর্বে এ্যালজি/উদ্ভিদ প্লাংকটন চাষ শুরু করতে হয় এবং সম্পূর্ণ লার্ভা প্রতিপালন কালব্যাপী ইহা চালু রাখতে হয়।

লার্ভার অন্যান্য খাদ্য ঃ মুরগীর ডিম উত্তম রূপে সিদ্ধ করে উহার কুসুম ৪০-১০০ মাইক্রন ফাঁসযুক্ত নেটে ছেকে লার্ভা ট্যাংকে প্রয়োগ করা যায়। একটি ডিমের কুসুম ১০ টন ক্যাপাসিটির একটি লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে একবার প্রয়োগ যথেষ্ট।

আর্টেমিয়া ঃ আর্টেমিয়া চিংড়ি লার্ভার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপযোগী খাবার। বর্তমানে উন্নতমানের আর্টেমিয়া বিদেশ হতে আমদানী করে আমাদের চিংড়ি হ্যাচারী সমুহে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিস্কার সমুদ্রের পানিতে অবিরাম এরেশনের মাধ্যমে ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে আর্টেমিয়ার ডিম ফুটে নপ্লিয়াস বের হয়। ১ গ্রাম আর্টেমিয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ ডিম থাকে। ১ লিটার সমুদ্রের পানিতে ৫ গ্রাম আর্টেমিয়া ফুটানো যায়।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ নপ্লিয়াস ষ্টেজের শেষের দিকে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে এ্যালজি/উদ্ভিদ প্লাংকটন খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ২,৫০০-১০,০০০ কোষ/মিঃ লিটার হিসাবে ট্যাংকে প্রয়োগ করা যায়। প্রটোজুইয়া -১ হতে মাইসিস্-৩ ষ্টেজ পর্যন্ত ডিমের কুসুম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মাইসিস্ -২ হতে পোষ্টলার্ভা ষ্টেজের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত আর্টেমিয়া ২-৫ টি/মিঃ লিটার খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা যায়।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের পানি দৈনিক ৩০% পরিবর্তন করা আবশ্যক। প্রত্যহ সকাল বেলা এরেশন বন্ধ করে অব্যবহৃত খাদ্য কণা, লার্ভার খোলস ইত্যাদি মাইক্রনের সাহায্যে ট্যাংক হতে পরিস্কার করে ফেলতে হবে। তাহলে পানির গুণাগুণ ভালো থাকবে।

পোষ্ট লার্ভা প্রতিপালন ঃ পোষ্ট লার্ভা প্রতিপালন হ্যাচারীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পোষ্ট লার্ভা -৩ হতে পোষ্টলার্ভা -৫ ষ্টেজে পোষ্টলার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। ৩০০০-৫০০০ পোষ্টলার্ভা/টন হিসেবে মজুদ করা যায়। বাঁশের ফালি/নাইলন নেট ইত্যাদি পোষ্টলার্ভার আশ্রয় হিসাবে ট্যাংকে রাখা যায়।

খাদ্য ঃ পোষ্টলার্ভা-৫ পর্যন্ত উদ্ভিদ প্লাংকটন এবং আর্টেমিয়া নপ্লি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পোষ্টলার্ভা-৬ হতে ক্রমান্বয়ে শামুকের মাংস, এসিটিস অথবা ছোট মাছ ছোট ছোট করে কেটে খাদ্য হিসেবে দিনে ২-৩ বার ট্যাংকে প্রয়োগ করতে হয়।

পোষ্টলার্ভা আহরণ ঃ পোষ্টলার্ভা বিক্রিযোগ্য হলে শ্রীমযুক্ত হোস পাইপের সাহায্যে ট্যাংকের অংশ পানি কমিয়ে নিতে হবে। অতঃপর পোনা হোসপাইপ ও আহরণ বাক্সের সাহায্যে ট্যাংকের পানি বের করে সকল পোনা ক্রমান্বয়ে আহরণ করা যায়।

প্যাকিং ও পরিবহণ ঃ

হ্যাচারী হতে চিংড়ি খামারে পরিবহনের জন্য পোনা সুষ্টভাবে প্যাকিং করা আবশ্যক। প্রতি প্যাকেটে কি পরিমাণ পোনা প্যাকিং করতে হবে তা পোনার সাইজ ও বয়স এর উপর নির্ভর করে। তাছাড়া পরিবহনের সময় এবং দূরত্বের উপরও নির্ভর করে। সাধারণতঃ ৫০ ৯০ সেঃমিঃ পলিথিন ব্যাগে ২০০০টি (পোষ্টলার্ভা -২০ থেকে ২৫) পোনা পরিবহন করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাগে ৪ লিটার পানি ব্যবহার করতে হবে। অক্সিজেন দেয়ার পর ব্যাগের মুখ রাবার ব্যান্ড দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। পোনা ভর্তি পলিথিন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন রাখার জন্য এটা ষ্টাইরোফোম বাক্সে পরিবহন করতে হয়। পরিবহন সময় যদি ৬ ঘন্টার বেশী হয় তাহলে সামান্য পরিমান বরফ ছোট পলিব্যাগে মুড়ে তাপমাত্রা কম রাখার জন্য ষ্টাইরোফেম বাক্সে রেখে দিতে হবে। পরিবহন দূরত্ব ১২ ঘন্টার অধিক হলে ব্যাগের পানি পরিবর্তন ও পূনঃ অক্সিজেন ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

বিভিন্ন আকারের হ্যাচারীর শ্রেণীবিন্যাস ঃ

আইটেম	ক্ষুদ্র	মাঝারী	বড়
১। মালিকানা এবং হ্যাচারী পরিচালনার ধরণ উৎপাদিত পোনা নিজ	পারিবারিক জনবল দ্বারা হ্যাচারী পরিচালনা। উৎপাদিত পোনা সমিতির খামারে ব্যবহারের জন্য।	ছোট কোন সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা। প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত সদস্যদের খামারের জন্য ব্যবহৃত হয়।	বড় বেসরকারী উদ্যোক্তা অথবা জাতীয় পোনা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য ব্যবহৃ হয়।
২। আয়ন	সাধারণতঃ ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী	২০০০-৫০০০ বর্গ মিটার।	৫০০০ বঃমিঃ-১ হেক্টর।
৩। উৎপাদনের পরিমাণ	১০-৫০ লক্ষ/বৎসর।	১০০-২০০ লক্ষ/বৎসর।	বাৎসরিক উৎপাদন ২০০ লক্ষের অধিক।
৪। কর্মরত জনবল	১-হ্যাচারী টেকনিশিয়ান ২-কর্মী।	৩-হ্যাচারী টেকনিশিয়ান ৩/৪ কর্মী।	৩/৬-হ্যাচারী টেকনিশিয়ান ৬/১০ কর্মী।
৫। ট্যাংকের মোট ধারণ ক্ষমতা	২০-১০০ টন।	১০০-১০০০ টন	১০০০ টনের অধিক।

(রফারেন্স ঃ নাকা ট্রেনিং ম্যানুয়াল-১)

উপসংহার ঃ

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন ও চিংড়ি পোনা উৎপাদন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বর্তমানে দেশে হ্যাচারী পরিচালনায় দক্ষ জনশক্তির বেশ অভাব রয়েছে। তবে চালু হ্যাচারী সমূহে উৎপাদনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। সরকার চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অর্থায়নকারী সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ এই সেক্টরে এগিয়ে আসলে চিংড়ি চাষ শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব।

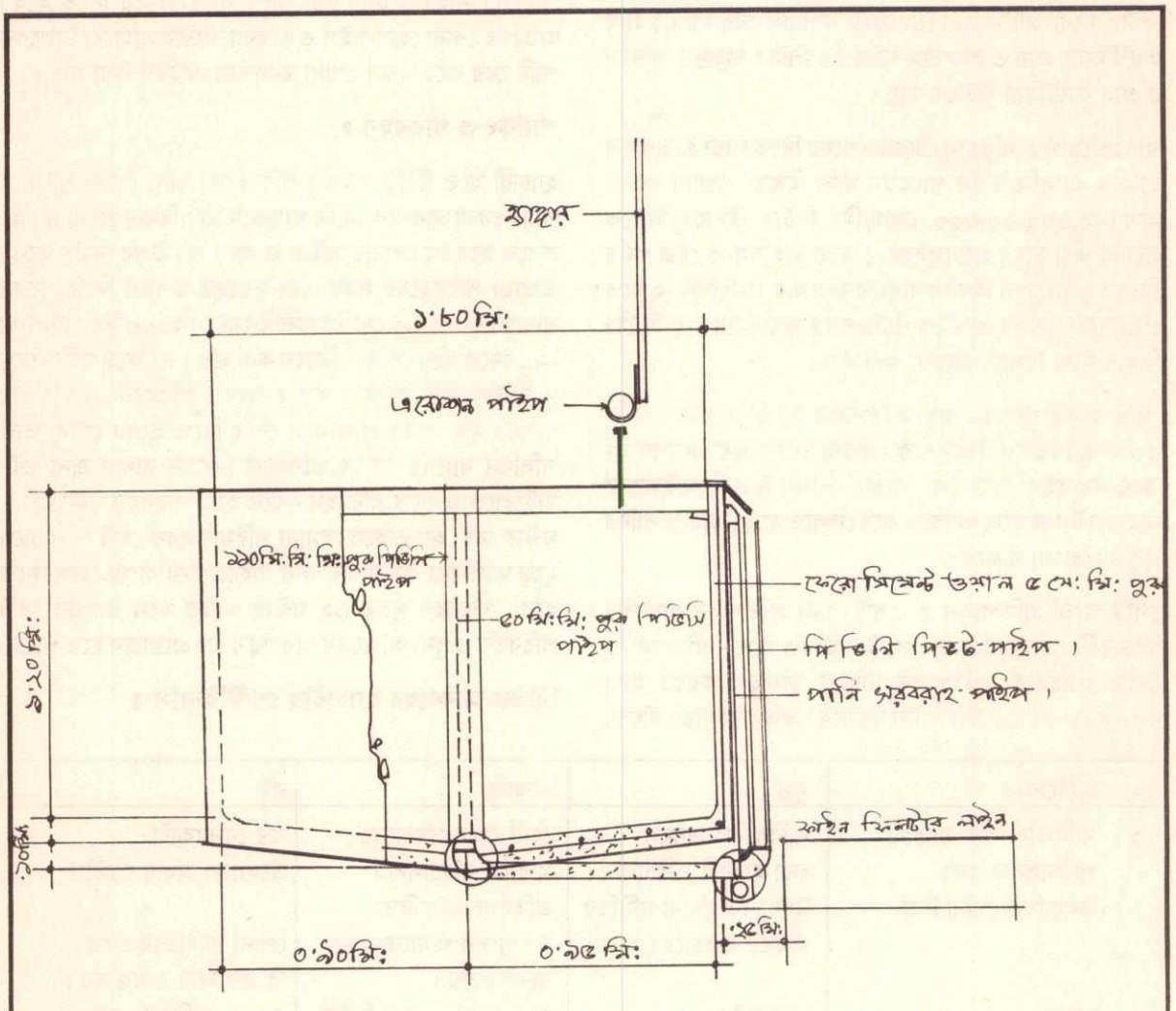

চিত্র ঃ ২.৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের ক্রস সেকশন।

চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনায় রোগবালাই প্রতিকার ও প্রতিরোধ

হাবিবুর রহমান খন্দকার
উপ প্রকল্প পরিচালক

চিংড়ি শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে চিংড়ি শিল্পে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। চিংড়ি রোগ এ সমস্ত সমস্যার মাঝে একটি প্রধান চিহ্নিত সমস্যা। চিংড়ি চাষের ধরনের উপর চিংড়ি রোগ অনেকটা নির্ভরশীল। দেখা যায় যে, চাষের নিবিড়তার সাথে সাথে চিংড়ি রোগের ঝুঁকিও বহুলাংশে বেড়ে যায়। পরিবেশের কারণে চিংড়ির রোগের বিষয়টি বর্তমানে সকলের ধারণায় থাকলেও পরিবেশ উনয়ন বা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য চিংড়ি চাষী এবং উদ্যোক্তাগণ সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখেন না। চিংড়ি চাষের নিবিড়তার সাথে সাথে চিংড়ি হ্যাচারীও প্রসার হচ্ছে। হ্যাচারীতে অতিঘনত্বে চিংড়ি পোনা ঔষধ এবং তাপমাত্রা প্রয়োগে উৎপন্ন করা হয়ে থাকে এবং হ্যাচারীতে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবানুর সৃষ্টি হয় যা ক্রমান্বয়ে চাষ ক্ষেত্রে সংক্রামিত রোগের সৃষ্টি করছে এবং পরিবেশ দূষনের কারণ হচ্ছে।

চিংড়ি চাষে প্রাকৃতিক পরিবেশ

বিশ্বব্যাপী চিংড়ি খাদ্য হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভের সাথে সাথে এর দাম যেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এর উৎপাদনের নিবিড়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাষ ক্ষেত্র থেকে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যে কৃষিজ ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সনে চাষ ক্ষেত্রের পরিমান ছিলো প্রায় ৫০,০০০ হেক্টর। ১৯৯৪ সনে এই চাষ ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪০,০০০ হেক্টর হয়েছে। গলদা চিংড়ি পূর্বে কেবলমাত্র প্রকৃতি থেকে সিংহভাগ আহরিত হত কিন্তু অধুনা গলদা একক চাষ পদ্ধতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমি গলদা চিংড়ি চাষের আওতায় চলে এসেছে।

চিংড়ি চাষ প্রসারের ফলে ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। চিংড়ি যে পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যস্থ সে পরিবেশ চাষক্ষেত্রে সৃষ্টিকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্ধিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, যে কোন চাষ প্রক্রিয়া পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এক সময় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে লবণ ও ধান জমিতে রূপান্তরীত করা হয়।

প্রকৃতির সাথে চিংড়ি চাষের সম্পর্ক

সাধারণভাবে চিংড়ি চাষ এবং এর পরিবেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ- যেমন চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং চাষ ক্ষেত্রের বাহিরের পরিবেশ। এই উভয় পরিবেশকে চিংড়ি চাষ প্রভাবিত করে থাকে।

চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ পরিবেশের যে সমস্ত গুনাবলী চাষক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে তা অর্ন্তভূক্ত যেমন চাষ ক্ষেত্র বা পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুন। চাষ ক্ষেত্রে অনুন্নত চাষ পদ্ধতির কারণে চাষক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিবেশ যেমন- চাষ পদ্ধতির কারণে পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনসহ অন্যান্য গুনাগুণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যা সহজেই চাষ ক্ষেত্রের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

চাষ ক্ষেত্রের বাহিরের পরিবেশ সরবরাহকৃত পানির গুণাবলী, পরিবেশের তাপমাত্রা, আলো, পানিদূষন ইত্যাদি অতি সহজেই চিংড়ি চাষক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে থাকে। চিংড়ি চাষের ফলে চাষক্ষেত্রের বহ্য, পানি প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেয়া এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও কৃষি জমিকে চিংড়ি চাষক্ষেত্রে পরিণত করায় চিংড়ি চাষ সরাসরি চাষ ক্ষেত্রের বাহিরের পরিবেশকেও প্রভাবিত করে থাকে। কারণ বাহিরের পরিবর্তিত পরিবেশ চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে থাকে এবং পূনঃ পূনঃ এই পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিবেশের অনেক গুনাগুণই চিংড়ি চাষকে প্রভাবিত করে থাকে এর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ন কতিপয় গুনাগুণের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

চাষ ক্ষেত্রে অনুন্নত চাষ পদ্ধতি বিশেষ করে খাদ্য, সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি ব্যবহারের উপর চাষক্ষেত্রের যে সমস্ত প্রধান প্রধান (নির্ভরশীল) গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে থাকে তা হলো দ্রবীভূত অক্সিজেন, এমোনিয়া, নাইট্রাইট, মাছের পুষ্টির সার (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস), পানি ও মাটির জৈব পদার্থ, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, ভাসমান ঘনবস্তু, আলগাল ব্লুস ইত্যাদি।

চাষ ক্ষেত্রের যে সমস্ত প্রধান প্রধান (স্বনির্ভরশীল) গুনাগুণ যা স্থান নির্বাচনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং চাষ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে তা হলো - মাটি, পানির পি এইচ, মাটির গঠন, তাপমাত্রা, এ্যালকালিনিটি, হার্ডনেস, লবণাক্ততা, কীটনাশক পদার্থ, ভারী ধাতু ইত্যাদি। চাষ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল এবং অনির্ভরশীল গুনাগুন সমুহ চিংড়ি চাষের নিবিড়তা এবং চাষ পদ্ধতির সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং একটি গুণের পরিবর্তন অন্য গুনাগুণের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে থাকে যা ক্রমান্বয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে এবং এই গুনাগুণের সমতা অথবা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে পরে, এর মাঝে পানি ও মাটির

কতিপয় গুনাগুণ চিংড়ি দেহে সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং কতিপয় গুনাগুণ চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করে থাকে। সর্বোপরি এই পরিবর্তিত অবস্থা চাষ ক্ষেত্রের বাহিরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

চিংড়ি রোগের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক

প্রকৃতিতে চিংড়ি, চিংড়ির রোগ এবং চিংড়ির পরিবেশ একটি সমতায় অবস্থান করে থাকে। পরিবেশের যে কোন পরিবর্তন সহজেই এই সমতাকে নষ্ট করে দেয় ফলে চিংড়ির দেশের উপর চাপ পরে এবং রোগ জীবানু অতি সহজে চিংড়িকে সংক্রমিত করে থাকে। যে সমস্ত কারণে খামারে চিংড়ির দেহে চাপ পড়ে তা হল খারাপ পানি, অতিরিক্ত মজুদ, ঘনত্ব, দূর্বল ব্যবস্থাপনা, অসুস্থ চিংড়ির চিকিৎসা না করা ইত্যাদি। পরিবেশের যে সমস্ত গুনাগুণ চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজন সে সম্পর্কে চিংড়ি চাষ শুরুর পূর্বেই ধারণা নিতে হবে।

চাষ ক্ষেত্রে চিংড়ি রোগ

১৯৯৪ইং সনে বাংলাদেশে চিংড়ির ব্যাপক রোগ আধা-নিবিড় খামারসমুহে দেখা যায় এবং ১৯৯৫ সনেও অনেক খামার চিংড়ি রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চিংড়ি চাষে রোগের কারণে আর্থিক ক্ষতি রোধের জন্য অবশ্যই চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করতে হবে। রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য চিংড়ির রোগের বিষয়ে চাষীর ধারণা থাকা আবশ্যক। পরিবেশের উপর রোগের প্রাদুর্ভাব ও আক্রান্ত নির্ভরশীল। এ জন্য চিংড়ি রোগের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিংড়ি চাষীর চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ধারণা থাকতে হবে।

রোগ সনাক্তকরণ

চাষ এলাকায় চিংড়ির মড়ক শুরু হবার পর রোগ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই নেওয়া যায় না। একটি খামারের প্রতি পুকুরের পানির গুনাগুণ, চিংড়ির আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করা হলে, পানি বা চিংড়ির অস্বাভাবিক গুনাগুণ বা আচরণ দেখা গেলেই চিংড়ি চাষী সতর্ক হতে পারেন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন। চিংড়ির রং, অংগ প্রত্যংগ ও দেহবায়ন ইত্যাদি দেখে আক্রান্তকারী জীবানুর উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা গেলেও নির্দ্দিষ্ট জীবানু সনাক্ত করা যায় না। বিভিন্ন জীবানুর আক্রমনে চিংড়ি দেহে প্রতিফলিত লক্ষনাদি প্রায়ই অভিন্ন। চিংড়ির রং সনাক্ত করা গেলেও চিংড়ির রোগ সহজে ভালো করা যায় না এবং চিংড়ি রোগ সনাক্ত চাষীর কোন লাভ হয়না। এ জন্য চাষীকে রোগ না চিনিয়ে কিভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায় এবং খামারের চাষের পরিবেশ কিভাবে সঠিক রাখা-যায় তা সেখানো উচিৎ। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে চিংড়ির দেহে বা মাংসে রোগ জীবানুর সংক্রমন থাকলেই কেবল রোগের সৃষ্টি হয় না বরং তার পরিবেশ যদি অস্বাস্থ্যকর থাকে তবেই কেবল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু পরিবেশ অসুস্থ্য হলেই রোগ জীবানুর সংক্রামন ঘটে তাই রোগ জীবানুর ধ্বংসের পূর্বেই চাষ ক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হয়।

চিংড়ি রোগের ধরণ

* চিংড়ি রোগকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়,
* অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সৃষ্টি রোগ যেমন-পরিবেশে কম দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং অতিরিক্ত এ্যামোনিয়ার উপস্থিতি।
* অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে চিংড়ির দেহে জীড়ন/ চাষের প্রভাবে চিংড়ি দুর্বল হলে রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগের সৃষ্টি।
* চিংড়ির দেহের কোষকলায় অবস্থিত রোগ জীবানু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে পরিশ্রান্ত চিংড়িকে অতি সহজে আক্রান্ত করে থাকে।
* অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছাড়াও কতিপয় ভাইরাস চিংড়ির দেহে রোগের সৃষ্টি করে থাকে যেমন -ভাইরাসজনিত রোগ।

রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ

চিংড়ি খামারে রোগের প্রাদূর্ভাব বাংলাদেশের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। ১৯৯৪ সনে ভাইরাস জনিত রোগ এবং Vibriosis রোগের কারণে আধা-নিবিড় খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রচলিত চাষ (Extensive) খামারে রোগের তেমন সমস্যা দেখা না গেলেও পরিবেশগত হঠাৎ পরিবর্তন তথা খামারের বাহিরের পানির প্রভাবে হঠাৎ পি, এইচ, লবনাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন অথবা বিষাক্ত পদার্থের কারণে মাঝে মাঝে চিংড়ি মড়কের খবর এলাকাভিত্তিক পাওয়া যায়। পরজীবি সংক্রমনে চিংড়ির ব্যাপক মড়কের খবর পাওয়া না গেলেও উন্নত প্রচলিত (Improve Extensive) খামার সমূহে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কখনো কখনো দেখা যায়। যেহেতু পরিবেশের কারণেই চিংড়ির রোগ বালাই দেখা যায় তাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে রক্ষা করা গেলে এ সম্পদকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়। পাশাপাশি প্রয়োজনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারে পরিবেশের উন্নয়ন এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনে এন্টিবাইওটিক ব্যবহার করে চিংড়ি রোগের কবল থেকে চিংড়ি খামারকে রক্ষা করা য়ায়।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

চিংড়ি চাষের জন্য যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন কেবল

সেরূপ স্থানে চিংড়ি খামার স্থাপন করতে হবে। উপযুক্ত স্থানে খামার স্থাপন করা না হলে চিংড়ি রোগের ফলে ফসলহানীর সম্ভাবনা বেশী থাকে। যে সমস্ত এলাকায় পানির গুনাগুণ খুব দ্রুত উঠানামা করে সে সমস্ত স্থানে চিংড়ির রোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

চাষক্ষেত্রের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় খামার ব্যবস্থাপনা যথাযথ হতে হবে। পানির গুনাগুনসমূহ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন, ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা থাকলে চিংড়িকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। বেশী ঘনত্বে চিংড়ি মজুদ করলে পানিতে খাদ্য সার ইত্যাদিও বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। এতে পানির গুনাগুন চাহিদানুযায়ী সংরক্ষণ করা যায়না এবং ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে থাকে তাই চিংড়ি মজুদ ঘনত্ব কম রাখা বাঞ্চনীয়।

প্রতি চাষের পর পুকুরের তলদেশের বহ্য অপসারণ করতে হবে। প্রচলিত বা উন্নত প্রচলিত চাষ পুকুরে সূর্য্যালোকে তলদেশ ভালভাবে শুকিয়ে তলদেশের জৈব পদার্থকে খানিজায়নের মাধ্যমে ক্ষতিকর রোগ জীবানু ধ্বংস করা যায়।

ভাইরাস রোগসহ অনেক রোগ বাহর থেকে অন্য প্রাণী বা পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে পুকুরে প্রবেশ করে থাকে তাই পুকুরে পানি নেবার পূর্বে তা থিতিয়ে শোধন করে নিতে পারলে রোগের সম্ভাবনা এড়ানো যায়। পুকুরে অন্য জলজপ্রাণী যেন প্রবেশ করতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে। রোগগ্রস্থ পুকুর বা খামার থেকে অন্য পুকুর বা খামারে যেন রোগ না ছড়ায় সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। নিবির ও আধা-নিবিড় পানি সরাসরি খালে বা নদীতে শোধন ছাড়া নির্গমন করানো উচিত নয়।

সুস্থ্য সবল চিংড়ি পোনা জানাশোনা হ্যাচারী বা নার্সারী থেকে সংগ্রহ করে মজুদ করতে হবে। নার্সারী বা হ্যাচারীতে পোনা সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। খামারে তাজা ভালো খাদ্য পরিমিত পরিমানে ব্যবহার করতে হবে।

খামারের পানির গুনাগুণ ও চিংড়ির আচরন সমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষন পূর্বক সংরক্ষন করতে হবে। যে কোন অস্বাভাবিকতায় বা আচরনে দক্ষ বিশেষজ্ঞ বা চাষীর সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার

চিংড়ি মানুষের খাদ্য তাই খাদ্য দ্রব্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার পরিহার বাঞ্চনীয়। চিংড়ি চাষের পরিবেশ উন্নয়ন এবং রোগ প্রতিরোধে কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়। তবে সব সময় চেষ্টা করতে হবে যেন চাষক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন না হয়। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ খামারে ব্যবহৃত হবে তা অবশ্যই বৈধ এবং খামারের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অক্ষতিকর হতে হবে।

চিংড়ি দেহের উপরিস্থিত পরজীবি নিবারণ

এ ক্ষেত্রে ফরমালিন (৩৭% থেকে ৪০% ফরমাল ডি হাউড) ব্যবহার বৈধ। ২৫ থেকে ৩০ পিপিএম ফরমালিন চাষ ক্ষেত্রে চিংড়িকে পরজীবির আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য ব্যবহার করা যায়। ফরমালিন পরজীবিকে ধ্বংস করণ ছাড়াও পকরে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায় এবং চিংড়িকে খোলসা বদলে প্রভাবিত করে।

পুকুর শোধন ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ

পুকুর তলদেশ শোধন তথা তলদেশের ব্যকটেরিয়ার বোঝা লাঘবের জন্য নিম্নের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায় যেমন ঃ- Quaternary amonium componnats eg benzal konium chloride, Buffered iodophones and, Calcium hypochloride. এ সমস্ত দ্রব্যাদি চাষকালীন সময় ব্যবহার করলে প্লাংকটনের মৃত্যু ঘটে, তাই অতি সাবধানে এর ব্যবহার করতে হবে। চুনও পুকুর শোধনে বহুল ব্যবহৃত একটি খনিজ উপাদান।

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এন্টিব্যাকটেরীয়াল ব্যবহার

চিংড়ি রোগ প্রতিকার অথবা প্রতিরোধে এন্টিবাইওটিকস চিংড়ি হ্যাচারী ও চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাকটেরীয়ার সংক্রামন পতিকারে বিভিন্ন জাতীয় এন্টিবাইওটিকস ব্যবহৃত হয়। এন্টিবাইওটিকস ব্যবহারের ফলে চিংড়ির বাজারজাত করণে সমস্যার সৃষ্টি ছাড়াও এ জাতীয় ঔষধ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। তাই চিংড়ি খামারে ঔষধ ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ এন্টিবাইওটিকস যত বেশী ব্যবহৃত হবে এর অকার্যকারীতা তত বৃদ্ধি পাবে।

চিংড়ি খামারে ঔষধ ব্যবহার অত্যন্ত জটিল কারণ চিংড়ি অসুস্থ্য হলে খাবার বন্ধ করে দেয় তাই ঔষধ প্রয়োগ করলেও চিংড়ি অনেক ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করে না। এ ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহারের পানি দষন ছাড়া অন্য কোন কাজ হয় না। একই ধরনের এন্টিবাইওটিকস এক এক সময় অকার্যকর হয়ে যায়।

উপসংহার

চিংড়ি চাষের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা গেলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। পরিকল্পিত ভাবে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য এককভাবে একটি খামারের চাষী কোন ব্যবস্া নিতে পারেন না। সম্মিলিতভাবে চাষীদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থাদি নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিধি প্রণয়ন এবং চিংড়ি চাষীদের প্রশিক্ষনের জন্য ব্যাপক কার্যকর ব্যবস্থা করা গেলে এবং রোগের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে চিংড়ি শিল্পকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সহনশীল মাত্রায় আহরণ পরিচালনা

মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক
মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশী জনগণ প্রাণীজ আমিষের জন্য শতকরা আশিভাগ নির্ভর করে মাছের উপর। কিন্তু যে ভাবে মানুষ বেড়ে চলেছে তাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠছেনা। ১৯৭৫-৭৬ সালে সকল উৎস হতে মাছের উৎপাদন ছিল ৬.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৯৩-৯৪ সনে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১০.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টনে। অথচ মাথাপিছু মাছের প্রাপ্তি ৩৩.৪ গ্রাম হতে কমে দাড়িয়েছে ২১ গ্রামে। স্বাদুপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণ সত্ত্বেও পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। দিনে দিনে মানুষ সৃষ্ট কর্মকান্ড ও অন্যান্য সেক্টর বিশেষ করে কৃষি খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে স্বাদু পানির মাছের চারণভূমি, প্রজনন ক্ষেত্র, ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে। সব মিলিয়ে কেবল স্বাদু পানির মাছের দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান এ জাতির চাহিদা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। অপর দিকে দেশের সামুদ্রিক মৎস্য এলাকার আয়তন স্বাদু পানির এলাকার চাইতে অনেক বেশী হওয়া সত্তেও সামুদ্রিক উৎস্য হতে আসছে কেবল ২৮ শতাংশ। স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে শত অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও যে মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আশাব্যাঞ্জক বটে, তবে সে মাত্রায় প্রযুক্তি সামুদ্রিক সেক্টরে কাজে লাগাতে পারলে এ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে অফুরন্ত।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের উন্নয়ন

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ষাটের দশকের পূর্বে সনাতনী পদ্ধতিতে কেবল বীচসীন, বেহুন্দি জাল, ক্ষেপলা জাল, ফাঁদ ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। স্বাধীনতা পূর্বকালে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ কতৃক নাইলন সুতার ব্যবহার সুচিত হলেও পরবর্তীতে নৌকায় ইঞ্জিন সংযোজনের সূচনা হলে সীমিত পর্যায়ে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে যা দ্বারা লউখ্যাজাল, সামুদ্রিক বেহুন্দি ও অগভীর পানিতে ইলিশ জালের সূচনা হয় ও উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। স্বাধীনতা পরবতীকালে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নৌকা নির্মান প্রকল্প কর্তৃক ৪০ ফুট দীর্ঘ ইঞ্জিন চালিত নৌকা নির্মাণ ও ইঞ্জিন সরবরাহের ফলে অপেক্ষাকৃত গভীর সমুদ্রে ইলিশ মাছ আহরণের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে, এতে সামুদ্রিক বেহুন্দি জালেরও প্রসার লাভ করে। সম্প্রতি সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ প্রকল্পের প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে বটম লং লাইনের শুরু হয় এবং একটি ধাপের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনা হয়।

পাক/২২ জরীপের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে ৩,১৯,০০০ মেঃ টন ৫৪,০০০ মেঃ টন তলদেশীয় সাদা মাছ এবং ৯,০০০ মেঃ টন চিংড়ি মজুদের তথ্য প্রকাশিত হলে ট্রলিং শিল্পে বিনিয়োগের উৎসাহ দেখা দেয়। প্রথমে সরকারী খাতে বিএফডিসি কর্তৃক ১৭টি পুরানো ট্রলার দ্বারা রাশিয়ান প্রযুক্তি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭৪ সালে সাদা মাছ আহরণের জন্য একটি ফ্লীট গঠন করা হয়। অতপর ১৯৭৬-৭৭ সালে জাপান-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে মিতা-জাভা জরীপের ফলে পিনাইড চিংড়ির বাণিজ্যিক আহরণ লাভজনক বলে বিবেচিত হওয়ায় চিংড়ি ট্রলিং শিল্পে বিনিয়োগ সূচনা হয়।

বাণিজ্যিক আহরণ (ট্রলার ফ্লীট)

বর্তমানে ৫৩টি ট্রলার (৪১টি চিংড়ি ও ১২টি মৎস্য) ৪০ থেকে ৮০ মিটার গভীর মহীসোপান অঞ্চলে চিংড়ি ও সাদা মাছ আহরণে নিয়োজিত। তাদের আহরণ ক্ষমতা গত দেড় দশকে বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে। গড়ে তাদের ক্ষমতা ছিল ৫০০০ থেকে ৬০০০ ষ্ট্যান্ডার্ড দিবসের মধ্যে (টেবিল-১)। আহরিত চিংড়ির পরিমান ৩,৫০০-৬,০০০ মেট্রিকটনের মধ্যে। বর্তমানে ট্রলার বহরের একটি অংশ, যা '৯১ এর ঘূণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ তা পূনরায় যোগদানের অপেক্ষায় আছে। সাদা মাছের কেবল অবতরনের হিসাব পাওয়া যায়, যা ৮ থেকে ১২ হাজার টনের মধ্যে। সাদা মাছের মোট আহরণের মধ্যে প্রায় ৮০% ট্রাশ ফিশ হিসাবে সাগরে ফেলে দেওয়া হয় যার পরিমান ৩৫ থেকে ৪৫ হাজার মেট্রিক টন। ট্রল জাল যেহেতু ননসিলেকটিভ তাই এ জালে অনেক অপরিপক্ক মাছ ধরা পড়ে, বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি। এ জালের লক্ষ্য বস্তু হচ্ছে বাগদা চিংড়ি এবং সে কারণেই এ প্রজাতি অতি আহরণের শিকার। সাদা চিংড়িও কিছুটা অতি-আহরণ হচ্ছে। তবে হরিনা চিংড়ি ও ছোট চিংড়ি (মিশ্রিত) এর আহরণ হার উর্দ্ধমুখি। বর্তমানে ট্রলার বহরের আহরণ ক্ষমতা সহনশীল মাত্রার চেয়ে সার্বিকভাবে কিছুটা কম বলে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান অবস্থায় ট্রল জালে ধৃত প্রধান প্রজাতি সমূহের হিসাব চিত্র-১ এ দেখা যেতে পারে।

আধা সনাতনী পদ্ধতিতে আহরণ

যে সকল জাল যান্ত্রিক নৌকা সহযোগে আংশিক উন্নয়ন ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে মৎস্য শিকারে রত সে সকল জালের

মধ্যে ছোট ভাসান জাল, বড় ভাসান জাল, সামুদ্রিক বেহুন্দী জাল, বড়শী ছাড়া উল্লেখযোগ্য। টেবিল-২ এবং চিত্র-১ এ সে সকল জালের সংখ্যা, পরিচালন এলাকা / গভীরতা ও প্রধান প্রধান আহরিত প্রজাতির তালিকা দেয়া হল। এদের মধ্যে ছোট ভাসান জালে ইলিশ আহরণ এখনও সীমিত মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এতদবিষয়ে বিষদ গবেষনা পরিচালনা করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক বেহুন্দী জালে স্থান ও গভীরতা পরিবর্তনের মাধ্যমে মোহনা বেহুন্দীর চেয়ে ক্ষতির পরিমান অনেক কম বলে দেখা যায়, যদিও অপরিপক্ক প্রজাতি কিছুটা ধরা পড়ে। বড়শীর ছড়ায় প্রধানত পোয়া মাছ ধরা হয় এবং তাতে অতি আহরণ হয়না বা কিশোর মাছ ধরা পড়ে না বললেই চলে। বড় ভাসান জালে লাউখ্যা ও কোরাল মাছের অতি আহরণ জনিত চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে কিশোর বয়সী নয় বরং প্রজননক্ষম মাছ অতি আহরিত হচ্ছে।

সনাতনী পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ

সনাতনী পদ্ধতির জালের মধে রয়েছে মোহনা বেহুন্দী, বীচ সীন, পোনা জাল, ট্রামেল জাল ইত্যাদী। চিত্র-১ এবং টেবিল-২ এ এদের এলাকা ও সংখ্যা দেখা যেতে পারে। মোহনা বেহুন্দী সারা দেশের মোহনাঞ্চলে পাতা হয় ১০ মিটারের কম গভীরতায়। প্রায় ১৩,০০০ জালের উপর লক্ষাধিক লোকের জীবন ধারণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ জালে কতিপয় মোহনায় বসবাসকারী প্রজাতি যেমন *Acetis indicus, Raconda russeliana, Setipinna taty* ছাড়া অন্য যা ধরা পড়ে তা প্রায় সবই সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির কিশোর অবস্থা এবং সবই অতি আহরণের শিকার। এগুলো বড় হয়ে সমুদ্রে গভীর পানিতে পরিপক্ক অবস্থায় অন্য জালে ধরা পড়লে অনেক অনেক বেশী ফলন যোগাতে পারতো। এ জাল সন্দেহাতীতভাবে ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বীচসীন দ্বারাও কেবল কিশোর মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর হিসাব চিহ্নিত জাল হচ্ছে চিংড়ি পোনা জাল। প্রায় ১,৯০,০০০ জাল সারাদেশে দুই লক্ষাধিক লোক দ্বারা পাতা হচ্ছে। বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা হচ্ছে ২০০ কোটির উর্দ্ধে। অন্যান্য পোনা ধরা হচ্ছে ২০,০০০ কোটি যার সবটুকুরই মৃত্যু ঘটছে তাৎক্ষণিক। মূলতঃ এ সব পোনা ধীরে ধীরে বড় হয়ে সাগরে ফিরে গিয়ে পরিপক্ক অবস্থায় আহরিত হবার কথা এবং প্রজননে অংশ গ্রহণ করে পরবর্তী প্রজন্মের যোগান দেবার কথা। আর তা যদি হয় তাহলে গভীরতর মহীসোপান অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন যে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। টেবিল-২ এ বর্তমান উৎপাদন দেখানো হল।

সনাতনী জালের মধ্যে একমাত্র ক্ষতিহীন জাল হচ্ছে এক দশক আগে সূচিত ট্রামেল জাল। যেহেতু এ জালটি সিলেকটিভ তাই এতে যে প্রজাতি এবং যে আকারে ধরা পড়ে তাতে অতি আহরণের কোন লক্ষন দেখা যায় না। এ জালটি টেকনাফ-কক্সবাজার উপকুলে সীমিত এবং মাত্র ৪০০ জাল পাতা হয়। এ জালটি দেশী (অযান্ত্রি) নৌকা দ্বারা ব্যবহার করা হয় বলে বেশী দূরে পাতা হয় না এবং তাই সনাতনী পর্যায়ে রয়েছে। তবে এ কাজের কলা কৌশল উন্নত, সনাতনী নয়।

আহরণ সংক্রান্ত জটিলতা

আমাদের দেশ গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ হওয়াতে এখানে মৎস্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জটিলতা শীতকালীন দেশের চাইতে অনেক অনেক বেশী। শীতকালীন দেশগুলোই উন্নত বিশ্বে পড়েছে, সেখানে বেশীর ভাগই এক প্রজাতির ফিশারী এবং তা ম্যানেজ করা তুলনামূলক ভাবে অনেক সহজ এবং সে জন্য বহুবছর যাবৎ বৈজ্ঞানিক উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি চালু আছে। কিন্তু সে সকল প্রযুক্তি ও জ্ঞান সরাসরি আমাদের এখানে কাজে লাগানো যায় না। তার কারণ আমাদের মত উস্মমন্ডলীয় দেশে এক জালে যে কোন সময় বহু প্রজাতির ও বহু আকরের মাছ ধরা পড়ে, আবার একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি বিভিন্ন বয়সে / দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন এলাকায় / গভীরতায় বিভিন্ন জালে ধরা পড়ে। তাই শীতকালীন দেশের সিংগেল স্পিসিস - সিংগেল গিয়ার ম্যানেজমেন্ট এ দেশে অচল। এদেশে মালটি স্পিসিস-মালটি গিয়ার ফিশারী ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন, যার জটিলতা অনেক অনেক গুণ বেশী।

এসকল জটিল পরিস্থিতিকে আংশিক স্বচ্ছভাবে দেখতে গেলে অন্ততঃপক্ষে এটুকু দেখা অবশ্যই প্রয়োজন যে, যে কোন একটি প্রজাতি কোন বয়সে/দৈর্ঘ্যে কোন জালে কতটি ধরা পড়ে। যেহেতু ঐ প্রজাতিটি যে কোন বয়সে যে কোন জালেই ধরা হোকনা কেন তা একই ষ্টকের অংশ এবং একটি জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ তাই এ প্রজাতির মাছ/চিংড়িকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা করতে হলে পোনা জাল হতে শুরু করে ট্রলার পর্যন্ত যত প্রকার জালে ধরা পড়ে তার সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ফিশিং ইফোর্ট এবং আহরণের হার উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিত্র-২ তে বাগদা চিংড়ি স্টকের উপর বিভিন্ন জালের আহরণের সংখ্যা এবং আকার দেখানো হল। এর মধ্যে কোনটি কি মাত্রায় ক্ষতিকর তা সহজেই অনুধাবন করা যায় এতে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষতিকারক প্রতিটি জালকেই ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে, যে কোন একটি জাল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেও ব্যবস্থাপনা সফল হবে না।

অপর একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আহরিত মোট ১৩,০০০ মেট্রিকটন পিনাইড চিংড়ির মধ্যে ওজনে মোহনা বেহুন্দী জাল দ্বারা ৫৫.৮৭%, ট্রলার বহর দ্বারা ২৯.৭০%, সামুদ্রিক বেহুন্দী জাল দ্বারা ১৪.৩০%, বীচসীন দ্বারা ০.০৯% এবং পোনা আহরণকারী জাল দ্বারা মাত্র ০.০৪%

আহরিত হচ্ছে। অপর দিকে এই হিসাবকে সংখ্যায় দাঁড় করালে ক্ষতির পরিমান করা সহজ হবে। সংখ্যার হিসাবে এই পরিমান চিংড়ি ট্রলার বহর দ্বারা ১%, মোহনা বেহুন্দী জাল দ্বারা ৩.৪০% এবং কেবলমাত্র পোনা জাল দ্বারা ৯৪.৬% আহরিত হয়। এক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ভাবে পোনা জাল মারাত্মক ক্ষতিকারক, পরবর্তী ক্ষতিকারক মোহনা বেহুন্দী।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

যদিও সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তবে বিভিন্ন প্রকার আহরণ সহনশীল পযায়ে রাখার লক্ষ্যে কতিপয় বিষয় আলাদাভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ট্রল ফিশারীর ব্যবস্থাপনা

ট্রল ফিশারীতে সহনশীল পর্যায়ে আহরণের জন্য ৭,০০০ ষ্ট্যান্ডার্ড দিবস আহরণ শক্তি প্রয়োজন, যা দ্বারা ৫,০০০ ৫০০ মেট্রিকটন চিংড়ি আহরিত হতে পারে। বর্তমানে ট্রলার বহরের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রয়েছে, তবে ১০টি ট্রলার এর কার্য্যক্ষমতা অত্যন্ত কম, গড়ে বৎসরে ৬২ দিনেরও কম (২৫০ দিন ষ্ট্যান্ডার্ড)। ফলে মোট ইফোর্ট ১,০০০ ষ্ট্যন্ডার্ড দিবস কম। এদের পূর্ণক্ষম করা সম্ভব হলে ইফোর্ট দাড়াবে প্রায় ৮,০০০ দিবস। অন্যথায় ১,০০০ দিবসের সমপরিমান ইফোর্ট বাড়াতে হবে। দেখা গেছে চিংড়ি আহরণের হিসাবে একটি চিংড়ি ট্রলার ৩-৩.৫ টি ফিশ ট্রলারের সমান ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই সে ক্ষেত্রে ৪টি চিংড়ি ট্রলারের স্থলে ১২-১৪টি ফিশ ট্রলার যোগ হতে পারে। ১৯৯২ সালে কক্সবাজারে এফএও / বিওবিপি আয়োজিত সেমিনারে মৃত যে কোন চিংড়ি ট্রলারকে সমসাময়িক ক্ষমতা সম্পন্ন ফিশ ট্রলার দিয়ে পূর্ণবাসন করার সুপারিশ করা হয়েছে। হিসাবে দেখা যায় যে, ৭,০০০ ষ্ট্যান্ডার্ড চিংড়ি দিবস ক্ষমতা সম্পন্ন পুরো বহরটি যদি ফিশ ট্রলার দিয়ে পূর্ণবাসন করা যায় তাহলে চিংড়ি ও মাছ উভয়ে সহনশীল মাত্রায় আহরিত হবে। তাতে বাড়তি লাভ যা আসবে তা হল আহরিত সকল সাদা মাছ অবতরণের সুযোগ পাবে, উৎপাদন আরো ৫০,০০০ টন বাড়বে। অন্য কোন পন্থায় ট্রাস ফিশের সদব্যবহার করা বাস্তবিকভাবে সম্ভব নয়।

ট্রলার বহর দ্বারা বাগদা চিংড়ির উপর অতি আহরণ জনিত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। ফলে বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে ট্রলার বহর চিংড়ির অভাবে ঘাটে বাসা ছিল। তাই ভরা প্রজনন মৌসুমে একমাস কাল (মধ্য জানুয়ারী - মধ্য ফেব্রুয়ারী) কার্য্যকর ভাবে বন্ধ রাখা অতীব প্রয়োজন। অপর দিকে বর্তমানে ট্রলার বহর ৪০ মিটারের নীচে মৎস্যাহরণে লিপ্ত থাকায় কিশোর ও অপরিপক্ক চিংড়ি আহরণ করছে (চিত্র-২), তাই ৪০ মিটার গভীরতাকে কার্য্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কিশোর চিংড়ির আহরণ বন্ধ করতে হবে।

আধা সনাতনী পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা

ছোট ভাসান জালের দ্বারা ইলিশ আহরণের বিষয়ে অতি আহরণ জানিত চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। তবে নিশ্চিৎ হবার জন্য আহরণের হার সংক্রান্ত গবেষণা কার্য্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বড় ভাসান জালে লাউখ্যার অতি আহরণ হচ্ছে বিধায় এ জালকে কয়েক বৎসর বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চলে বন্ধ রাখা প্রয়োজন। সামুদ্রিক বেহুন্দীকে আরও প্রসার ঘটানোর জন্য মোহনার বেহুন্দীকে অধিক গভীরতায় পাতা উৎসাহিত করা যায়। বড়শীর সাহায্যে পোয়া মাছ ধরা লাভজনক ও অক্ষতিকর বিধায় এ আহরণ প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এটা বর্তমানে কেবল কক্সবাজার এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে।

সনাতনী পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা

সনাতনী পদ্ধতির জালগুলির মধ্যে তিনটি জাল সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, যথা মোহনা বেহুন্দী জাল, বীচসীন ও পোনা জাল। বেহুন্দী জালকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। ফাঁস নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবস্থাপনার সুযোগ নেই। তবে জেলেদেরকে, আধাসনাতনী নুতন প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কক্সবাজার অঞ্চলে বিশেষ মৌসুমে বন্ধ করলে অন্ততঃ ৪০% কিশোর নিধন বন্ধ হবে বলে মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ফলাফলে প্রতীয়মান হয়। মোহনা অঞ্চলে ব্যবহৃত সকল বীচসীন বন্ধ করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। পোনা জাল বন্ধ করা ছাড়া সম্পদ সংরক্ষনের কোন বিকল্প নেই। অন্য কোন পদ্ধতিতে সিলেকটিভভাবে বাগদার পোনা আহরণের জন্য জরুরী গবেষণা হাতে নেয় প্রয়োজন। উপকূলীয় চিংড়ি চাষ চালিয়ে যেতে হলে হ্যাচারীর দ্রুত উন্নয়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে এ ফিশারীতে নিয়োজিত জেলেরা প্রায় সকলেই খন্ডকালীন জেলে, তাদের অন্য পেশা আছে এবং অন্যান্য সবাই বাচ্চা ছেলে মেয়ে বা মহিলা। তাই পুনর্বাসনের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে না।

সনাতনী আহরণের মধ্যে ট্রামেল জাল ক্ষতিকারক নহে এবং কলাকৌশল উন্নতমানের বিধায় এ জালকে অন্যান্য এলাকায় উৎসাহিত করা যায় এবং যন্ত্র সংযোগের মাধ্যমে গভীরতর এলাকায় ৪০ মিটার পর্যন্ত বিস্তারের জন্য সম্প্রসারণ কার্য্যক্রম হাতে নেয়া যায়। বি ও বি পি / এফ এ ও এর সহযোগীতায় কারিগরী সহযোগীতা পকল্পের মাধ্যমে সীমিতভাবে এ কায্যক্রমের প্রাথমিক কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে তা ত্বরান্বিত ও কার্য্যকরীভাবে সফল করা বাঞ্চনীয়।

উপসংহার

সামুদ্রিক সৎস্য সেক্টরটি গোড়া থেকেই অবহেলিত। এ সেক্টরে জনবলের অভাব। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের এবং উৎসাহ প্রদানের

অভাবে দক্ষ জনবল গড়ে উঠছে না। কতিপয় প্রশিক্ষন যাও প্রদান করা হয় তাদেরকে এ সেক্টরে কাজে লাগানো হচ্ছে না। তাই বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠছে না। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ছে না, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জটিলতাও নিরসন হচ্ছে না। অথচ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম হাতে নিতে পারলে মিঠা পানির তুলনায় অধিক উৎপাদন দিতে পারতো। প্রোটিন চাহিদা এবং পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণের লক্ষে জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে আর বিলম্ব না করে পর্যাপ্ত সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ও স্থায়ী কাঠামোর মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করতে হবে।

টেবিল-১ বিগত দশকে বাণিজ্যিক ট্রলার সমূহ কর্তৃক মৎস্যাহরণ।

বৎসর	ষ্ট্যান্ডাড ইফোট	ইফোট সাধারণ	আহরণ কৃত চিংড়ি ট্রলারের সংখ্যা	ধৃত চিংড়ির পরিমান (মেঃটন)	দৈনিক আহরণের হার (কেজি)	মৎস্য ট্রলার দ্বারা ধৃত চিংড়ির পরিমান (মেঃটন)	মোট ধৃত চিংড়ির পরিমান (মেঃটন)	মৎস্য ট্রলারের জন্য রূপান্তরিত চিংড়ি ট্রলারের ইফোট	মোট ইফোট (ষ্ট্যান্ডার্ড চিংড়ি দিবস)
১৯৮১-৮২	২৯৮৭	২৩৯৬	১৩	১৩৪০	৪৪৯	৩৫৭	১৬৯৭	৭৯৫	৩৭৮২
১৯৮২-৮৩	৪৫১০	২৩৯৫	১৮	২০০৪	৪৪৪	১১১৬	৩১২০	২৫১৪	৭০২৪
১৯৮৩-৮৪	৬০৮৭	২৮৬৬	১৯	৩৪৪১	৫৬৫	২০২০	৫৪৬১	৩৫৭৫	৯৬৬২
১৯৮৪-৮৫	৬২৬৭	৫০১৪	২৯	৪২৩৯	৬৭৬	১২৭৯	৫৫১৮	১৮৯২	৮১৫৯
১৯৯৫-৮৬	৫৯৪১	৫৯৯০	৩১	৩৭১৬	৬২৬	৩১৮	৪০৩৪	৫০২	৬৪৪৪
১৯৮৬-৮৭	৬৪৪৯	৬৬২৯	৩১	৪১৭৮	৬৪৮	৩১০	৪৪৮৮	৪৭৯	৬৯২৮
১৯৮৭-৮৮	৬২৩৯	৬৪২৯	৩৩	৩৩৩৯	৫৩৫	১৮০	৩৫২৩	৩৪৪	৬৫৮৩
১৯৮৮-৮৯	৬৬১৫	৬৭৬৩	৩৫	৪৬৬১	৭০৫	২৩২	৪৮৯৩	৩৩০	৬৯৪৫
১৯৮৯-৯০	৫৪৬০	৬০৯৩	৩৬	৩০৮৬	৫৬৫	৪৮	৩১৩৪	৮৬	৫৫৮৬
১৯৯০-৯১*	৪৪৩৭	৪৮৪৫	৩৬	৩৩৮৪	৭৬৩	৪৭	৩৪৩১	৬২	৪৪৯৯

** বৎসরের প্রায় শেষ দুই মাস ঘুর্ণিঝড়ের কারণে মৎস্যাহরণ বিঘ্নিত হয়।*

টেবিল-২ ট্রলার বহর ও ক্ষুদ্র মৎসজীবি কর্তৃক জাল/নৌকা অনুযায়ী চিংড়ি/মাছ উৎপাদন।

সম্পদ আহরণের	প্রধান আহরিত প্রজাতি / গ্রুপ	বার্ষিক উৎপাদন (টন)		একক সংখ্যা		এলাকা/গভীরতা (মিঃ)
পদ্ধতি		চিংড়ি	মাছ	নৌকা/ট্রলার	জাল	
(ক) ট্রলার বহর						
(১) চিংড়ি ট্রলারঃ	বাগদা (পিনিয়াস মনোডন, পি. সেমিসালকেটাস) বাদামী (এম. মনোসেরস) সাদা (পি. ইনডিকাস, পি. মারগুয়েনসিস) ইত্যাদি	৪৬৬১	২৩১৪	৪১		৪০-১০০
(২) ফিশ ট্রালারঃ	পোয়া, কাটামাছ, লাক্কা, হাংগর, রুপচান্দা, ছুরি. ফলিচান্দা ইত্যাদি	২৩২	৯৬৮৬	১২		৪০-১০০
মোট		৪৮৯৩	১২০০০	৫৩		
(খ) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি ঃ						
(১) ফাঁস জাল	-	১৩৬,৪৬৯		-	৬৩৮৯	-
ফাঁস জাল (ড্রিফট) ইলিশ মাছ		-	-	-	-	৪০ পর্যন্ত
" " (ফিক্সড)	ঐ	-	-	-	-	৮-১০ "
বড় ফাঁস জাল ঃ হাংগর			-	-	-	৩০ "
তলদেশীয় ফাঁস জাল ঃ লাক্কা		-	-	-	-	সাউথ প্যাচেস
বাটা জাল ঃ বাটা মাছ		-	-	-	-	৫-১০ পর্যন্ত
(২) বেহুন্দী জাল		মাছ ও চিংড়ি				
মোহনাঞ্চলের	বাদামী ও পিংক চিংড়ি	৭২৭৮৬.০০	-	-	১২৫৬১	৫-২০ পর্যন্ত
	বেহুন্ধী জাল ঃ পোয়া, ছুরি লইট্টা ইত্যাদি সামুদ্রিক বেহুন্দী বাদামী ও পিংক চিংড়ি জাল ঃ ছুরি, লইট্টা, ফ্যাস্যা চইক্কা, ইত্যাদি।	২৬১১১.০০	-	-	৩৮৫২	১০-৩০ পর্যন্ত
বড় ফাঁসের বেহুন্দী জাল ঃ	ভেটকি / কোড়ালমাছ	-	-	-	-	১০-২০ পর্যন্ত
(৩) তিন পরলা জাল ঃ	সাদা, বাগদা, বাদামী চিংড়ি পোয়া, কাটামাছ, লইট্টা ইত্যাদি	১৭৫৩.০০		-	-	৪০০ ৮-২০
(৪) বরশী ঃ	পোয়া মাছ	-		২৮৫৩.০০	৩০০	- ১০-৩০
(৫) টানাজাল ঃ	বাদামী ও পিংক চিংড়ি চইক্কা ফ্যাস্যা, পোয়া, ছুরি	৮০৯০.০০		-	-	৫৫৮ ৮-১০
(৬) চরপাটা জাল ঃ	বাদামী, সাদা ও বাগদা চিংড়ি	-	-	-	-	১০ পর্যন্ত
(৭) জাকি জাল ঃ	বাদামী, সাদা ও বাগদা চিংড়ি	-	-	-	-	১০ পর্যন্ত
মোট ঃ		২৪৮,০৬২				২৩,৭৬০
(৮) পোনা জাল ঃ						
ঠেলা জাল ঃ	সাধারণত বাগদা পোনা ধরার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।	১২৯৪ মিলিয়ন	-	-	৪৩৫৯৬	১০ পর্যন্ত
ফিক্সড বেগনেট ঃ	ঐ	৭৪১ মিলিয়ন		-	-	১৪৯৪৪৯ ৫ পর্যন্ত
ড্রাগ নেট ঃ	ঐ	১৪ মিলিয়ন		-	-	৫৯২৫ ২ পর্যন্ত
সর্ব মোট আহরিত (টন), (বাগদা পোনা ব্যাতীত)		২৬৪,৯৫৫.০০		-	-	-

চিত্রঃ৯ বিভিন্ন প্রকার জালের পরিচালন এলাকা ও ট্রল জালে আহরিত প্রধান প্রজাতি সমূহ

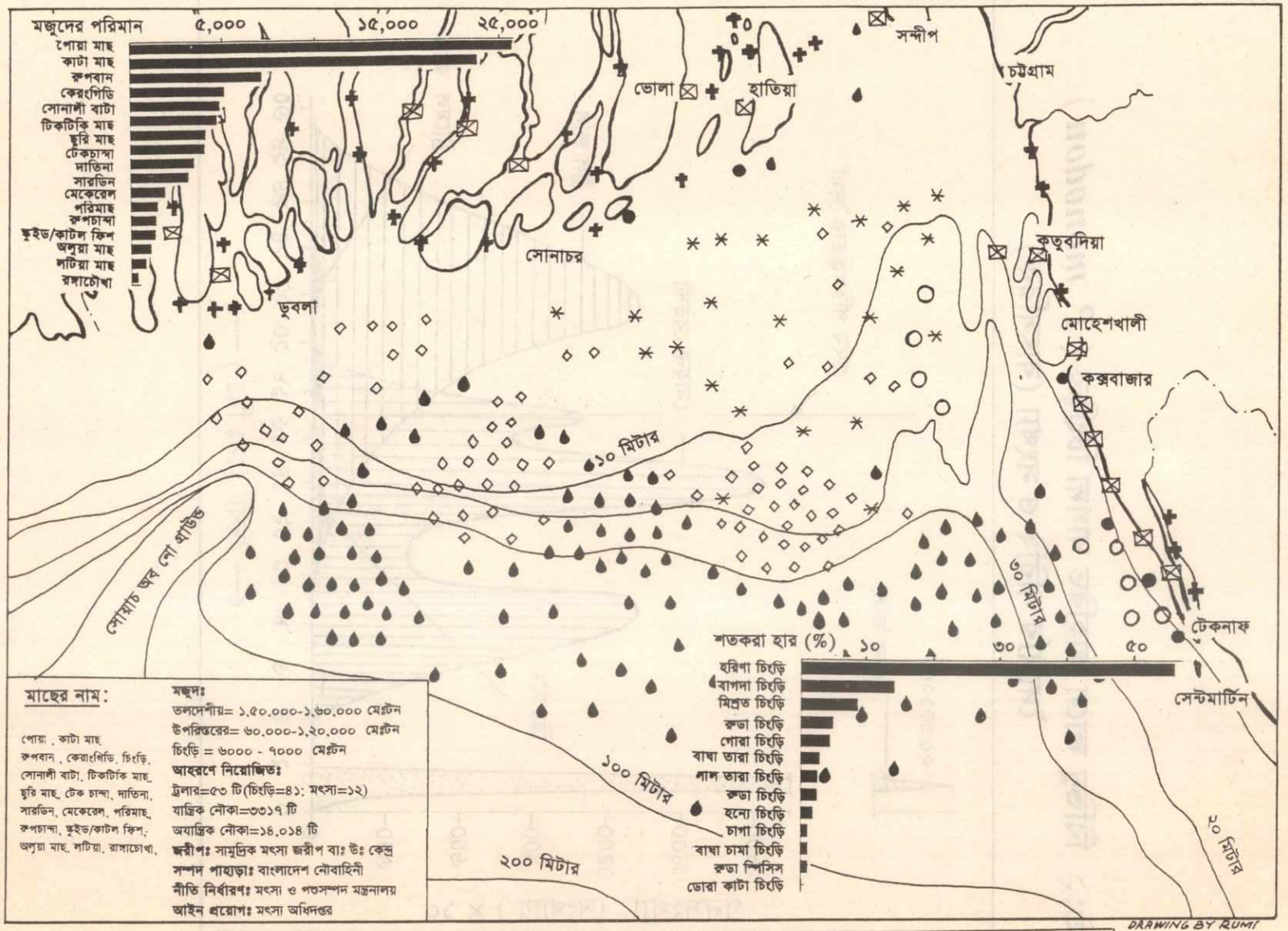

চিত্রঃ২ বিভিন্ন জালে আহরিত বাগদা চিংড়ির (*P. monodon*)
দৈর্ঘ্যের পরিধি ও সংখ্যা (বাৎসরিক)

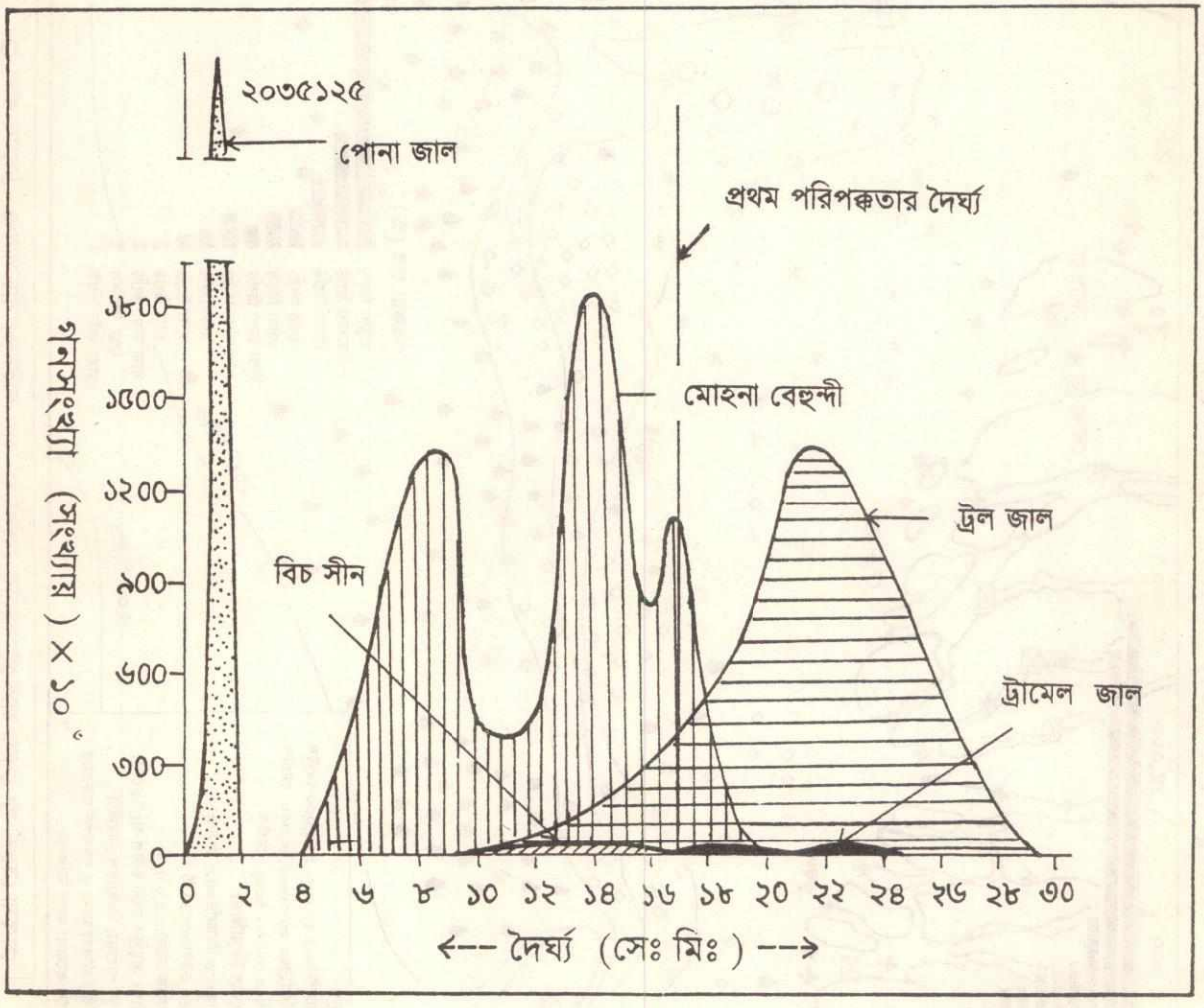

মাছের আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস করণে মান নিয়ন্ত্রণের কৌশল

মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
খন্দকার রাশেদুল হাসান, ব্যবস্থাপক, (মার্কেটিং)
মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিদর্শক

মাছ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের অপরিহার্য অংশ এবং প্রাণীজ প্রোটিনের প্রধান উৎস। প্রাণীজ প্রোটিনের শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। স্বাধীনতাপূর্বকালীন সময় থেকেই বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্য ও অন্যান্য মৎস্য পণ্য রপ্তানী হতো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশী মৎস্য ও মৎস্য জাত পণ্যের চাহিদা বিদেশী ক্রেতাদের নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে বাংলাদেশী মৎস্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর যথাযথ সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণের তাড়া আসে। পচনশীল রুপালী সম্পদ মান সম্পন ভাবে সংরক্ষণ করে ক্রেতাদের চাহিদানুসারে সরবরাহ করা আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এখনও পুরোপুরি ভাবে সম্ভব হয়ে উঠেনি। যার ফলে প্রতি বৎসর দেশকে হারাতে হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। মাছ ধরার পর থেকে বাজারজাত করার বিভিন্ন স্তরে সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রতি বছর মোট উৎপাদনের প্রায় ৫% নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার মূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। এ ছাড়াও রপ্তানী যোগ্য মাছের এক বিরাট অংশ বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদানুসারে মান সম্পন্ন না হওয়ায় অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রতি কেজিতে প্রায় ১-২ মার্কিন ডলার মূল্য কম পাওয়া যাচ্ছে। ফলে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ৮০-১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে। এ কাজে নিয়োজিত জেলে, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াকরণ কারকদের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পকে অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে এই বিপুল পরিমাণ আয় থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে এ দেশে মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এ কার্যক্রম শুধু কারখানায় প্রক্রিয়াজাত রপ্তানীযোগ্য মৎস্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অভ্যান্তরীণ বাজারের জন্য মান নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা অবশ্য এখনও গড়ে উঠেনি। আধুনিক যুগে ক্রেতাদের চাহিদানুসারে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বাজারজাত এবং রপ্তানী করতে হলে একেবারে প্রথম ধাপ মৎস্য চাষ থেকে শুরু করে শেষ ধাপ জাহাজীকরণের প্রতি স্তরে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগ হতে হবে। বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদানুসারে মান সম্পন্ন মৎস্য পণ্য রপ্তাণীর লক্ষ্যে সরকার তাই ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকায় একটি করে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। রপ্তানী বাজারে মাছ বিশেষতঃ চিংড়ি মাছের বিপুল চাহিদা থাকলেও নিম্নমানের কারণে দাম কম পাওয়া যাচ্ছে। রপ্তানী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অজ্ঞতা এবং অবহেলাই মূলতঃ এর জন্য দায়ী। মান নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যে সকল স্পর্শ দূষণে মাছের মান নষ্ট হয়ে যায় তা রোধ করে ক্রেতাদের চাহিদানুসারে মান সম্পন্ন মাছ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসারের পর থেকেই মানুষ তার দৈনদিন্দন চাহিদানুসারে প্রতিটি পণের মান রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। মাছ অতি পচনশীল আমিষ জাতীয় একটি খাদ্য। যে সব কারণে ঐ পচন ঘটে থাকে তা হলো (১) মাছের মধ্যে এনজাইমের ক্রিয়া (২) মাছের উৎকর্ষের উপর অটোলাইসিসের প্রভাব (৩) মাছে ব্রাকটেরিয়ার বিস্তার এবং (৪) তাপমাত্রার প্রভাব। এ ছাড়াও মাছ ধরার পরিবেশ এবং ধরার পর ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর বিভিন্ন স্তরে অযত্ন, অবহেলায় সংরক্ষণ, পরিবহন ঐ পচনকে আরো ত্বরান্বিত করে। আহরণ থেকে বাজারজাত করণের পুরো প্রক্রিয়াটি স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে নিয়ন্ত্রন করা না হলে পচনশীল এই আমিষের মান রক্ষা করা কখনও সম্ভব হবে না।

ভোক্তাদের চাহিদানুসারে মাছ স্বাস্থ্য সম্মতভাবে আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করাই মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। আর এজন্য দেশে বিদেশে এর মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্া, কৌশল এবং উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনে সকলেই সচেষ্ট। মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এখন আর পরীক্ষাগারে কারখানায় পরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত পন্যের মান যাচাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সম্ভাব্য সংক্রমনের উৎস্য সমূহ বিশ্লেষণ এবং তার নিয়ন্ত্রণ আজ যুগের চাহিদা। এ মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অবিহিত করা হচ্ছে, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "হ্যাসাপ" (হেজাড এলাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট), ই ইউ দেশ সমূহে নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রথা বা ওন চেক সিষ্টেম, কানাডায় মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (কিউএমপি), জাপানে আধুনিক এবং অসম স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা (এডভান্স এন্ড ডাইভারস সেনেটারী

কন্ট্রোল সিষ্টেম)। প্রত্যেক দেশই অবশ্য আমেরিকার হ্যাসাপ প্রথা অবলম্বনে মান নিয়ন্ত্রণ কার্য্যক্রমের অবকাঠামো সংস্কার করছে। ক্রেতাদের চাহিদানুসারে বাংলাদেশও হ্যাসাপ ভিত্তিক মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করণ কর্মসূচী (কি এ পি) প্রয়োগ করছে।

সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমুহ বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ এর ধারনা

বিজ্ঞানের উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে অনুজীব কর্তৃক খাদ্যের দূষণ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সারা বিশ্বে আজ খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারক এবং জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিভাবে এই পরজীবের স্পর্শ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, খাদ্য প্রস্তুতকারকগণ সদা সংকিত। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গবেষণা পরিষদ মত প্রকাশ করেছে যে, বাজারজাতকৃত মোট খাদ্য দ্রব্যের প্রায় এক চর্তুথাংশ খাদ্য *অনুজীব কর্তৃক সংক্রামন বা দূষণের কারণে* নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পণ্যের মান, উৎপাদন স্থল থেকেই রক্ষা করার জন্য তাই যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম এইচ, এ, সিসিপি (হ্যাসাপ) প্রথা চালু করে। ১৯৭১ সালে আমেরিকায় খাদ্যনীতি সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলনে তা প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ১৯৮৮ সালে হ্যাসাপ প্রথাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে কোডেকাস এলিমেন্টারিয়াস কমিশন অন ফুড হাইজিন খাদ্যে অনুজীব দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য হ্যাসাপ প্রথা প্রয়োগ করে। তারপর থেকেই বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নামে এই প্রথা বাস্তবায়ন করার কর্মসূচী গ্রহন করে।

হ্যাসাপ (হেজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট) এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রয়োগের ফলে কোন পণ্য উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে ক্রেতা সাধারণের নিকট পৌছানো পর্যন্ত যে কোন ধরণের দূষণ থেকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থা যা ক্রেতাদের চাহিদানুসারে মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে এবং বিপনণে সহায়তা করে। এই প্রথা মাননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সকল প্রথার মধ্যে সর্বোত্তম। হ্যাসাপ এর সফল প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত পণ্য দূষণ সংক্রমিত হওয়ার পূর্বেই সংক্রমনের উৎসস্থলসমূহ চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পণ্যের খাদ্য মান স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ক্যান বা কৌটাজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এ প্রথাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ই ইউ দেশ সমূহে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এবং জাপান সহ অন্যান্য উন্নত দেশ অনতিবিলম্বে হ্যাসাপ প্রথা বাধ্যতামূলক করছে। যে সাতটি মূল নীতি বা কৌশলের সমন্বয়ে হ্যাসাপ প্রথার মান নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সেই নীতির যথাযথঃ মূল্যায়ন, প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল স্বাস্থ্য সম্মতভাবে পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাত করা সম্ভব।

হ্যাসাপ এর মূলনীতি বা কৌসলগুলো হলো

* খাদ্যের শেণীভেদে এবং তার পক্রিয়াজাত করণের ধরণের প্রেক্ষিতে, সম্ভাব্য নিরাপদ এবং নিরাপদ নয় এমন দূষণময় অবস্থান সমূহ যা প্রক্রিয়া কার্য চালনার ক্ষেত্রে সংক্রমন ঘটতে পারে তা চিহ্নিত করা (দূষণ বিশ্লেষণ)।
* সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ সেই সকল স্তর বা অবস্থান যেখানে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় সম্ভাব্য দূষণ কে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা অথবা দূষণের মাত্রাকে একটি ক্ষতিকর পর্যায় হতে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে কমিয়ে আনা যায়।
* প্রক্রিয়াকরণের সময় বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য সংকটের সুনির্দিষ্ট মানদন্ড বা মাত্রা নির্ধারণ পূর্বক প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ প্রতিরোধ করা।
* যথাযথ সতর্কতামূলক/পরিধানযোগ্য কৌশলের প্রয়োগে সম্ভাব্য সংক্রমনের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, যাতে প্রতিটি ধাপে আরোপিত নিরাপত্তামলক ব্যবস্া সঠিকভাবে কাযকর হয়।
* তত্ত্বাবধানে বা মনিটরিং এর মাধ্যমে যদি এমন কিছু ধরা পরে যে সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান, সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এমন সংশোধন ক্ষম কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* হ্যাসাপ বা সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা এবং পনঃপর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠান বা মাননিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং
* পক্রিয়াকরণকরী পতিষ্ঠান কতক তাদের নিজস্ব তত্তাবধানে বা মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার কর্মসূচীর আলোকে, হ্যাসাপ বা সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান দূরীকরণের জন্য গঠিত

আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য বা আমদানীকারকের চাহিদা অনসারে সরবরাহ করার জন্য পক্রিয়াকায পরিচালনার ক্ষেত্রে পতিটি স্তরে বা পযায়ে গহীত পদক্ষেপের দলিল পত্র তালিকাভূক্ত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

উল্লেখিত ৭টি মূলনীতি বা কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের ফলে হ্যাসাপ বা সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পণ্য উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করণের কর্মসূচীর সফল বাস্তাবায়ন করার লক্ষ্যে যে সকল স্তরে সম্ভাব্য সংক্রমণ হতে পারে নিম্নলিখিত প্রবাহ পথ বিশ্লেষণে তার সম্পূরক ধারনা আমরা পেতে পারি (চিত্র)।

প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সমুদ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, প্রভৃতি জলাশয় হতে ধৃত তাজা মাছের উপরিভাগে, ফুলকা এবং পরিপাকতন্ত্রে পরজীবের পরিমান থাকে প্রতি গ্রাম মাছে প্রায় ২-৫ লক্ষ। পরবর্তীতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় হ্যান্ডলিং, সংরক্ষণ, পরিবহন করার ফলে অবতরণ কেন্দ্র সমূহে পৌঁছা পর্যন্ত প্রতি গ্রাম মাছে বৃদ্ধি পায় ৫-১০ লক্ষে। এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, জেলে, পরিবহন কাজে ব্যবহৃত যানবাহন, প্যাকিং সামগ্রী এবং সর্বোপরি বরফ ব্যবহার না করার ফলেই এই পরজীবের বিস্তার ঘটে থাকে। মাছ ধরার পর পরেই তা যদি জীবানুমুক্ত পরিস্কার পানিতে ধোয়ানো এবং ১ঃ১ হারে বরফে সংরক্ষণ করা যায় তবে প্রতি গ্রাম মাছে এ পরজীবির সংখ্যা দাঁড়াতে পারে মাত্র কয়েক হাজারে।

আহরণ কেন্দ্র সমুহে এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক/আড়তদার/ পাইকারদের অযত্ন, অবহেলা, স্বাস্থ্য বিধি মেনে না চলে নোংরা পরিবেশে অপর্যাপ্ত বরফ দিয়ে যেন তেন অবস্থায় নোংরা হোগলা পাতার চাটাই বা কাঠের বাক্সে তাপ নিয়ন্ত্রণ বিহীন অবস্থায় সংরক্ষণের ফলে প্রতিগ্রাম মাছে পরজীবের বৃদ্ধি ঘটে ১০-৫০ লক্ষে। সেই সাথে সংক্রমিত হয় ই-কলি স্যালমোনেলা ও ভিবরিও কলেরার মত ক্ষতিকর পরজীবের যা মাছকে খাবার অনুপযোগী করে তুলে। আহরণোত্তর পরিচর্যার অভাবে এই রুপালী সম্পদের এক বিরাট অংশ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে পৌছার পূর্বেই বা প্রক্রিয়াজাতকরার নিমিত্তে কারখানায় পৌছার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারখানায় পৌছার পর একাজে নিয়োজিত শ্রমিক, সুপারভাইজারগণ আর্ন্তজাতিক চাহিদা এবং মৎস্য জাত পন্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিধি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেন না। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নোংরা সরঞ্জাম এবং দ্রব্যাদি ব্যাবহারের ফলে মাছের মান অবিরতভাবে কমে যায়। বিশেষ করে চিংড়ি মাছের ঝুল এবং অন্যান্য মাছের পটকা সহ প্রক্রিয়াজাত করার ফলে মাছের মানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। লক্ষ করা গেছে যে, ঝুল বা পটকা সহ রপ্তানীকৃত মাছের দাম প্রতিকেজিতে ১-২ মার্কিন ডলার কম পাওয়া যায়। ঝুল বা পটকা মাছের মোট ওজনের ১-৪% ভাগ মাত্র এবং ওজন হিসাবে যার দাম আসে ৪ থেকে ১০ টাকা। অথচ ঝুল বা পটকা সহ রপ্তানী করার ফলে আর্ন্তজাতিক বাজারে দাম কমে যায় প্রতি কেজিতে ৪০ থেকে ৮০ টাকা। মাছ গ্রেডিং এ কারচুপিও কম মূল্য পাওয়ার অন্যতম কারণ।

হ্যাসাপ বা (সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রণ) প্রথার উল্লেখ যোগ্য ও আকর্ষনীয় দিকগুলো হচ্ছে এটি এমন একটি কৌসল যা খুবই যুগোপযোগী, গঠন মূলক, যৌক্তিক, শৃংঙ্খলাবদ্ধ ও পরিবর্তনশীল। যা অবশ্যই পণ্যকে সম্পূর্ণ নিরাপদ খাদ্যে পরিণত করে। তাছাড়া শুধু অনুজীবের উপস্থিতি সনাক্ত করতে যেয়ে যে পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত কর্মসূচীর আলোকে মাছ ধরার পূর্ব থেকে শুরু করে জাহাজীকরণে পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যদি সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা, বাস্তবায়ন করা যায় তা হলেই কেবল বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে মান সম্পন্ন মৎস্য পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব।

হ্যাসাপ বা সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ অবস্থান সমূহ বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার কৌশল সমূহ যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা হলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মাছের চাহিদা বিদেশী ক্রেতাদের নিকট বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে তেমনি মাছ ধরার পর বাজারজাত করার পূর্ব পর্যন্ত যে বিপূল পরিমাণ মাছ নষ্ট হয়ে যায় তাও রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি বিদেশের বাজারে আমাদের পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হবে। হ্যাসাপ কৌশলের সফল প্রয়োগের ফলে ২০০০ সাল নাগাদ ৬৪০০ হাজার মেঃ টন মাছ রপ্তানী করে ২০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকায় দাড়াতে পারে। তাই হ্যাসাপ ভিত্তি, মান নিয়ন্ত্রণের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকারকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখা বর্তমান প্রেক্ষাপটে একান্ত প্রয়োজন।

কেয়াপ (QAP) মাননিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করণ কর্মসূচী

১২ টি সম্ভাব্য সংকটময় দুষন বিন্দু সমূহ বিশ্লেষন ও চিহ্নিত করন

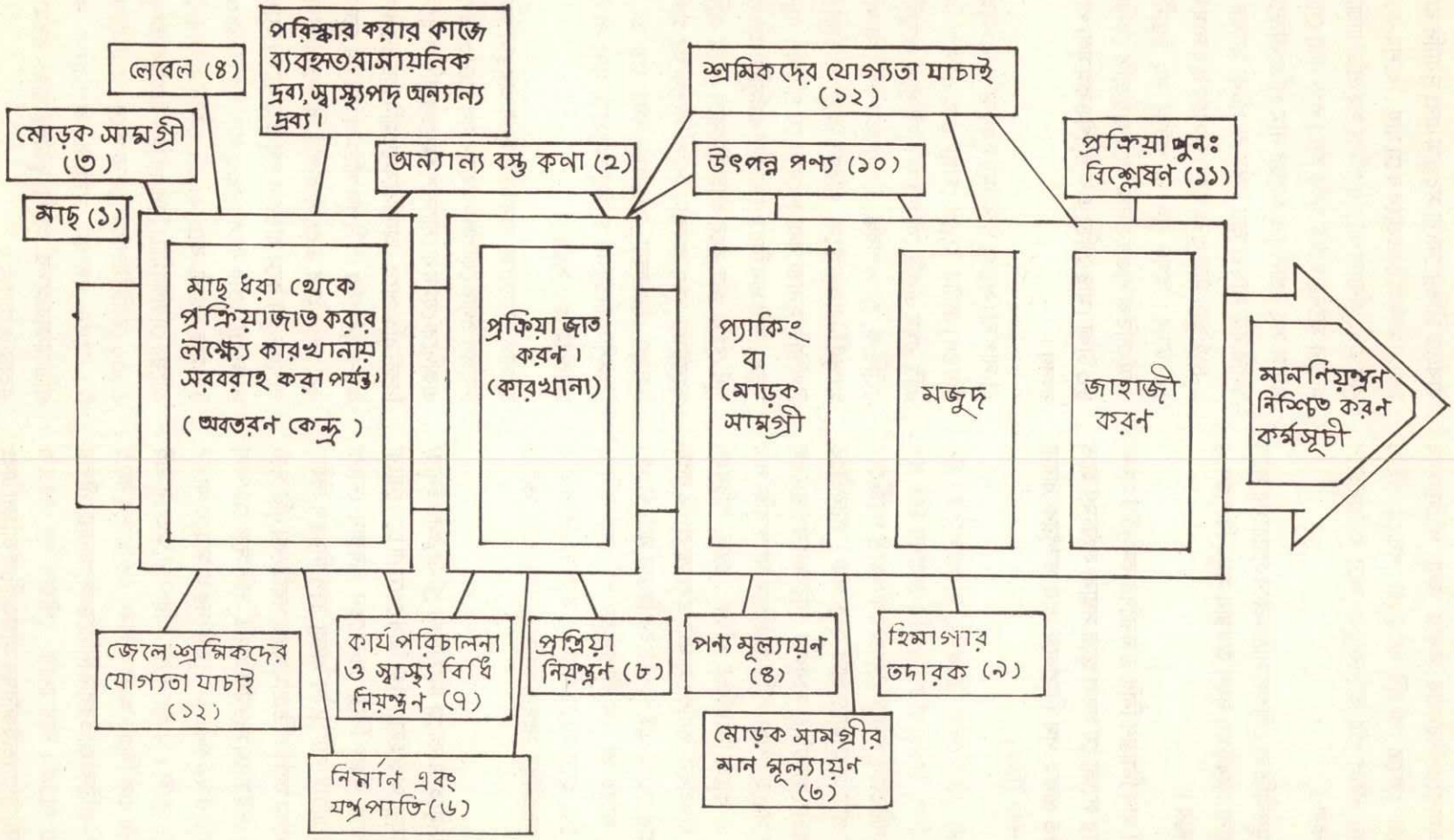

প্রবাহ পথ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা

ফেরদৌস পারভীন, উপ প্রধান
ফিরোজা বেগম, সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া বেকারত দূরীকরণে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নেও মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বর্তমানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ভূমিকা রাখছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মহিলারা শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, প্রশাসন, ব্যাংকিং ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য তথা বাংলাদেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা জনশক্তির সম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ছাড়া এ দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহন অপরিহার্য। নারী সমাজের উন্নতির উপর মূলতঃ জাতীয় কল্যান ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫২.৫ মিলিয়ন হচ্ছে মহিলা। জনশক্তির এই বিরাট অংশের উন্নয়ন এবং সঠিকভাবে কাজে লাগানো একান্ত প্রয়োজন। মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন এবং অধিকার সংরক্ষন সরকারের এক বলিষ্ঠ নীতি। দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলস্রোত ধারায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করার যে সমস্ত সরকারী নীতিমালা গৃহিত হয়েছে, মৎস্য উন্নয়ন কমকান্ডে মহিলাদের অংশগহন তারই একটি দিক। সরকারের এই নীতিকে সামনে রেখে মৎস্য সম্পদ তথা মহিলাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং দেশের অর্থনেতিক কাঠামোকে জোরদার করার লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করনের নানাবিধ পরিকল্পনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মৎস্য চাষে মহিলাদের সম্পৃক্ততা

মৎস্য বিষয়ক পেশায় নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৩৬ ভাগই মহিলা। এর মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ। সরাসরি মৎস্য আহরনের সাথে যুক্ত না হলেও জাল তৈরী, জাল রক্ষনাবেক্ষন, মৎস্য সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণের সাথে তারা সম্পৃক্ত। দেশে মাথা পিছু দৈনিক আমিষের প্রয়োজন প্রায় ৪৫ গ্রাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে পরিমাণ মাছ খেতে পারি, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আমদের দেশে রয়েছে অসংখ্য দীঘি, পুকুর ডোবা, নালা যেখানে মহিলারা সাংসারিক কাজের পাশাপাশি মাছ চাষ করে বাড়তি আয়ের সংস্থান এবং পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির ব্যবস্থা করতে পারেন। গ্রামে বাড়ীর আশেপাশে ডোবা-নালা-গর্ত বর্ষা মৌসুমে পানিতে ভরে উঠে। তখন এখানে সৃষ্টি হয় মশার আবাসস্থলে। ছড়ায় নানাবিধ রোগ। এই ডোবাটি সময় মত পরিস্কার করে মাছের পোনা ছাড়া যায়। এমন ছোট ডোবা বা গর্তে নতুন উদ্ভাবিত প্রজাতি থাই সরপুঁটির পোনা ছাড়া যায়। যা তিন মাসেই খাওয়া এবং বিক্রির উপযুক্ত হয়। এ সব মাছ চাষের জন্য খাবার হিসাবে চালের কুঁড়া এবং মুরগীর বিষ্ঠা সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই মশা উৎপাদনের উৎস এবং রোগ ব্যাধির বাহক সেই ডোবাকেই একজন মহিলা পারেন পুষ্টি বা আমিষ এবং বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবে পরিণত করতে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষে মহিলা

উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষে মহিলারা উল্লেযোগ্য হারে অংশ গহন করে থাকেন। চিংড়ির পোনা সংগহকারী শ্রমশক্তির শতকরা ৮০ ভাগই মহিলা ও শিশু। শিশুরা ছোট ছোট জালের সাহায্যে পোনা সংগ্রহ করে তাদের মায়েদেরকে সাহায্য করে থাকে। কাজ করার সামর্থ আছে এমন সব বয়সের মহিলারাই দলবদ্ধভাবে অথবা এককভাবে পোনা সংগ্রহ করে থাকে। পোনা সংগ্রহ ছাড়াও মহিলারা চিংড়ি সংরক্ষন , প্রক্রিয়াকরন ও বাজারজাতকরনের সাথেও সম্পৃক্ত। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের পোনা সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়ীরা কম মজুরী দিয়ে থাকেন। তবে বতমানে অনেক মহিলারাই সরাসরি বাজারজাত করন করছেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পে মহিলাদের সম্পৃক্ততা

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প ঃ মৎস্য অধিদপ্তরের আর্থিক সহায়তায়

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পে প্যাকেজ কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উনয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কাযক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় মহিলাদের দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দিঘী-পুকুরে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। মহিলাদের মাছ চাষের প্রশিক্ষন ছাড়াও প্রদর্শনী পুকুর ও মাছ চাষের উপযোগী উৎপাদন সামগ্রী ক্রয় ও উৎপাদন খরচের জন্য প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমে বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় ১১টি প্রকল্পে ৪৬৭ জন মহিলা কর্মরত আছেন। পুকুর-দিঘী, বিলে মাছ চাষ ছাড়াও হাঁস-মুরগীর সমন্বিতি চাষ, পুকুরের পাড়ে সব্জির আবাদও তাদের কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। দরিদ্র ভূমিহীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের লভ্যাংশ দলভূক্ত সদস্যদের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারন প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন মহিলাদের মৎস্য চাষে প্রশিক্ষন ও ঋণ বিতরণ করা হয়। যার ফলে, প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২৫০ জন মহিলা উপকৃত হচ্ছেন।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, বিল ও বাওড় প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় খনন/পুনঃ খনন কাজে প্রচুর সংখ্যক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন।

অন্যান্য প্রকল্প ঃ সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, ডাকউইড সম্প্রসারন প্রকল্প, বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্য চাষ প্রকল্প, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীন মহিলাদের মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরনের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে আরও অনেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে, যেখানে মৎস্য চাষে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলাদের নিয়োজিত করা হচ্ছে।

মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত মহিলাদের ভূমিকা

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও শিক্ষা-দীক্ষা, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্যম, আগ্রহ কর্মস্পৃহা ও নিষ্ঠার সাথে অফিসে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে চলেছে। প্রশাসনে, ব্যবস্থাপনায়, গবেষনায় এবং মাঠ পর্যায়ে সর্বস্তরে মৎস্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। বলতে গেলে সত্তর দশক থেকে বিশবিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে মৎস্য চাষ বিষয়ে জ্ঞান লব্ধ ২/৪ জন মহিলা মৎস্য অধিদপ্তরে কাজে যোগদান করেন। দিন দিন মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে বিভিন্ন পদে যেমন গবেষনা কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, এ ধরনের বিভিন্ন পদে মহিলারা যোগদান করছেন। কর্মদক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা ও যোগ্যতার বলে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী উপ-প্রধান এর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠত হয়েছেন। তবে উচ্চ পদে সংখ্যায় খুবই কম। মৎস্য অধিদপ্তরের মোট ৮১৮ জন কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন মহিলা এবং ৩,১৩৯ জন সহযোগী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৫৭ জন মহিলা কর্মকর্তা আছেন।

অধিদপ্তরে কর্মরত এ সব মহিলারা মৎস্য চাষ সম্বন্ধে মহিলাদের জ্ঞান দান করছেন প্রশিক্ষন দিচ্ছেন। মহিলাদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও সম্পৃক্ত করার জন্য সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল উৎরিয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে আসার পথ সুগম করছে এবং গ্রামীন ও দরিদ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করছে। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অংগ উন্নয়নে মহিলা উন্নয়নকে সামনে রেখে মৎস্য সম্পদ তথা মহিলাদের উন্নয়নে তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অদূর ভবিষ্যতে তাদের অভিজ্ঞতা, শ্রম, মেধা, দক্ষতা আরও সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এন, জি, ও দের কার্যক্রম

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যেমন ব্রাক, কারিতাস, প্রশিকা, আর. ডি. আর. এস. বাঁচতে শেখা ইত্যাদি মহিলাদের দল গঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করছে। এই সমস্ত বেসরকারী সংস্থা মহিলাদের ছোট ছোট দল গঠন করে তাদের মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ঋণ বিতরণ ও মাছ চাষের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে। মহিলারা এ সমস্ত পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া, খাদ্য, সার,

দেওয়া, পাহাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ নিজেরাই করে থাকে।

গ্রামীন ব্যাংকের কর্মসূচীতে মহিলা

গ্রামীন ব্যাংক এবং গ্রামীন ব্যাংকের অধীনে গ্রামীন মৎস্য ফাউন্ডেশন মহিলাদের মাছ চাষে সম্পৃক্ত করছে। দল গঠন ও ঋণ দান কর্মসূচীর অধীণে মহিলারা ৫ সদস্য বিশিষ্ট ছোট ছোট দল গঠনের মাধ্যমে মাছ চাষ করছে। মাছ চাষের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি ও উপকরন এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে। মহিলারা কায়িক পরিশ্রম করে মাছ চাষ করছে। বিনিময়ে আয়ের অর্ধেক তারা গ্রহন করছে। এভাবে মহিলারা তাদের সংসারের আয় ও স্বচ্ছলতা বাড়াচ্ছে।

মৎস্য চাষে রাষ্ট্রপতির পুরুস্কার প্রাপ্ত একজন মহিলা

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে সমস্ত মহিলারা আজ বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং যাদের অবদান দেখে অন্যরা উদ্বুদ্ধ হবেন তাদের একজনের উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা ৬০ বৎসরের কাছাকাছি বৃদ্ধা বিধবা মহিলা মিসেস রাহাদা খাতুন ১৩৯৮ বাংলা সনে মৎস্য উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। রাহাদা খাতুনের মাছ চাষে ছিল প্রচুর আগ্রহ। তাই তার বাড়ীর আঙ্গিনায় অযত্নে পড়ে থাকা ১৬ শতাংশ জলায়তনের পকরটিকে আবাদি করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে ইকলাম সহায়তায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতাধীন শুধুমাত্র কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহন করে ১৩৯৮ বাংলা সনে শতাংশ প্রতি ১৫.৭ কেজি মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, মিরর কার্প, সরপুঁটি ও গ্রাস কার্প) উৎপাদন করেন। যা তার পুকুরের পূর্বের উৎপাদনের তুলনায় তিন গুনেরও বেশী। মাছ চাষে তিনি ২,৮০৫/= টাকা খরচ করে ১২,০১০/= টাকা আয় করেছেন। অর্থাৎ তার নীট মুনাফা হয়েছে ৯২০৫/= টাকা যা অন্যান্য মহিলাদের মাছ চাষে আগ্রহী করার উদাহরণ বলা যেতে পারে। তিনি তার পুকুরে মাছ চাষ করে সাংসারিক মাছের চাহিদা মিটাচ্ছেন, সুস্বাদু তাজা মাছ খাচ্ছেন এবং বাড়তি আয়ও করছেন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার পর আমরা তার মনের অবস্থা জানতে চেয়েছিলাম, প্রতি উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, আমি এভাবে মাছ চাষ করতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং আর্থিকভাবেও উপকৃত। তার উপদেশে অন্যান্য মহিলারাও এভাবে মাছ চাষে এগিয়ে আসুক।

মহিলাদের মাছ চাষের সমস্যা

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাছ চাষে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। শ্রম বিভাজনের বৈষম্য, পুকুরের মালিকানা স্বত্ব, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি অন্যতম। এছাড়াও পুরুষদের অসম ও অনুৎসাহী দষ্টিভংগীও মহিলাদের মাছ চাষে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

সুপারিশ মালা

- মহিলাদের মাছ চাষে নিয়োজিত করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাদের সুসংঘবদ্ধভাবে দল গঠন করা।
- সংগঠিত মহিলাদের দলকে তাদের নিজস্ব আয় থেকে ব্যাংকে সঞ্চয় করার পরামর্শ প্রদান করা।
- সরকারী/বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঋণ বিতরন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সরকারী পর্যায়ে অধিকসংখ্যক মহিলা সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ কর্মী নিয়োজিত করা।
- মৎস্যচাষ সম্প্রসারন কর্মকান্ডে মহিলাদের পশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- প্লাবনভূমিতে বিশেষতঃ বিল, হাওড়, বাওড় এলাকায় মহিলাদের খাঁচায় মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সন্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।
- উন্নয়নে মহিলা বিষয়টি সামনে রেখে মৎস্য চাষে দক্ষ, কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত মহিলাদের মৎস্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে আরও ব্যপকভাবে ও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার উদ্দ্যোগ গ্রহন।

জলাশয়ে মৎস্য চাষ
গড়বে পুঁজি মিটবে আশ
মৎস্য পক্ষ '৯৫ সফল হোক

ঝলক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র
মাষ্টার পাড়া, গৌরীপুর,
ময়মনসিংহ। ফোন ঃ ৫৪

এখানে উন্নতমানের রুই, কাতলা, মৃগেল ও অন্যান্য
কার্প জাতিয় মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন ও
সুলভে বিক্রয় করা হয়।

চিংড়ি চাষে এগিয়ে আসুন
বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনুন।

মৎস্য পক্ষ '৯৫ সফল হোক

ঝলক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র
মাষ্টার পাড়া, গৌরীপুর,
ময়মনসিংহ। ফোন ঃ ৫৪

উন্নতমানের চিংড়ি পোনা উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদনের গতিধারা

মমতাজ বেগম, উপ-প্রধান
রাখাল চন্দ্র কংশ বণিক, এস. এস. ও

দেশের অর্থনীতি, পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৪.৭ ভাগ এবং কৃষি সম্পদ হতে আয়ের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ আসে মৎস্য সম্পদ থেকে। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। মৎস্য সম্পদ জরীপ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩.০৮ লক্ষ হেক্টর, এর মধ্যে প্লাবণভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৬১ লক্ষ হেক্টর। তটরেখা বরাবর ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বগ কিলোমিটার। এত বিস্তৃত জলাশয় থাকা সত্ত্বেও ১৯৬২-১৯৮০ সালের মধ্যে মানুষের দৈনিক মাথাপিছু মাছের প্রাপ্তি ৩৩ গ্রাম হতে ২০ গ্রামে হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬.৪৬ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৭.৭৪ লক্ষ টনে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯০) ৭.৭৪ লক্ষ টন থেকে ৮.৫৬ লক্ষ টনে এবং চতুথ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯০-৯৫) ৮.৫৬ লক্ষ টন থেকে ১১.৭০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৫ সাল হ'তে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে মাছ উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪.২৪ ভাগ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

মাছের উৎপাদন ৭.৭৪ লক্ষ টন হতে ১০.০০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানী ৩৮ হাজার টন এবং অতিরিক্ত ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ছিল। এ পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্ধ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে খরচ হয় মাত্র ১৫৮.৩০ কোটি টাকা এবং মাছের উৎপাদন ৮.৫৬ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ১৪.৪ ভাগ কম। তবে, এই পরিকল্পনাকালে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন হ্রাস পেলেও সামুদ্রিক মৎস্য এবং মৎস্য চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ পরিলক্ষিতহয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মানুষের মাথাপিছু মাছ সরবরাহ জনপ্রতি দৈনিক ২০ গ্রাম থেকে ২৫ গ্রামে বৃদ্ধি করে মাছের প্রাপ্যতা ১১.৫০ লক্ষ টন এর সাথে রপ্তানী ও শিল্পের ব্যবহারের জন্য ০.৫০ লক্ষ টন নির্ধারণ করা হয়। ফলে, মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১২.০০ লক্ষ টন। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য সরকারী খাতে অথ বরাদ্ধ ছিল ৭৪৯.০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে আরও ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু এ পরিকল্পনাকালে মৎস্য সেক্টরে বিভিন্নউন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার তলনায় শতকরা ৫৮.৬ ভাগ কম। এ পরিকল্পনাকালে গহীত উন্নয়ন পকল্পসমহের বাস্বায়ন অগগতি তেমন সন্তোষজনক নয়। ফলে, বাস্তবায়নাধীন অধিকাংশ প্রকল্পই পরবতী পরিকল্পনার আওতায় অন্ভক্ত করা হয়। এ পরিকল্পনাকালে সরকারী বিনিয়োগ কম হওয়া সত্তেও বেসরকারী খাতের সাফল্যজনক অংশগ্রহণে মাছের উৎপাদন ৮.৪৭ লক্ষ টন হতে ১১.৭০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে যা সন্তেষজনক বলে বিবেচনা করা যায়। বদ্ধ জলাশয়ে এবং চিংড়ি ঘেরে উন্নত মৎস্য ও চিংড়িচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সহ চাষভিত্তিক প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা হয়েছে বলে বেসরকারী খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মাঠ পর্যায়ে মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে বদ্ধজলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মৎস্য উৎপাদনের প্রধানতম উৎস্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে যে মাছের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল তা মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম গ্রহণের ফলে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে মাছ আহরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী লক্ষ্য করা যাচ্ছে (পৃষ্ঠা-৭৮ এ সংযুক্ত সারণী-১)। তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯৫) মোট দশ বৎসরে দেশের সকল উৎস্য হতে

মাছের উৎপাদন ৭.৭৪ লক্ষ টন হতে প্রায় ১১.৭০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পায় যাতে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ৪.২৪ ভাগ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার খুবই নগণ্য। অন্যদিকে দীঘি-পুকুর এবং উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরে মাছ ও চিংড়ি চাষ উৎস্য হতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১.২৩ লক্ষ টন হতে ৩.৪০ লক্ষ টনে, যাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪.৫৫ ভাগ হতে ২৫.৮২ ভাগ এবং গড়ে শতকরা ১০.৫১ ভাগ। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উৎস্য হতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১.৮৮ লক্ষ টন হতে ২.৭৭ লক্ষ টনে, যাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১.২৫ ভাগ হতে ১০. ১০ ভাগ এবং গড়ে শতকরা ৩.৭১ ভাগ। বর্তমানে মৎস্য উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ আহরণ, অভ্যন্তরীণ চাষ এবং সামুদ্রিক আহরণ এই তিনটি উৎসের অনুপাত হলো যথাক্রমে শতকরা ৪৮.০৮ ভাগ, ২৮.৮৩ ভাগ এবং ২৩.০৯ ভাগ।

ক) বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ঃ

বর্তমানে দেশে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ১.৪৭ হেক্টর দীঘি-পুকুর, ৫ হাজার হেক্টর বাওড় এবং পথিপার্শস্থ ডোবা নালা এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকার প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর আধাবন্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ উন্নয়নের সুযোগ আছে। কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে বদ্ধজলাশয়ে মাছের উৎপাদন বদ্ধি অব্যাহত আছে। দেশে দীঘি-পকরগুলোতে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭০০ কেজির বিপরীতে বর্তমানে প্রায় ১৯০০ কেজিতে উনীত হয়েছে। উনয়ন পকল্পসমহের পদশনী খামারগুলোতে ৩-৭ টন পর্যন্ত মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ১৮টি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পর বরপিট ও সেচখালে সমন্বিত মৎস্যচাষ উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অন্তর্গত ৭ লক্ষ হেক্টর আধাবদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ প্রসার ঘটাতে পারলে তা বেকার যুবক এবং প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখবে। বাওড় ও বিলগুলোতে উপকারভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনায় মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৩৬ কেজি হতে ৫৩০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। বদ্ধ এবং আধাবদ্ধ জলাশয় সমুহে উন্নত প্রযুক্তির মৎস্য চাষ প্রসার অব্যাহত রাখলে অচিরেই মৎস্য চাষের উৎস্য হতে ৩-৫ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

খ) উপকুলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ঃ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ বিগত বছরগুলোতে ব্যাপক প্রসার লাভের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় তথাপি চিংড়ি খামারের আয়তন বিগত ১০ বছরে ক্রমান্বয়ে ৬৪,০০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৪০,০০০ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চিংড়ির উৎপাদন ৭,৫০০ টন থেকে ২৫,৫০০ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আধানিবিড় পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন হেক্টর প্রতি এক ফসলে ৩-৫ টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলে ৬৩৫ হেক্টর এবং খুলনা অঞ্চলে ৮১০ হেক্টরে আধানিবিড় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বিগত ৪-৫ বৎসরে গলদা চিংড়ির চাষও একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। ১৯৯১ সালে যেখানে গলদা চিংড়িখামারের আয়তন ছিল ৮৯০ হেক্টর বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮৪০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। দেশের উপকূলীয় চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন অতি দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে। অন্যদিকে চিংড়ির পোনা এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রসারের অভাবে উৎপাদনের হার তেমন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি সীমিত রেখে চিংড়ি উৎপাদন হার বৃদ্ধির প্রযুক্তি প্রসারের দিকে অধিক মনোনিবেশ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির হ্যাচারী স্থাপন করে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) অভন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ঃ

সুষ্ঠু জলমহাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যজীবীদের আথ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রায় ১০,০০০ জলমহালের মধ্যে ২৫৫টি জলমহালে রাজস্বভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থার পরিবর্তে উৎপাদনভিত্তিক এবং উপকারভোগীদের অংশীদারিতমলক নতন জলমহাল ব্যবস্পনা চালু করা হয়। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্লাবনভূমির আয়তন হ্রাস ও প্রাকৃতিক উপায়ে মৎস্য প্রজনন ও চারণক্ষেত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মৎস্য উৎপাদনের হ্রাসের ধারাকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম এবং চাষভিত্তিক প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বিগত ১৯৮৯ সাল হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জীববৈচিত্র বজায় রাখার লক্ষ্যে ১০টি মুক্ত জলমহালে মাছের অভয়আশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে হেক্টর প্রতি মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ১০৫ থেকে ১৩২ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। এভাবে মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন হ্রাস বন্ধ করার কৌশল হিসেবে উপকারভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা টেকসই হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ

বিগত পরিকল্পনাকালে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ সামুদ্রিক মাছ আসে উপকূলীয় ক্ষুদ্র জেলেদের মাধ্যমে। কিন্তু এতদিন আর্টিসেনাল ফিসারীজ এর রেগুলেটরী ফাংশন এই অধ্যাদেশের আওতায় না থাকায় যান্ত্রিক ও দেশী মৎস্য আহরণ নৌকার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উৎপাদন মাত্রা সহনশীল রাখার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের আওতায় ট্রলার বহরের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে এবং কতিপয় জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ৫২টি ট্রলার গভীর সমুদে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে। আর্টিসেনাল জেলেদের ৩,৩১৭ টি ইঞ্জিনচালিত এবং ১,১৪,০০০টি ইঞ্জিনবিহীন নৌকা উপকুলীয় অঞ্চলে মাছ আহরণে নিয়োজিত আছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত ১০ বৎসরে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১.২৫-১০.১০ ভাগ; গড় প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.৭৩ ভাগ এবং মাছ আহরণের গতিধারায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বর্তমানে সামুদ্রিক অঞ্চলের মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় উপনীত হয়েছে। এমতাবস্থায় গভীর সমুদ্রের উপরিতলার (পেলাজিক) মাছ আহরণের কলা-কৌশল উদ্ভাবন করে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ) রপ্তানী উন্নয়ন ঃ

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ৩,২৭৭ টন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্য এবং মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানী করে ৩.৫ কোটি টাকা অর্জন করে। বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা আশতীত অর্জিত হয়েছে। ফলে, বৈদেশিকমুদ্রা অর্জনের উর্ধ্বমুখী গতিধারা অব্যাহত আছে। মৎস্য সেক্টরে রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮৫% ই চিংড়ির অবদান। উপকুলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ প্রসার লাভ করায় ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত চাষ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে চিংড়ির উৎপাদন তথা রপ্তানীর পরিমাণও প্রতি বৎসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সংখ্যা ১১০টি এবং হিমায়িত চিংড়ি এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর সাথে ২০০টি প্রতিষ্ঠান জড়িত। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ এবং মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গতিধারা পৃষ্ঠা-৭৮ এ সংযুক্ত সারণী-২ এ দেখানো হ'ল।

তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিগত দশ বৎসরে হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ১৮,৩০৬ টন হতে ৩৬,২৮৩ টনে উন্নীত হয়। যাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ২৩৩.২৫ কোটি টাকা হতে ১১২৫.২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এখাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৮২ ভাগ হতে ৫২.৭৩ ভাগ এবং গড়ে শততকরা ১৮.০৯ ভাগ।

উপসংহার ঃ

বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগ সার্থকতা এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উৎস্য সমুহের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির মুল্যায়ন করলে প্রতীয়মান হয় এই সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ বর্তমানে অতিমাত্রায় আহরণের ফলে এ খাতে মৎস্য সম্পদ সহনশীল মাত্রায় আহরণের নিমিত্তে বিস্ত মুক্ত জলাশয়ের উপকারভোগী মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের নীতিমালা প্রবর্তন করা উচিত। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন ও বাণিজ্যিক ট্রলার বহরের প্রসারে বিনিয়োগ সীমিত বিধায় অনাহরীত গভীর সমুদ্রের পেলাজিক মৎস্য সম্পদ আহরণের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিনিয়োগের উৎস্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে দেশের বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়ের বিস্তৃতি, উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিবেচনা করে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উনয়নের নিমিত্তে লাগসই পযক্তি প্রয়োগে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ফলে, মাছের অভ্যন্তরীণ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

সারণী১ঃ বিগত তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন গতিধারা

বৎসর	অভ্যন্তরীণ মৎস্য		সামুদ্রিক মৎস্য	মোট মৎস্য উৎপাদন	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
	আহরণ	চাষ			
৮৪-৮৫	৪.৬৩	১.২৩	১.৮৮	৭.৭৪	-
৮৫-৮৬	৪.৪২	১.৪৫	২.০৭	৭.৯৪	২.৫৮
৮৬-৮৭	৪.৩১	১.৬৬	২.১৮	৮.১৫	২.৬৪
৮৭-৮৮	৪.২৩	১.৭৬	২.২৮	৮.২৭	১.৪৭
৮৮-৮৯	৪.২৪	১.৮৪	২.৩৩	৮.৪১	১.৬৯
৮৯-৯০	৪.২৪	১.৯৩	২.৩৯	৮.৫৬	১.৭৮
৯০-৯১	৪.৪৩	২.১১	২.৪২	৮.৯৬	৪.৬৭
৯১-৯২	৪.৭৯	২.২৭	২.৪৬	৯.৫২	৬.২৫
৯২-৯৩	৫.৩৩	২.৩৮	২.৫০	১০.২১	৭.২৫
৯৩-৯৪	৫.৫২	২.৭৫	২.৬০	১০.৮৭	৬.৪৬
৯৪-৯৫	৫.৭০	৩.৩০	২.৭০	১১.৭০	৭.৬৪

সারণী-২ ঃ বিগত তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য এবং মৎস্যজাত গণ্যের রপ্তানীর গতিধারা।

মৎসর	হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার
৮৪-৮৫	১৮,৩০৬	২৩৩.২৫	-
৮৫-৮৬	২৩,০৪৮	৩৫৬.২৫	৫২.৭৩
৮৬-৮৭	২৩,৭৬১	৪২৪.০৫	১৯.০৩
৮৭-৮৮	২৩,৪২৩	৪৫৪.১২	৭.০৯
৮৮-৮৯	২১,৭১৯	৪৭১.৪৯	৩.৮২
৮৯-৯০	২৩,৩৩৯	৪৮৭.৭৭	৩.৪৫
৯০-৯১	২৬,১০৯	৫২৬.৬২	৭.৯৬
৯১-৯২	২২,০৮০	৫২৪.৩৫	- ০.৪৩
৯২-৯৩	২৬,৬০৭	৭০০.২৯	৩৩.৫৫
৯৩-৯৪	৩১,৮৩৫	৯২০.৯৬	৩১.৫১
৯৪-৯৫ (এপিল/৯৫)	৩৬,২৮৩	১১২৫.২৬	২২.১৮
			১৮.০৯

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আইনসমূহের সংক্ষিপ্তসার

সংকলনে ঃ মোঃ মাহমুদুল হক
এবং
মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া

মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য্যের গুরুত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি সহনশীল পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উনয়নের জন্য বেশ কয়েকটি আইন বাংলাদেশে পচলিত আছে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত সার পদান করা হলো ঃ

ক. দি ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ এক্ট, ১৯৫০ (ইষ্ট বেংগল এক্ট-১৮, ১৯৫০) ঃ

☞ সাধারণভাবে ইহা মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ নামে পরিচিত। উক্ত এক্টের আওতায় পরবর্তীতে যেসব সংশোধনী, বিধি ইত্যাদি জারী হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

☞ দি ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ এক্ট, ১৯৫০-এর ক্ষমতার্পন, ১৯৫০ (নং -৬৫৮১ ফিশ, জুলাই ৩, ১৯৫০, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, কো-অপারেশন এন্ড রিলিফ, ফিশারীজ ব্রাঞ্চ)।

☞ ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এন্ড করজারভেশন অফ ফিশ (এ্যামেন্ডমেন্ট) এক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৪ সনের এক্ট নং -২)।

দি ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ(এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭০(ইষ্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং -২৬, ১৯৭০)।

☞ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ (অর্ডিন্যান্স নং -৫৫, ১৯৮২)।

☞ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫ (এস আর ও ৪৪২ -এল /৮৫, অক্টোবর ১৬, ১৯৮৫ মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়)।

☞ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫ এর ক্ষমতার্পন, ১৯৮৬ (নং-৫/ মৎস্য (বিবিধ) ২৬৩/৮৪/৯৭, মার্চ ৪, ১৯৮৬, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়)।

☞ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫ এর সংশোধনী, ১৯৮৭ (এস আর ও ২৬৯-আইন/৮৭, নভেম্বর ৪, ১৯৮৭, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়)।

☞ প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫-এর সংশোধনী, ১৯৮৮ (এস আর ও ২৪-আইন/৮৮, জানুয়ারী ২৫, ১৯৮৮, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়)।

☞ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ (এ্যামেন্ডমেন্ট) এক্ট, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন)।

সংশ্লিষ্ট আইনের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ ঃ

০১. এ আইনে মাছ বলতে সকল কার্টিলেজিনাস, বোনী ফিশ, প্রন, শ্রিম্প, এমফিবিয়ানস, টরটয়েজ, টারটলস, ক্রাস্টাসিয়ান এ্যানিমেলস, মোলাস্কস, ইকাইনোডার্ম এবং ব্যাং- এর জীবন চক্রের সকল ধাপকে বুঝাবে।

০২. এ আইনে ফিশারী বলতে সকলপ্রকার জলাশয়, পাকৃতিক বা কৃত্রিম, মুক্ত বা আবদ্ধ, স্রোতস্বী বা স্থির, যেখানে মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, ব্রিডিং, আহরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জড়িত; তবে কৃত্রিম এ্যাকুরিয়াম উক্ত আইনের আওতাভূক্ত হইবেনা।

০৩. নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা সীজ , অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

০৪. জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ ইত্যাদি বা কোনরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

০৫. অভ্যন্তরীণ বা উপকুলীয় জলাভূমিতে বিস্ফোরক, বন্দুক বা তীর-ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

০৬. অভ্যন্তরীণ জলাভুমিতে বিষ প্রয়োগ, পল্যুশন, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

০৭. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল ও বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্পতিমাছ ধরা বা ধরা ও ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

০৮. চাষের উদ্দেশ্যে ধরার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (বর্তমান সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) নির্ধারিত ফির বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে বিধিবদ্ধ ২৭টি নদী, খাল ইত্যাদিতে নির্ধারিত সময়ে যে কোন আকৃতির রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

০৯. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঃ

ক. প্রতি বৎসর জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া;

খ. প্রতি বৎসর নভেম্বর-এপ্রিল সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির ইলিশ (যা 'জাটকা' নামে পরিচিত);

গ. প্রতি বৎসর নভেম্বর-এপ্রিল সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির পাংগাস;

ঘ. প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী -জুন সময়ে ৩০ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির সিলন;

ঙ. প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী-জুন সময়ে ৩০ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির ভোল;

চ. প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী-জুন সময়ে ৩০ সেন্টিমিটারের নীচে আকৃতির আইড় ধরতে, পরিবহন করতে, প্রদান করতে বা নিজস্ব এখতিয়ারে রাখতে পারবে না।

১০. বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

১১. জীবিত বা মৃত ব্যাং ধরা, বহন করা, পরিবহন করা, প্রদান করা বা এখতিয়ারে রাখা নিষিদ্ধ।

১২. মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদাপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল (প্রচলিত নাম-কারেন্ট জাল)-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১৩. ক. প্রথমবার আইন ভংগকারীর শাস্তির পরিমান হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের স্বশম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১০০০/= টাকা পরিমানা।

খ. পরবর্তী প্রতিবার আইন ভংগের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে ১ বৎসর স্বশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ২০০০/= টাকা জরিমানা।

১৪. আইন ভংগকারীকে ক্ষেত্রবিশেষে বিনাওয়ারেন্টে এ্যারেষ্ট করা যাবে।

১৫. আইনের ক্ষমতা প্রয়োগকারী ঃ

ক. সকল ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট;

খ. পুলিশ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কর্মকর্তা;

গ. বন বিভাগের সুন্দরবন বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জারের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কর্মকর্তা;

ঘ. মৎস্য বিভাগের ফিশারী অফিসার (বর্তমানে-থানা মৎস্য কর্মকর্তা) এর পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কর্মকর্তা।

১৬. এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

খ. দি মেরিন ফিশারীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স নং ৩৫, ১৯৮৩) ঃ

☞ সাধারণভাবে ইহা সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩ নামে পরিচিত। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় পরবর্তীতে জারীকৃত বিধানাবলী নিম্নরূপঃ

☞ দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩ (এস আর ও ৩৪৯-এল/৮৩, সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৮৩, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ)।

☞ দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩-এর সংশোধনী, ১৯৯২ (এস আর ও নং ২৭৫-আইন/৯২, ডিসেম্বর ২৮, ১৯৯২, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়)।

এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

০১. এ আইনের উদ্দেশ্যাবলীর যথাযথ প্রয়োগ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়-দায়িত্ব একজন 'পরিচালক' (বর্তমানে -উপ-পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য, চট্টগ্রাম) এর উপর ন্যাস্ত।

০২. প্রতিটি মৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান) এর জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে (ক্ষেত্র বিশেষে ২০০.০০-১৮,০০০.০০ টাকা) বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারী-ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতামূলক (তবে উক্ত বিধি স্থানীয় অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৫ এর পর থেকে কার্যকর হবে)।

০৩. লাইসেন্সধারীর জন্য আহরণকৃত ও বিক্রয়কৃত মৎস্য সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিচালক-এর নিকট সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।

০৪. লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযান-জাহাজ চলাচল পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

০৫. লাইসেন্সধারী কিংবা বিপদগ্রস্ত বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমন নিষিদ্ধ।

০৬. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

০৭. সরকার যে কোন ভেসেল বা ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জল সীমায় বৈজ্ঞানিক গবেষনার জন্য শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার সংরক্ষন করেন।

০৮. অথরাইজড অফিসার মৎস্য নৌযান থামানো, পরীক্ষা করা, অংগনে প্রবেশ করা, ভেসেল বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

০৯. সীজকৃত ভেসেল ও ক্রু-কে নিকটবর্তী বন্দরে নেয়া যাবে।

১০. অধ্যাদেশের ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিনা ওয়ারেন্টে আটককৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী থানায় হস্তান্তর করতে হবে।

১১. পচনশীল দ্রব্যাদি বিক্রয়যোগ্য।

১২. অথরাইজড অফিসার বা তার অনুগামী কর্তৃক অধ্যাদেশের বা তদাধীনে প্রণীত বিধানাবলী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১৩ জালের ফাঁসের আকার হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. চিংড়ি ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে -৪৫ মিলিমিটার;

খ. মাছ ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে -৬০ মিলিমিটার;

গ. বড় ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে -২০০ মিলিমিটার;

ঘ. ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে -১০০ মিলিমিটার;

ঙ. বেহুন্দী জালের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কম পক্ষে- ৩০ মিলিমিটার;

১৪. বাজেয়াপ্তকৃত ভেসেল উহার সমুদয় আনুষাংগিকসহ সরকার কর্তৃক নিস্পত্তিযোগ্য।

১৫. মৎস্য আহরণ এলাকা ঃ

ক. সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দী জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জালদ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ;

খ. সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলারদ্বারা মৎস্য/চিংড়ি আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

১৬. যে সব পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঃ

ক. বিধিবদ্ধ বিনির্দেশ- এর কম ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার;

খ. বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার;

গ. যে কোন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।

১৭. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জল সীমায় মৎস্য আহরনের জন্য প্রয়োজন ঃ

ক. ফিশিং লাইসেন্স;

খ. প্রয়োজনীয় সনদপত্র (যেমন-মৎস্য নৌযানের রেজিষ্ট্রেশন, ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি);

গ. জাতীয়তা প্রদর্শনকারী পতাকা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি চিহ্ন;

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণরত প্রত্যেকের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পরিচয় পত্র।

১৮. চিংড়ি ট্রলারের জন্য ৩০% সাদামাছ আহরণ ও অবতরণ বাধ্যতামূলক।

১৯. মৎস্য অবতরণ ও ট্র্যান্সশিপমেন্টের সময় অথরাইজড অফিসারের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২০. ট্রলারের জন্য প্রতি ট্রিপে গমনের পুর্বে প্রিসেইলিং পারমিশন গ্রহণ বাধ্যতামুলক।

২১. ফ্রিজার ট্রলারের সেইলিং পারমিশন হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের এবং নন-ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য।

২২. সামুদ্রিক মৎস্য সারভেইলেন্স চেক পোষ্ট বা অন্যত্র অবস্থানরত অথরাইজড অফিসারের নির্দেশে সাড়া দেয়া প্রতিটি মৎস্য নৌযানের জন্য বাধ্যতামূলক।

২৩. ক. প্রতিটি ট্রলারে মেরিন ফিশারী একাডেমী থেকে পাশকৃত ৩ জনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক;

খ. প্রতিটি মৎস্য নৌযানে (ট্রলার ব্যতীত) সরকার অনুমোদিত মেরিন ডিজেল স্কুল কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত ১ জনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক।

২৪. উক্ত আইনের বিধানাবলীর লংঘন মৎস্য নৌযান বাজেয়াপ্তকরণসহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গ. দি ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট এক্ট, ১৯৩৯ (বেংগল এক্ট - ১৫, ১৯৩৯) ঃ

সাধারণভাবে ইহা পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ নামে পরিচিত। উক্ত এক্টের আওতায় পরবর্তীতে জারীকৃত বিধানাবলী নিম্নরূপ ঃ

দি ট্যাঙ্কস ইমপ্রুভমেন্ট (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬ (অর্ডিন্যান্স নং ৩, ১৯৮৬)।

এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

০১. যদি কোনভাবে কালেক্টর (বর্তমানে-থানা নির্বাহী অফিসার) -এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন জলাশয় কোন কারনে পতিত রাখা হয়েছে তাহলে উক্ত জলাশয় মালিক কে নোটিশ প্রদান করতঃ উক্ত জলাশয় উন্নয়নের জন্য নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

০২. নির্ধারিত সময়ে জলাশয় উন্নয়ন করা না হলে তাহা কালেক্টর কর্তৃক পতিত হিসেবে ঘোষনাযোগ্য।

০৩. পতিত জলাশয় অধিগ্রহনকরতঃ তাহা উন্নয়ন করা যাবে কিংবা তাহা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি অথবা অন্যকোন আগ্রহী ব্যক্তির নিকট দখল হস্তান্তরকরতঃ উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য।

০৪. আবেদনক্রমে অধিগ্রহণকৃত পতিত জলাশয় জলাশয় মালিক কিংবা অংশীদারকে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরযোগ্য।

০৫. পতিত জলাশয় উন্নয়নের জন্য তৎসন্নিহিত ভূমি অধিগ্রহণযোগ্য।

০৬. অধিগ্রহণকৃত এবং উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরিত পতিত জলাশয়ের উন্নয়ন কার্য যথাসময়ে সম্পন্ন নাহলে হস্তান্তর বাতিলযোগ্য।

০৭. হস্তান্তরিত জলাশয় সর্বোচ্চ ২০ বৎসর মেয়াদে হস্তান্তরযোগ্য।

০৮. সন্নিহিত ভূমি হস্তান্তরের মেয়াদ পতিত জলাশয় হস্তান্তরের মেয়াদের সমান হবে।

০৯. জলাশয় মালিক কে হস্তান্তর গ্রহীতা কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১০. হস্তান্তর গ্রহীতা ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিপূরণদানে বাধ্য থাকবেন।

১১. হস্তান্তর গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত অন্য কেহ সংশ্লিষ্ট জলাশয় ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন না।

১২. হস্তান্তর গ্রহীতা হস্তান্তরের মেয়াদবর্তী সময়ে কালেক্টরের অনুমোদনক্রমে এক্টের উদ্দেশ্য সাধনে অন্য কাউকে লীজ দিতে পারবেন।

১৩. হস্তান্তর গ্রহীতা কোনভাবে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের দখলী স্বত্ব অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না।

১৪. হস্তান্তর গ্রহীতা জলাশয় ও তৎসন্নিহিত ভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে বাধ্য থাকবেন।

১৫. হস্তান্তর মেয়াদ শেষে মূল মালিক সংশ্লিষ্ট জলাশয় ও ভূমির দখল ফেরৎ পাবেন।

১৬. অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির সকল বিরোধ কালেক্টর কর্তৃক নিস্পত্তিযোগ্য।

১৭. হস্তান্তরকালীন সময়ে কোন সিভিল স্যুট প্রযোজ্য হবে না।

১৮. সংশ্লিষ্ট আইন ভংগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঘ. দি ফিশ এন্ড ফিশ পডাক্টস(ইন্সপেকশন এন্ড কোয়ালিটি কন্টোল) অডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অডিন্যান্স নং -২০,১৯৮৩) ঃ

সাধারণভাবে ইহা মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৩ নামে পরিচিত। এ আইনের অধীনে পরবর্তীতে প্রণীত বিধিমালা নিম্নরূপ ঃ

মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯ (এস আর ও ৩৬৭-আইন/৮৯, অক্টোবর ৩১, ১৯৮৯, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়)।

এ আইনের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ ঃ

০১. নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে গৃহীত লাইসেন্স ব্যতীত মাছ প্রক্রিয়াজাত করা যাবে না।

০২. নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে (২৫টি শর্ত) স্বাস্থ্য সম্মত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে।

০৩. নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে (১৭টি শর্ত) প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পরিচালনা করতে হবে।

০৪. মাছ প্রক্রিয়াকরণে এমন কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না যা মাছের গুনগতমান নষ্ট করে।

০৫. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র ব্যতীত কোন মাছ রপ্তানী করা যাবে না।

০৬. প্রক্রিয়াজাত মৎস্য পূর্ণ প্রতিটি পাত্রে নির্ধারিত লেবেল লাগাতে হবে।

০৭. নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে (৭টি শর্ত) মাছ পরিবহনকারী যান ব্যবহার করা যাবে।

০৮. প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়াদি পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনযোগ্য।

০৯. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে মাছের নমুনা সংগ্রহযোগ্য।

১০. লাইসেন্স পঞ্জিকাবর্ষ বা তার অংশবিশেষের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১১. শর্ত ভংগকারীর লাইসেন্স বাতিলযোগ্য ।

১২. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র প্রদানের অযোগ্য মাছ বিনষ্টযোগ্য।

১৩. যুক্তিসংগত কারনে সনদ প্রাপ্ত মাছ পূণঃ পরীক্ষাযোগ্য।

১৪. উক্ত আইন ভংগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৫. এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

ঙ. চিংড়িচাষ অভিকর আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৫৩ নং আইন)ঃ

উক্ত আইনের আওতায় পরবর্তীতে জারীকৃত বিধিমালা নিম্নরুপ ঃ

চিংড়িচাষ অভিকর বিধিমালা, ১৯৯৩ (এস আর ও নং ৪০-আইন/৯৩, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯৩, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়)।

সংশ্লিষ্ট আইনের মূল বিষয়াদি নিম্নরূপ ঃ

০১. সরকার কর্তৃক চিংড়ি চাষ এলাকায় নির্মিত বাঁধ বা খননকৃত খাল বা স্থাপিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবয়বের দরুণ কোন জমি উপকৃত হতে পারে বলিয়া অনুভূত হলে সরকার উক্ত এলাকায় নির্দিষ্ট হারে অভিকর আরোপ করিতে পারেন।

০২. জমির মালিক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত অভিকর পরিশোধযোগ্য।

০৩. ১৫% সুদসহ যাবতীয় বকেয়া পাবলিক ডিমান্ড হিসেবে আদায়যোগ্য।

০৪. পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিকর নির্ধারণযোগ্য।

০৫. নির্ধারিত সময়ে পরিশোধিত অভিকর ১০% হারে রিবেটযোগ্য।

চ. নং -এস আর ও ২৩৫-আইন/৮৯, জুলাই ১, ১৯৮৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ(ইনকাম ট্যাক্স, ১৯৮৪, নং - ৩৬, ১৯৮৪ অনুসরণে) ঃ

সরকার কোন করদাতার মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার এবং উদ্যান পালন প্রকল্প থেকে উদ্ভুত আয়কে উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় প্রদেয় কর হতে ৩০শে জুন, ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্য অব্যাহতি প্রদান করেন।

ছ. নং -শিম/শিনী-৩/চি-২/৯১/৩১, মে ২৬, ১৯৯১, শিল্প মন্ত্রণালয় ঃ

সরকার এখন থেকে "হ্যাচারী ও মৎস্যচাষ" কে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতিপূর্বক "হ্যাচারী ও মৎস্য চাষ" কে বিনিয়োগ তফসীলে "হ্যাচারী ও মৎস্য চাষ" উপ-খাতে অন্তর্ভূক্ত করেন।

বিনিয়োগ বোর্ডের প্রচলিত বিধি প্রয়োজনে এ শিল্প- খাতের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে।

মৎস্য আইন মেনে চলুন

অধিক মৎস্য উৎপাদনে সহায়তা করুন

মৎস্য পক্ষ '৯৫-এর সফলতা
কামনা করি

রকমারী মৎস্য খামার

সাং বগইড়, ডাকঘর- লক্ষীআরা,
থানা- ফেণী সদর., জেলা- ফেণী।

এখানে উন্নতমাণের সকল প্রকার
দেশী-বিদেশী কার্পের রেণু ও পোনা
সুলভে পাওয়া যায়।

মৎস্য পক্ষ '৯৫
সফল হউক

বাংলাদেশ সেন্টার ফর
এডভান্সড ষ্টাডিজ

বাড়ী-৬২০, সড়ক-১০/এ (নতুন), ধানমন্ডি
জিপিও বক্স-৩৯৭১, ঢাকা-১২০৯
দূরালাপনী ঃ ৩১৫৭৯৩, ৩১০৫৩৮, ৮১৫৮২৯
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৮৬৩৩৭৯, ৮৬৩১৭০, ৮১১৩৪৪

মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা পরিচিতি

মোহাম্মদ আলী মিয়া, গবেষণা কর্মকর্তা
মোঃ আমিনুল ইসলাম, তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

১. **মাছ চাষের সহজ নিয়ম**
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ২৮

২. **ধান ক্ষেতে মাছ চাষ**
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ২৪

৩. **মাছ লালন পালন**
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯৪ ইং

৪. **মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কলাকৌশল**
(উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের সংকলন)
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ৮০

৫. **মাছ ও মাছ চাষ**
ডঃ এ. কে. এম. নুরুজ্জামান
১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ৩১৬

৬. **আফ্রিকান মাগুরের চাষ**
আবু সাঈদ, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ৫৬

৭. **মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল**
সোনালী ব্যাংক, ১৯৯৪ ইং

৮. **মাছ চাষ**
মোঃ আমিনুল ইসলাম, ১৯৯৩ ইং
পৃষ্ঠা - ১৬

৯. **মাছ চাষ নির্দেশিকা**
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ৫১

১০. **পুকুর প্রস্তুতি**
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ১৮

১১. **পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ**
মৎস্য গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ১৮

১২. **নাইলোটিকার চাষ**
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
(বিএআরসি), ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ৩১

১৩. **ধান ক্ষেতে মাছের চাষ**
বি.এ.আর.সি. ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ২৭

১৪. **রাজপুটির চাষ**
বিএআরসি, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ২৭

১৫. **ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ**
বিএআরসি, ১৯৯২ ইং
প্রষ্ঠা - ২৭

১৬. **ম্যানুয়েল অন ফিস ফার্ম ম্যানেজম্যান্ট**
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ১৯৯১ ইং
পৃষ্ঠা - ১৫৬

১৭. আধুনিক মাছ চাষ
মোঃ ফজলুল হক, ১৯৯১ ইং
পৃষ্ঠা - ১০৭

১৮. ম্যানুয়েল অন এ্যাকুয়াকালচার টেকনোলজি
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ১৯৯০ ইং

১৯. এ গাইড টু কার্প কালচার ইন বাংলাদেশ
বাংলাদেশ এ্যাকুয়াকালচার এন্ড ফিসারিজ রিসোর্সেস ইউনিট
(বাফরু) - ১৯৮৯ ইং
পৃষ্ঠা - ৭০

২০. পুকুরে মাছ চাষ
আবদুল্লাহ নাহিদ, ১৯৮৯ ইং
পৃষ্ঠা - ১০

২১. **Inland Fisheries Management in Bangladesh**
DOF/BCAS/ICLARM; 1989
Page - 149.

২২. ম্যানুয়েল অন কমপোজিট
কার্প কালচার
এফ আর আই, ১৯৮৮ ইং

২৩. সমুদ্র উপকূলে মৎস্য চাষ
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ১৯৮৮ ইং
পৃষ্ঠা - ১১৬

২৪. ম্যানুয়েল অন ইনটিগ্রেটেড ফিস ফার্মিং
এফ আর আই - ১৯৮৭ ইং

২৫. **Fisheries Resources and opportunities in Freshwater fish culture in Bangladesh**
Dr. Mahmudul Amin, 1987

২৬. ছোট হ্যাচারী
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৮৫ ইং
পৃষ্ঠা - ১৮

২৭. **Fisheries Information Bulletin (Carp)**
Vol - 2 No. 4
Department of Fisheries, 1985
Page - 52

২৮. পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা
মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৮৩
পৃষ্ঠা - ২৪

২৯. নানা দেশে মাছের চাষ
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম
বাংলা একাডেমী - ১৯৮২ ইং
পৃষ্ঠা - ১৭৪

৩০. **An Introduction to Fish Culture in Bangladesh**
Md. Abdul Karim, 1975
Page - 166

৩১. বাওড়ে মাছ ধরা
মৎস্য অধিদপ্তর, ব্রাক, ডানিডা
পৃষ্ঠা - ১০

৩২. বাওড়ে পোনা মজুদ
মৎস্য অধিদপ্তর, ব্রাক, ডানিডা
পৃষ্ঠা - ১২

৩৩. রুই জাতীয় মাছের উন্নত আতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট,
পৃষ্ঠা - ১৬

৩৪. পুকুরে হাঁস ও মাছের একত্র চাষ
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
পৃষ্ঠা - ১৬

৩৫. উন্নত পদ্ধতিতে রুই জাতীয় মাছের হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
পৃষ্ঠা - ১৬

৩৬. সমন্বিত মাছ ও মুরগীর চাষ পদ্ধতি
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
পৃষ্ঠা - ১৬

৩৭. পিটুইটারী গ্লান্ড সংগ্রহের কলাকৌশল
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
পৃষ্ঠা - ১৬

৩৮. নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা ও বর্ষপঞ্জি
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
পৃষ্ঠা - ৩১

৩৯. একের ভিতর দুই (হাঁস ও মাছের একত্র চাষ)
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
পৃষ্ঠা - ৬

৪০. **Cluster of Ideas and Action for Fisheries Development in Bangladesh**
A.K.M. Nuruzzaman, 1993
Page - 416

৪১. আধা - নিবিড় প্রক্রিয়ায় চিংড়ি চাষ
বিসিক, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ৮

৪২. পুণঃ সঞ্চালন পদ্ধতিতে স্বাদু পানির ক্ষুদ্রাকৃতি চিংড়ি হ্যাচারী পরিচালনা নির্দেশিকা
বিওবিপি - ১৯৯৩ ইং
পৃষ্ঠা - ৩৬

৪৩. উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ও রপ্তানীঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা
(প্রবন্ধ সমূহের সংকলন)
এফআরআই, ১৯৯৩ ইং

৪৪. চিংড়ি ঃ বাংলাদেশে চিংড়ি উৎপাদন ও চাষ
ডঃ শাহদত আলী, ১৯৯২ ইং

৪৫. **A guide to Shrimp and Prawn Culture in Bangladesh**
BAFRU - 1990
Page - 41

৪৬. **A Guide to Shrimp and Prawn Hatchery Technique in Bangladesh**
BAFRU - 1990
Page - 41

৪৭. বাগদা চিংড়ি আধুনিক চাষ
খন্দকার সফিকুল ইসলাম, ১৯৮৬ ইং
পৃষ্ঠা - ৮৫

৪৮. **Fisheries Information Bulletin (Shrimp)**
Department of Fisheries, 1985
Vol-2. No. 42
Page - 74

৪৯. চিংড়ি পোনা স্থানান্তর ও নতুন পরিবেশে অভ্যস্থকরণ পদ্ধতি
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ১৫

৫০. গলদা চিংড়ি চাষ
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ১৩

৫১. বাগদা চিংড়ি চাষ
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ১৩

৫২. সংক্ষেপে বাগদা চিংড়ি চাষ
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ১০

৫৩. বাগদা চিংড়ি চাষের প্রাথমিক কলা কৌশল
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ২৬

৫৪. চিংড়ি হ্যাচারী ও খামার ব্যবস্থাপনা
মৎস্য অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা - ১৫৭

৫৫. বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাগদা চিংড়ি
চাষ-খাদ্য নির্দেশিকা
সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিঃ
পৃষ্ঠা - ৮

৫৬. বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ি চাষ
সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিঃ
পৃষ্ঠা - ১৬

৫৭. **Semi Intensive Shrimp Culture**
Technology and Management
SABINGO
PAGE - 32

৫৮. **Fish Catch Statistics of Bangladesh**
Department of Fisheries (1992-93)

৫৯. **Fisheries Information Bulletin (Survey)**
V0l-1 No. 1
Department of Fisheries, 1983
Page - 18

৬০. **Fisheries Information Bulletin (Resources)**
Vol-1, No. 1
Department of Fisheries, 1983
Page - 28

৬১. **Water Area Statistics of Bangladesh**
Department of Fisheries

৬২. বহমান পানির পরিবেশ তত্ত্ব
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ১৯৯৩ ইং
পৃষ্ঠা - ২৩৮

৬৩. মাছের পুকুরের পানি
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ২২৯

৬৪. মৎস্য চাষে পানির গুনাগুণ ও ব্যবস্থাপনা
ডঃ আনোয়ার হোসেন, ১৯৯২ ইং
পৃষ্ঠা - ৭১

৬৫. **Water Quality Management in Aquaculture**
M. Shahidur Rahman, 1992
Page - 84

৬৬. **A Survey of Fish Farm and Water Quality in Bangladesh**
BAFRU - 1990
Page 92

৬৭. **Water Quality Management for Aquaculture and Fisheries**
BAFRU - 1990
Page - 48

৬৮. **Fisheries Information**
Bulletin (Water Quality)
Vol-1 No. 3.
Department of Fisheries, 1983
Page - 32

৬৯. **Baor Biology**
Department of Fisheries
Pages - 8

৭০. **Baor Dewatering**
Department of Fisheries
Pages - 14

৭১. **Economically Important**
Marine Fishes and Shell Fishes of Bangladesh.
A.K. Ataur Rahman and others.
1995
Page - 33

৭২. বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ
ডঃ মিয়া মুহম্মদ আবদুল কুদ্দুস
ও
ডঃ মোহাম্মদ শফি, ১৯৮৩, ইং
পৃষ্ঠা - ৪৭৬

৭৩. **Freshwater Fisheries of Bangladesh**
A.K. Ataur Rahman
Zoological Society of Bangladesh.
1989
Pages - 364

৭৪. মৎস্য বিদ্যা
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ১৯৮৭ ইং
পৃষ্ঠা - ১৭৪

৭৫. বাংলাদেশে মাছের ক্ষতরোগ
এফ আর আই
পৃষ্ঠা - ১৬

৭৬. পরজীবি বিদ্যা
ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ১৯৮৮ ইং
পৃষ্ঠা - ২৪০

৭৭. **Fisheries Information Bulletin(Frog)**
Vol - 2 No. 5
Department of Fisheries, 1985
Page - 25

৭৮. **Fisheries Information Bulletin(Frog)**
Vol - 1 No. 4
Department of Fisheries, 1983
Page - 32

৭৯. **Fisheries Information Bulletin(turtle)**
Vol - 2 No. 1
Department of Fisheries, 1984
Page - 52

৮০. ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা
এফ আর আই, ১৩৯৮ বাংলা
পৃষ্ঠা - ১৭

৮১. মৎস্য আইন
এ. আর. মাছউদ, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ৩১৪

৮২. বাংলাদেশে রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদ
অতুল কুমার পাল, ১৯৯৪ ইং
পৃষ্ঠা - ২২২

৮৩. **Women in Small-Scale** Fisheries in Bangladesh.
Mrs. Ferdous Parvin, 1979
Page - 17

মাছ আমাদের জাতীয় সম্পদ।
এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ আমাদের
নৈতিক দায়িত্ব

মৎস্য পক্ষ '৯৪

এর আমারও গর্বিত অংশীদার

মেসার্স সোহাগ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার
(ভাইয়া গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)
দৌলতগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব পার্শ্বে
লাকসাম, কুমিল্লা।

এখানে উন্নতমানের দেশী-বিদেশী জাতের পোনা সুলভে পাওয়া যায়।

মৎস্য পক্ষ '৯৫ উদ্‌যাপনে
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ
২৮/এ, নয়াপল্টন (৪র্থ তলা)
পূবালী ব্যাংক ভবন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ১৩১৬৭, ৪০১৩১৭

একনজরে বাংলাদেশের মৎস্যসেক্টর

মোঃ মাহমুদুল হক
সহকারী প্রধান,
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ভূমিকা ঃ

১৯০৮ সনে মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৬৪ সনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ১৯৮৪ সনে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড-অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ -উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত।

মৎস্য বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় -এ মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে আসছে। তদুপরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান ইনষ্টিট্যুট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুরস্থ ইপসা থেকেও মৎস্য বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে।

তা'ছাড়াও বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এফ এ ও, ইউ এন ডি পি, ইউ এস এ আই ডি, নাকা, ইকলার্ম, ডেনিডা, ব্রাক, সিডা, কেয়ার, প্রশিকা, আর ডি আর এস, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কার্যাবলী ঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্যাবলী হ'ল দেশের মৎস্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা মিটানো, মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যসামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করা। বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও বিপনন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সমবায় গঠনে মৎস্যজীবিগণকে উৎসাহিতকরণ, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট-এর উদ্দেশ্যে হল মৎস্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন, প্রযুক্তিগত নিরীক্ষণ ও প্রমিতকরণ এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মানোন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন। ৬টি অংগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট উহার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

জল সম্পদ/উৎপাদন ঃ

বাংলাদেশের জলসম্পদ এবং উৎপাদন বিষয়ক তথ্যাদি নিম্নবর্ণিত ছকে প্রদান করা হলো ঃ

উৎস্য	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)		
		১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪ (প্রজেক্টেড)	১৯৯৪-৯৫ (প্রজেক্টেড)
ক. অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ ঃ				
১. মুক্ত জলাশয় ঃ				
নদী ও খাড়ি অঞ্চল (সুন্দরবন সহ)	১০,৩১,৫৬৩	১.৪৬	১.৩৭	১.৪৩
বিল	১,১৪,১৬১	০.৫৩	০.৫৭	০.৬২
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,৮০০	০.০৪	০.০৫	০.০৫
প্লাবণভূমি	২৮,৩২,৭৯২	৩.২৯	৩.৫৩	৩.৬৬
মোট (মুক্ত জলাশয়) ঃ	**৪০,৪৭,৩১৬**	**৫.৩২**	**৫.৫২**	**৫.৭৬**
২. বদ্ধ জলাশয় ঃ				
পুকুর (১২,৮৮,২২২টি)	১,৪৬,৮৯০	২.০২	২.৩১	২.৮৫
বাওড় (মরা নদীর অংশ)	৫,৪৮৮	০.০২	০.০২	০.০৪
উপকূলীয় চিংড়ি খামার	১,৪০,০০০	০.৩৪	০.৪২	০.৫৭
মোট (বদ্ধ জলাশয়) ঃ	**২,৯২,৩৭৮**	**২.৩৮**	**২.৭৫**	**৩.৪৬**
মোট (অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ) ঃ	**৪৩,৩৯,৬৯৪**	**৭.৭০**	**৮.২৭**	**৯.২২**
খ. সামুদ্রিক জলসম্পদ ঃ				
১. ট্রলিং শিল্প		০.১২	০.১৫	০.১৮
২. আর্টিস্যানাল ফিশারীজ		২.৩৮	২.৪৫	২.৬০
মোট (সামুদ্রিক জলসম্পদ) ঃ	**১,৬৬,০৭,০০০**	**২.৫০**	**২.৬০**	**২.৭৮**
সর্বমোট ঃ	**২,০৯,৪৬,৬৯৪**	**১০.২০**	**১০.৮৭**	**১২.০০**

৪. **স্থাপনা / অবকাঠামো ঃ**

মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিভাগীয়, জেলা ও থানা (থাঞ্চি, রামু, বরকল ও বিলাইছড়ি থানা ব্যতীত) পর্যায়ে দপ্তর রয়েছে। তাছাড়াও প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান এবং পোনামাছ সহজলভ্য করার জন্য সারাদেশে ৮৮ টি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১০টি গ্রামীণ মৎস্য খামার, ১৬টি মিনি হ্যাচারী, ৩টি চিংড়ি হ্যাচারী, ২টি ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারী, ৪টি চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার এবং ৩টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার রয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় ফিশ হারবার, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফিশমিল প্ল্যান্ট, মান নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যসামগ্রী উন্নয়ন কেন্দ্র, মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র, জাল কারখানা, মেরিন ফিশারীজ একাডেমী রয়েছে।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট -এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ময়মনসিংহের স্বাদুপানি কেন্দ্র, চাঁদপুরে নদী কেন্দ্র, সাতক্ষীরায় লোনাপানি কেন্দ্র এবং কক্সবাজারে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। তা'ছাড়াও রাংগামাটি ও সান্তাহারে ২টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে।

এছাড়াও, বেসকারী পর্যায়ে ২৫৬টি কার্প হ্যাচারী, ২০টি চিংড়ি হ্যাচারী (তন্মধ্যে ১২টি নির্মাণাধীন) ও ১১৪টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে।

৫. **উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঃ**

১৯৯৫-৯৬ সনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

প্রতিষ্ঠান	প্রকল্প সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
ক. মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩	৮৮৭.০০
খ. মৎস্য অধিদপ্তর	১৬	১০,৫৫৮.৯২
গ. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১	৫০.০০
ঘ. মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট	১	১০০.০০
ঙ. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১	৩৯০.০০
মোট ঃ	২২	১১,৯৮৫.৯২

৬. **রপ্তানী ও আয় ঃ**

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যসামগ্রী রপ্তানী ও আয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পরিমাণ = মেট্রিক টন
মূল্য = কোটি টাকা

রপ্তানী সামগ্রী	বৎসর					
	১৯৯৩-৯৪		১৯৯৩-৯৪ (জুলাই - এপ্রিল)		১৯৯৪-৯৫ (জুলাই - এপ্রিল)	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১. হিমায়িত চিংড়ি	২২,০৫৪	৭৮৭.৭৩	১৮,১৩৫	৬২৬.৭৭	২২,৫৮৫	৮৯২.৮১
২. হিমায়িত মাছ	৩,১২৫	৫১.১৮	২,৭৪০	৪৬.৫৯	৮,৫১৪	১৬৩.৪৪
৩. শুটকী	২,৪৭৩	৪১.৮৩	২,২১৩	৪০.৪৩	৫১৪	৮.২৫
৪. লবণাক্ত মাছ	৫০	১.০৬	৫০	১.০৬	৫৯৬	১৪.১৪
৫. হাংগরের পাখনা, পোটকা	৪৫	২.৭৯	৩৬	২.৪৮	১৭৩	১৩.৫৩
৬. কচ্ছপ/কাছিম/ কাঁকড়া	৪,০৮৮	৩৬.৩৭	৩,৫৭২	৩২.১৩	৩,৯০১	৩৩.০৯
মোট	৩১,৮৩৫	৯২০.৯৬	২৬,৭৪৬	৭৪৯.৪৬	৩৬,২৮৩	১,১২৫.২৬
জাতীয় মোট রপ্তানী আয়ের		৯.১২%		৮.৭৪%		৯.৬৩%

৭. **মৎস্য সেক্টরের অবদান ঃ**

১৯৯২-৯৩ সনে বাংলাদেশে মৎস্য ক্ষেত্রের অবদান ছিল - জিডিপি'তে ৪.২% (=৪০,১২৭ মিলিয়ন টাকা), কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত মোট মূল্যের ১৩.৭৭%, জাতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের ৭.৫৭% এবং জিডিপি'তে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৫০% (যা ১৯৯১-৯২ সনে ছিল ৩%)।

মৎস্য সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং পোনা প্রাপ্তি স্থান

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫

ক. মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ঃ

০১. মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

রাজশাহী	ঠাকুরগাঁও	সদর	০১	সদর মৎস্য খামার
	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	০২	বীরগঞ্জ মৎস্য খামার
		পার্বতীপুর	০৩	পার্বতীপুর মৎস্য খামার
		বিরামপুর	০৪	চরকাই মৎস্য খামার
	কুড়িগ্রাম	সদর	০৫	সদর মৎস্য খামার
	রংপুর	মিঠাপুকুর	০৬	সটিবাড়ী মৎস্য খামার
	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	০৭	পাঁচবিবি মৎস্য খামার
		ক্ষেতলাল	০৮	ক্ষেতলাল মৎস্য খামার
	বগুড়া	সদর	০৯	মালতিনগর মৎস্য খামার
		শেরপুর	১০	শেরপুর মৎস্য খামার
	নওগাঁ	সদর	১১	সদর মৎস্য খামার
	নবাবগঞ্জ	নাচোল	১২	নাচোল মৎস্য খামার
		সদর	১৩	আমনুরা মৎস্য খামার
	রাজশাহী	পবা	১৪	রাজশাহী মৎস্য খামার
		পুঠিয়া	১৫	পুঠিয়া মৎস্য খামার
	নাটোর	সদর	১৬	সদর মৎস্য খামার
		বড়াইগ্রাম	১৭	বড়াইগ্রাম মৎস্য খামার
		বড়াইগ্রাম	১৮	কারবালা জিওল মৎস্য খামার
	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	১৯	উল্লাপাড়া মৎস্য হ্যাচারী
	পাবনা	ঈশ্বরদী	২০	ঈশ্বরদী মৎস্য খামার
		সাঁথিয়া	২১	সাঁথিয়া মৎস্য খামার
খুলনা	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	২২	ভেড়ামারা মৎস্য খামার
		মিরপুর	২৩	পোড়াদহ মৎস্য খামার
		কুমারখালী	২৪	কুমারখালী জিওল মৎস্য খামার
		সদর	২৫	সদর মৎস্য খামার
	মেহেরপুর	সদর	২৬	সদর মৎস্য খামার

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫
	চুয়াডাংগা	সদর	২৭	সদর মৎস্য খামার
		জীবন নগর	২৮	জীবন নগর মৎস্য খামার
	ঝিনাইদহ	সদর	২৯	সদর মৎস্য খামার
		কোট চাঁদপুর	৩০	কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স
	মাগুড়া	সদর	৩১	সদর মৎস্য খামার
	যশোর	শার্শা	৩২	বাগআঁচড়া মৎস্য খামার
		ঝিকরগাছা	৩৩	ঝিকরগাছা মৎস্য খামার
		সদর	৩৪	সদর মৎস্য খামার
	নড়াইল	সদর	৩৫	সদর মৎস্য খামার
	সাতক্ষীরা	সদর	৩৬	সদর মৎম্য খামার
		দেবহাটা	৩৭	সখিপুর মৎস্য খামার
	খুলনা	সদর	৩৮	সদর মৎস্য খামার
		ডুমুরিয়া	৩৯	ডুমুরিয়া মৎস্য খামার
	বাগেরহাট	সদর	৪০	সদর মৎস্য খামার
বরিশাল	পিরোজপুর	সদর	৪১	সদর মৎস্য খামার
	ঝালকাঠি	সদর	৪২	সদর মৎস্য খামার
	বরিশাল	উজিরপুর	৪৩	বামরাইল মৎস্য খামার
		সদর	৪৪	সদর মৎস্য খামার (কাশিপুর)
	ভোলা	সদর	৪৫	সদর মৎস্য খামার
ঢাকা	জামালপুর	সদর	৪৬	সদর মৎস্য খামার
	নেত্রকোনা	দূর্গাপুর	৪৭	দূর্গাপুর মৎস্য খামার
		সদর	৪৮	সদর মৎস্য খামার
	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৪৯	কাজিয়াকান্দা মৎস্য খামার
		সদর	৫০	মাসকান্দা মৎস্য খামার
		সদর	৫১	শম্ভুগঞ্জ মৎস্য খামার
		গৌরীপুর	৫২	কৃষ্ণপ্রসাদপুর মৎস্য খামার
		ঈশ্বরগঞ্জ	৫৩	ঈশ্বরগঞ্জ মৎস্য খামার
		নান্দাইল	৫৪	নান্দাইল মৎস্য খামার
		ত্রিশাল	৫৫	ত্রিশাল মৎস্য খামার
	কিশোরগঞ্জ	সদর	৫৬	সদর মৎস্য খামার
	গাজীপুর	সদর	৫৭	টংগী মৎস্য খামার

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫
	নরসিংদি	সদর	৫৮	বাগহাটা মৎস্য খামার
	ঢাকা	ঢাকা মহানগরী	৫৯	গুলশান হ্যাচারী
	রাজবাড়ী	সদর	৬০	সদর মৎস্য খামার
		বালিয়াকান্দী	৬১	বালিয়াকান্দী মৎস্য খামার
	ফরিদপুর	সদর	৬২	সদর মৎস্য খামার
		সদর	৬৩	ফরিদপুর মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র
	মাদারীপুর	সদর	৬৪	সদর মৎস্য খামার
	গোপালগঞ্জ	সদর	৬৫	সদর মৎস্য খামার
সিলেট	সিলেট	সদর	৬৬	জেলা নার্সারী
		সদর	৬৭	খাদিমনগর মৎস্য খামার
		গোলাপগঞ্জ	৬৮	গোলাপগঞ্জ মৎস্য খামার
	মৌলভীবাজার	সদর	৬৯	সদর মৎস্য খামার
	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	৭০	শায়েস্তাগঞ্জ মৎস্য খামার
চট্টগ্রাম	বি. বাড়িয়া	সদর	৭১	রামরাইল মৎস্য খামার
		কসবা	৭২	লেসিয়ারা জিওল মৎস্য খামার
	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	৭৩	দেবীদ্বার মৎস্য খামার
		বুড়িচং	৭৪	বুড়িচং মৎস্য খামার
		চান্দিনা	৭৫	চান্দিনা মৎস্য খামার
		সদর	৭৬	জাংগালিয়া মৎস্য খামার
		চৌদ্দগ্রাম	৭৭	চৌদ্দগ্রাম মৎস্য খামার
		লাকসাম	৭৮	লাকসাম মৎস্য খামার
	চাঁদপুর	কচুয়া	৭৯	কচুয়া মৎস্য খামার
	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৮০	রায়পুর মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
		সদর	৮১	মান্দারী মৎস্য খামার
	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	৮২	চৌমুহনী মৎস্য খামার
	ফেনী	ফুলগাজী	৮৩	মৎস্যপোনা উৎপাদন খামার
		ছাগলনাইয়া	৮৪	ছাগলনাইয়া মৎস্য খামার
		সদর	৮৫	সদর মৎস্য খামার
		সোনাগাজী	৮৬	মৎস্যপোনা উৎপাদন খামার
	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৮৭	পটিয়া মৎস্য খামার

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫

০২. মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (খামার বিহীণ) ঃ

	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	০১	মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০৩. গ্রামীণ মৎস্য খামার ঃ

রাজশাহী	নওগাঁ	পত্নীতলা	০১	পত্নীতলা গ্রামীণ মৎস্য খামার
		ধামুইরহাট	০২	ধামুইরহাট গ্রামীণ মৎস্য খামার
	বগুড়া	কাহালু	০৩	কাহালু গ্রামীণ মৎস্য খামার
		কাহালু	০৪	গাবতলী গ্রামীণ মৎস্য খামার
খুলনা	মেহেরপুর	গাংনী	০৫	গাংনী গ্রামীণ মৎস্য খামার
	মাগুড়া	শ্রীপুর	০৬	শ্রীপুর গ্রামীণ মৎস্য খামার
	সাতক্ষীরা	তালা	০৭	তালা গ্রামীণ মৎস্য খামার
ঢাকা	টাংগাইল	কালিহাতি	০৮	কালিহাতি গ্রামীণ মৎস্য খামার
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	হোমনা	০৯	হোমনা গ্রামীণ মৎস্য খামার
	ফেনী	পরশুরাম	১০	ফুলগাজী গ্রামীণ মৎস্য খামার

০৪. মিনি হ্যাচারী ঃ

রাজশাহী	পঞ্চগড়	বোদা	০১	বোদা হ্যাচারী
	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	০২	নাগেশ্বরী হ্যাচারী
	রংপুর	বদরগঞ্জ	০৩	বদরগঞ্জ হ্যাচারী
	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	০৪	কাজিপুর হ্যাচারী
	পাবনা	ফরিদপুর	০৫	ফরিদপুর হ্যাচারী
খুলনা	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	০৬	শৈলকুপা হ্যাচারী
বরিশাল	বরগুনা	আমতলী	০৭	আমতলী হ্যাচারী
	ভোলা	চরফ্যাশন	০৮	চরফ্যাশন হ্যাচারী
ঢাকা	শেরপুর	শ্রীবর্দি	০৯	শ্রীবর্দি হ্যাচারী
	গাজীপুর	শ্রীপুর	১০	শ্রীপুর হ্যাচারী
	নরসিংদী	মনোহরদী	১১	মনোহরদী হ্যাচারী
	রাজবাড়ী	পাংশা	১২	পাংশা হ্যাচারী
	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	১৩	সিরাজদিখান কার্প হ্যাচারী
সিলেট	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	১৪	কুলাউড়া হ্যাচারী
চট্টগ্রাম	বি. বাড়িয়া	নাসিরনগর	১৫	নাসিরনগর হ্যাচারী

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫
	চাঁদপুর	মতলব	১৬	মতলব হ্যাচারী
০৫. চিংড়ি হ্যাচারী ঃ				
খুলনা	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	০১	কালীগঞ্জ চিংড়ি হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	সদর	০২	কক্সবাজার চিংড়ি হ্যাচারী (আইডিএ)
		সদর	০৩	কক্সবাজার চিংড়ি হ্যাচারী (এডিবি)
০৬. ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারী ঃ				
ঢাকা	ময়মনসিংহ	সদর	০১	মাসকান্দা ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারী
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	০২	পটিয়া ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারী
০৭. চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার ঃ				
খুলনা	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	০১	কালীগঞ্জ চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার
বরিশাল	ভোলা	চরফ্যাশন	০২	চরফ্যাশন চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	চকোরিয়া	০৩	রামপুরা চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার
		টেকনাফ	০৪	টেকনাফ চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের অধীন ঃ				
ঢাকা	ময়মনসিংহ	সদর	০১	স্বাদুপানি কেন্দ্র
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	সদর	০২	নদী কেন্দ্র।
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা	০৩	লোনা পানি কেন্দ্র।
রাজশাহী	বগুড়া	আদমদিঘী	০৪	মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার।

সংকলনে ঃ মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান, সৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

মাছ চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রাপ্তিস্থান

	প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	উপকরণাদীর নাম
১।	বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ ২৮/এ, নয়াপল্টন (৪র্থ তলা) পূবালী ব্যাংক ভবন, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৪১৩১৬৭	পিজি. এইচ. সি জি. সুমাছ আটিমিয়া, রোটেনন
২।	(ক) হাবিবুর রহমান খাঁন খাঁন সন্স গ্রুপ সেনা কল্যাণ ভবন (১১ তলা) ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৩২৩৩৭, ২৩২৩৬৮	রোটেনন, আর্টিমিয়া
	(খ) খাঁন ফিস ব্রিডিং এ্যান্ড রিসার্চ ইউ-১২,নূরজাহান রোড (৬ষ্ঠ তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	ফসটক্সিন টেবলেট, রোটেনন, আর্টিমিয়া
৩।	ফনিক্স পোলট্রি লিঃ ১৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০	ফসটক্সিন টেবলেট
৪।	সেতু মার্কেটিং কর্পোরেশন ৬/সি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪৩৯৩৪, ২৪০৩৭৬	রোটেনন, সুমিথিয়ন, ডিপটারেক্স
৫।	সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিঃ ২১১, আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা ফোন ঃ ৮৩৪৫১০, ৮৩৪৫২৬	মাছ ও চিংড়ির তৈরী খাদ্য, টি সিড কেক।
৬।	প্রগতি ফিস লিমিটেড কে. ডি. এ এ্যাভিনিউ, খুলনা ফোন ঃ ২২৩৬৭	ফিসমিল, ফিস পিলেট মাছ/চিংড়ির খাদ্য, রোটেনন টি সীড্ কেক

প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	উপকরণাদীর নাম
৭। হালিম ফাউন্ডেশন ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০	মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি
৮। আবদুর রশিদ মিয়া চামড়ার মোর. চাচড়া, যশোহর।	পিজি, এইচ সিজি, ফসট্কসিন
৯। পুল্যাংক এগ্রোডেভ বাংলাদেশ লিঃ ২৯, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৮৬২২৩১-২	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স
১০। ক্রিসেন্ট গ্রুপ অফ কোম্পানীজ ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪৫৪৭৬, ২৪২৯৬৯ (অ) ৮৩২২৩৬ (বা)	এয়ারেটর
১১। বাংলাদেশ এগ্রো-লাইভষ্টক ফাউন্ডেশন ৯, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, হোটেল ডন প্লাজা (৪র্থ তলা), ঢাকা ফোন ঃ ২৩৭৩৯৩	ফিসমিল (মাইক্রো ফার্টিলাইজার)
১২। ইতালী এগ্রিকালচার মেডিসিন ২১১/১ আলী মার্কেট, কুড়িল, চৌরাস্তা, বিশ্ব রোড ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২১২ ফোন ঃ ৬১০৮৮০	মোল্ট-৭, এম এইচ-১০ (জৈব রাসায়নিক সার)
১৩। এগ্রোসার্ভ রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৩য় তলা) ১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ফোন ঃ ২৫০০৭৫, ২৫৭৭৯২	মোল্ট-৭, এম এইচ-১০ (জৈব রাসায়নিক সার)

প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	উপকরণাদীর নাম
১৪। টেকনোকমার্স ৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, জিপিও বক্স নং-২৭৪৬, ঢাকা-১০০০	হ্যাচারী যন্ত্রপাতি
১৫। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ২৪-২৫ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০।	ফিসমিল, জাল
১৬। মেসার্স হক এন্ড কোং এ-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী, নরসিংদী	মাছের খাদ্য
১৭। এ, ইন্ট্রাকো (বাংলাদেশ) লিঃ ১১৪ মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং (২য় তলা) ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৫৭৭৯২	মোল্ট-৭, এম এইচ-১০
১৮। কাজী মহিউদ্দিন ১২/৬, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭	পিজি, এইচ সিজি, সুমাছ, ফসটকসিন, কুইকফস, রোটেনন, পলিথিন ব্যাগ, আর্টিমিয়া
১৯। বানসিয়া ট্রেডিং কোং ১৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৩১৯১৮৬, ৮৬১৬৬২	এয়ারেটর
২০। ফিস কালচার এ্যান্ড পলট্রি ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস। কক্ষ নং ৩৭/ডি (৭ম তলা), ইষ্টার্ণ প্লাজা, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা।	মাছ ও হাঁস-মুরগী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	উপকরণাদীর নাম
২১। আন্তরিক ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন কক্ষ নং ৯, সায়েদা কোর্ট (২য় তলা), ২৮, আগ্রাবাদ বা/এ, জিপিও বক্স নং- ১৩১১ চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন ঃ (০৩১) ২২৫১৭৭	এয়ারেটর
২২। (ক) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র আই/১, গ, মীরপুর-২, ঢাকা ফোন ঃ ৮০৩৩৯৮, ৮০৫৮১২	গলদা চিংড়ির পোনা

মৎস্য পক্ষ "৯৫ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি

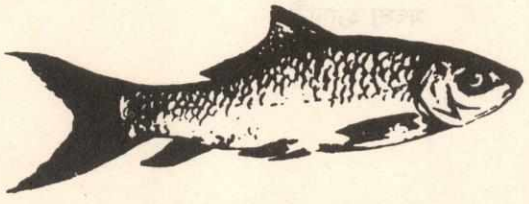

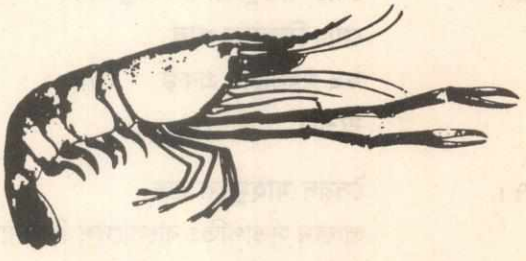

সেমকো

৬/সি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ২৪৩৯৩৪, ২৪০৩৭৬, ২৪১৬৪৫

মাছ ও চিংড়ি চাষে ঃ

❑ রটেনন ❑ এফ-অরগান ❑ কেল্প মিল ❑ সেকুফন ৮০ এসপি
❑ আর্টিমিয়া ব্যবহার করুন।

মৎস্য পক্ষ '৯৫ পুরস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র
১	**মোঃ নাজিম উদ্দিন** এ্যাকোয়াকালচার ফার্মস লিঃ কক্সবাজার	আধা নিবিড় চিংড়ি খামার
২	**নিজামুদ্দিন মাহমুদ সেলিম** পাইওনিয়ার হ্যাচারী লিঃ কক্সবাজার	চিংড়ি হ্যাচারী
৩।	**জাফর আহমেদ** এপেক্স ফুডস্ লিঃ চট্টগ্রাম	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানী
৪।	**মেজর(অবঃ) মোঃ আখতারুজ্জামান** গাচিহাটা এ্যাকোয়াকালচার ফার্মস লিঃ কিশোরগঞ্জ	সমন্বিত মৎস্য খামার
৫।	**মোঃ মফিজ উদ্দিন সরদার** পিতাঃ মরহুম আরজ উল্লাহ সরদার নাটোর	গ্রামীণ পুকুরে মৎস্যচাষ
৬।	**মোঃ সাইফুজ্জামান মজু এবং** **মোঃ ফিরোজ খান** শুভ্র মৎস্যচাষ প্রকল্প যশোর	মৎস্য হ্যাচারী
৭।	**সৈয়দ মাহমুদুল হক** প্রাক্তন সভাপতিঃ বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী কারক সমিতি	চিংড়িচাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীক্ষেত্রে সংগঠক
৮।	**শাইখ সিরাজ** উপস্থাপক ঃ মাটি ও মানুষ বাংলাদেশ টেলিভিশন	মৎস্যচাষ ও উপস্থাপনায় টেলিভিশনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান
৯।	**সৌদি বংলাদেশ শিল্প ও কৃষি** **বিনিয়োগ কোম্পানী লিঃ** (সাবিনকো)	মৎস্য শিল্পে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

ক. ঢাকা ঃ

ক্রমিক নং / কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পিএবিএক্স	সরাসরি	
১	২	৩	৪	৫

ক. ১. মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (পি এবি এক্স) (২৩৫১১১-৩৯) ঃ

০১.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-নোমান মাননীয় মন্ত্রী	২৭৫২	৮৬২৪৩০ ৪১৬১৩১ (পিএ)	৮৩৩৭৪৪
০২.	জনাব এ. এইচ. মোফাজ্জল করিম সচিব	২৭২৮	৮৩৪৬৯৯	৮৩২৭২৬
০৩.	জনাব ম. বদরে আলম খান যুগ্ম-সচিব	২৯৪৯	৮৩৪৫৪৯	৮৩১৪৬৯
০৪	জনাব লোকমান আহমেদ যুগ্ম-প্রধান	২৪৭১	৮৩১৫০৭	৩২৫৩৭১
০৫.	জনাব মোঃ মোশাররফ উল্লাহ উপ-সচিব	২০৭৫	৮৬৯৫৬৫	৮৩৯৬৫৩
০৬.	জনাব এম. এ. ওয়াহাব উপ-সচিব (সামুদ্রিক)	২৩৪৬	৮৬৯৫৬৪	৪০৬১৩৬
০৭.	বেগম মনোয়ারা বেগম উপ-প্রধান	২০৬২	২৪১৩০৩	৪০৯৮৭৩

ক. ২. পরিকল্পনা কমিশন ঃ

০১.	জনাব এম. এ. ছাত্তার যুগ্ম-প্রধান	-	৮১৪৭৩১	-
০২.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন উপ-প্রধান	-	৩১৪৬৫৭	-

ক. ৩. মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, পার্ক এভিন্যু, রমনা, ঢাকা - ১০০০ (পি এবি এক্সঃ) (২৪৫০২১-২৩ এবং ২৪৬১০৩-০৪) ঃ

ক্রমিক নং / কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পিএবিএক্স	সরাসরি	
১	২	৩	৪	৫
১০৪.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, মহাপরিচালক	০১	৮৬৫৪৫৬	৩১৫৯১১
১০৫.	মহাপরিচালক মহোদয়ের পি. এ.	০০৮	-	-
১০৭.	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক (সামুদ্রিক)	০২	২৪১৩৫৫, ২৪১৭১৫	৫০৯০০২
১০৮.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পি. এস. ও	০৫	২৪১৪৩৭	৩৮১৪৪৩
১০৩.	জনাব এফ. করিম (ইন্টারকম)	০০২	৮৬৫৪৫৬	-
১১১.	জনাব মনতোষ চন্দ্র চক্রবর্তী, সহকারী প্রধান	০৪	-	-
-	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬	-	-
-	প্রধান সহকারী, প্রশাসন-১	০৭	-	-
-	কমন সার্ভিস	-	২৮১৫৮৭	-
৩০৪.	জনাব এস. এন. চৌধুরী, উপ-পরিচালক	-	২৪১৫৯২	-
৩০৬. (অনুঃ)	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান	০০৪	-	৩২৩২৯০
৩০৯.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০০৫	-	-
৩১০.	জনাব মোঃ মমতাজ হোসেন মিয়া, উপ-পরিচালক	০৯	২৪৭২১৯	৩২৫২৩৫
৩১২. (অনুঃ)	বেগম আখতার জাহান চৌধুরী, গবেষনা কর্মমর্তা	০০৯	-	৫০৪১০৩
৩১৬.	জনাব মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ	০৮	-	-
৩১৯.	বেগম হোসনে আরা, সহকারী পরিচালক	০০৬	-	৮৮৪৯৭৮
৩২২.	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, সহকারী পরিচালক	৩	-	-
৪০২	বেগম মমতাজ বেগম, উপ-প্রধান	০৩	-	-
৪১০.	জনাব মোঃ মোজাহার আলী, উপ-পরিচালক	০০৩	২৪৭২১৭	-
৪২২.	জনাব এম. এ. মতিন, পি এস ও	-	২৩৪৯৯২	-
৫০৬.	জনাব মোঃ গোলাম রসুল, উপ-পরিচালক	-	২৩০৮২২	-
৫১০.	জনাব ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক	-	২৮১৬৪০, ২৫২৯৭২	৮১০৭৭১
৫১২.	এস. টি. এ. কো-অর্ডিনেটর, ৩য় মৎস্য প্রকল্প	-	২৪৯৯৫৩	-

ক্রমিক নং / কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পিএবিএক্স	সরাসরি	
১	২	৩	৪	৫
৫১৬.	জনাব এস. এ. মাজহারুল ইসলাম, উর্ধতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	-	২৮১৬২৭	-
৬০২.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	৪	২৪০৬৫৩	৪১৬২৮৫
৬০৩.	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	০০১	২৪৯৯৩৪	৩১৫৯১১
৬০৪.	জনাব রাখাল চন্দ্র কংশ বণিক, এস.এস.ও.	-	২৫৫৯০৩	-
৬১১.	জনাব কেইথ ফিশার (৩য় মৎস্য প্রকল্প, এম টি এ লিডার)	-	২৪৯৯৪৩	৮৮৪৬৬১
৬১২.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (প্রকিউরমেন্ট এডভাইজার)	-	২৪৯৯৪৫	৮৮৪৬৬১
৬১৩.	বেগম ফিরুজা বেগম, সহকারী পরিচালক	-	২৮১৬২৪	৮৮১৪৩২ (অনুঃ)
৭০৩.	জনাব ডেভিড কে. রিসাইড (টিম লিডার, এসএডিপি)	৬	-	-
৭০৪.	জনাব একেএম ইয়াহিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী	-	২৪৭২১৮	৮৩৫৭২৯
৭০৯.	জনাব এজেএম বদরুল আলম, সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা	-	২৫৪৮০১	
৭১৩.	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক	০০৭	২৪৭২১৬	৫০০৩২৫
৭১৮.	জনাব রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, উপ-পরিচালক	৮	-	-
৮০৩.	জনাব ডঃ মাহমুদুল করিম (এসএডিপি)	৯	-	৮৯২৮০১
৮১০.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক	৫	২৫৪৮১৪	-
৮২০.	জনাব অর্জুন চন্দ্র চন্দ, সহকারী পরিচালক	-	২৪৭২২০	৫০৪৮০৮
৮২৪.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা	-	০৪৭২১৯	-
-	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	-	২৮১২০১	-
-	জনাব কে ইউ এম শহিদুর রহমান, উপ-পরিচালক (মৎস্য)	-	২৫২২৮৬	-
-	জনাব এম এ কাফী, নির্বাহী প্রকৌশলী	-	২৫৫৯১০	৩১০৪৭৫
-	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা	-	২৫৫৯৭৫	-
১০০৪.	প্রকল্প পরিচালক (সমন্বিত মৎস্য)	-	২৪৯৩২০	-
১০০৫.	জনাব মোঃ শহিদুল আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	২৩৮৮৮৩	৪০৬৫৩০
১১০৭.	জনাব মোঃ বজলুর রহমান, উপ-পরিচালক	৭	-	-
-	উপ-পরিচালক, গুলশান হ্রদ	-	৬০০৩১৯	-
-	প্রকল্প কর্মকর্তা, ধানমণ্ডি হ্রদ	-	৩১৮৩৭৪	-
-	বাফরো, গুলশান	-	৮৮২৫৯৮	-

ক্রমিক নং / কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পিএবিএক্স	সরাসরি	
১	২	৩	৪	৫
-	এফ. আর. আই. রেষ্ট হাউজ, ঢাকা	-	৩২৬৭৮০	-
ক. ৪.	**বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ঃ**			
০১.	চেয়ারম্যান	-	৮৬০৬১৭, ২৫৯১৮৭	-
ক. ৫.	**বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ঃ**		৮৬৩৭২৪	
০১.	ডঃ এ. কে. এম নুরুজ্জামান, সদস্য-পরিচালক (মৎস্য)	-	৩১৩৪৫৭	৪১৪৩০৭
ক. ৬.	মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর ঃ			
০১.	জনাব সৈয়দ খায়রুল আলম, উপ-পরিচালক	-	৩১৬৫৮৫	৩২৩৬৬৯

খ. ঢাকা বহির্ভূত ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
০১	কক্সবাজার	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৪১) ৩২৬৮, ৪৫৪৩ (বাসা)
		সামুদ্রিক দপ্তর	(০৩৪১) ৩৬২০
		প্রকল্প ব্যবস্থাপক (এডিবি)	(০৩৪১) ৩২৩৪
		উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইডিএ)	(০৩৪১) ৩৩৫৬, ৩৮৩৩ (বাসা)
		এফ. আর. আই. রেষ্ট হাউজ	(০৩৪১) ৩২৮৯
		সি. এস. ও, এফ. আর. আই.	(০৩৪১) ৩৮৫৫, ৩২২৭ (বাসা)
		উপ-পরিচালক, এফ. আর. আই.	(০৩৪১) ৩৯৭৬
০২	কিশোরগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৪২) ৪৬৭, ৩৯২ (বাসা)
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৪২) ৩৪৭
০৩	কুমিল্লা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮১) ৬১৫১
		উপ-পরিচালক (মৎস্য)	(০৮১) ৬১২৭, ৫৬৫২ (বাসা)
		সহকারী পরিচালক	(০৮১) ৬৫১১

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
		খামার ব্যবস্থাপক, জাংগালিয়া	(০৮১)৬৫৪২
০৪	কুড়িগ্রাম	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৮১) ৫০১
০৫	কুষ্টিয়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭১)৪১৮৯
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৭১)৩২৯৮
০৬	খাগড়াছড়ি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৭১) ৭২৬
০৭	খুলনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪১)২২০৫৭
		উপ-পরিচালক (মৎস্য)	(০৪১)৬২৬৩৫, ৬২৩০৪ (বাসা)
		সহকারী পরিচালক	(০৪১)৬০৪৭০
		উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	(০৪১)২০৬৪৮
		উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইডিএ)	(০৪১)৬২১৮১, ৬২১৮৬
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪১)২৩৪৯১
০৮	গাজীপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৮১) ২৫২০
		খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	(০২) ৬৯০২০৭
০৯	গাইবান্ধা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৪১) ৬৪৩
১০	গোপালগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪২৩) ২৭৭
১১	চট্টগ্রাম	জেলা মৎস্য সদর	(০৩১)৬৫০৬০৯
		উপ-পরিচালক (মেরিন)	(০৩১)৫০০৮২৪
			(০৩১)৫০০৯১৮
			(০৩১)৫০১৩০২
			(০৩১)৫০৩৮৫০
			(০৩১)৫০০২৪৬
			(০৩১)৫০১৭৩১
		পি এস ও (মেরিন)	(০৩১)৫০৪২০৬, ৫০৩৮৭৩ (বাসা)
			(০৩১)৫০১২৬০
			(০৩১)৫০২৪৮০
			(০৩১)৫০৩৮৬৮
			(০৩১)৫০১২৬২
		উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	(০৩১)২১১৩৬১
		অধ্যক্ষ, মেরীন ফিশারীজ একাডেমী	(০৩১)২২৪৩৭৫, ৫০৩৮৭৩ (বাসা)
১২	চাঁদপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৪১) ৩১৬৫
		মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	(০৮৪১)৩৪০২

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
		মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র	(০৮৪১) ৩১৮৩, ৩৪৮২
১৩	চুয়াডাঙ্গা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৬১) ৩৮৮
১৪	জয়পুরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৭১) ২২৪
১৫	জামালপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৮১) ৩৬২০
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৮১) ৩৩৫২
১৬	ঝালকাঠি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৯৬) ৫৫৮
১৭	ঝিনাইদহ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৫১) ৮৫৭
		বাওড় হ্যাচারী	(০৪২১) ৫৯৮০
১৮	টাংগাইল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯২১) ৩৬৭৮
১৯	ঠাকুরগাঁও	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৬১) ৩৪৬৩
২০	ঢাকা	মৎস্য ভবন	(০২)
২১	দিনাজপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৩১) ৩২৫৭
		খামার ব্যবস্থাপক, পুলহাট	(০৫৩১) ৩০৩০
		থানা মৎস্য দপ্তর, সদর	(০৫৩১) ৩৩১৫
২২	নওগাঁ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৪১) ২৩৮৫
২৩	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৮১) ৪৮২
২৪	নড়াইল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৮১) ৫১৩
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৮১) ৩৮৯
২৫	নরসিংদী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬২১) ২৪১০
২৬	নারায়ণগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৭১) ৭৬৪৩০
২৭	নাটোর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৭১) ৫৯০
২৮	নেত্রকোনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৫১) ৪০৪
		থানা মৎস্য দপ্তর, সদর	(০৯৫১) ৩৫৫
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৫১) ৫০৪
২৯	নোয়াখালী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩২১) ৫৬৮১, ৬৩২১ (বাসা)
		খামার ব্যবস্থাপক, চৌমুহনী	(০৩২১) ৩৯৬৭
৩০	নিলফামারী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৫১) ৫৭০
৩১	পটুয়াখালী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৪১) ২৫০১
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৪১) ২৪৬৯
৩২	পঞ্চগড়	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৬২) ৩৬৯
৩৩	পাবনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৩১) ৬০৬৮

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
		খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	(০৭৩২) ৪২৭
৩৪	পিরোজপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৬১) ৫৯৭
৩৫	ফরিদপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৩১) ৩২২৩
		মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	(০৬৩১) ২৪৫৭
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৬৩১) ৩৩২১
৩৬	ফেনী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৩১) ৪০৪৬
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৩৩১) ৪২৩২
৩৭	বগুড়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫১) ৫৪৪১
		থানা মৎস্য দপ্তর, সদর	(০৫১) ৩৬৩১
		খামার ব্যবস্থাপক, মালতীনগর	(০৫১) ৫৩৩৮
৩৮	বরগুনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৪৬) ৩৯৬
৩৯	বরিশাল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৩১) ২৯১৮
		উপ-পরিচালক (মৎস্য)	(০৪৩১) ৬১২৭, ৬১২৯
		খামার ব্যবস্থাপক, কাশিপুর	(০৪৩১) ৬১১৪
৪০	বাগেরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪০১) ৪৪৫
		থানা মৎস্য দপ্তর, মংলা	(০৪০২) ৪০৭
৪১	বান্দরবন	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৬১) ৩৩৮
৪২	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৫১) ২৫০১
৪৩	ভোলা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৯১) ৪০৭
৪৪	ময়মনসিংহ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯১) ৪৭৪৮
		খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	(০৯১) ৪১৫৮
		প্রকল্প পরিচালক, ডানিডা	(০৯১) ৪৫২২, ৫৩১৮
		মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট	(০৯১) ৪৮৭৪
		থানা মৎস্য দপ্তর, সদর	(০৯১) ৪৯৫০
৪৫	মাগুড়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬১১) ৩৪১
৪৬	মাদারীপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৬১) ৪৪২
৪৭	মানিকগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৫১) ৩৯১
৪৮	মুন্সিগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৯১) ২৫৯১
৪৯	মেহেরপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৯১) ৫৪৩
৫০	মৌলভীবাজার	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৬১) ২৮১৩
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৮৬১) ২২৯২

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
৫১	যশোহর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪২১) ৫৭৫২
		প্রকল্প পরিচালক, বাওড়	(০৪২১) ৬৪০২, ৩১০৯ (বাসা)
		নির্বাহী প্রকৌশলী, বাওড়	(০৪২১) ৩১০৮
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪২১) ৪০৪৬
৫২	রংপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫২১) ২৯২৯
		খামার ব্যবস্থাপক, তাজহাট	(০৫২১) ৩৭৫৬
৫৩	রাজশাহী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭২১) ২১৮৪
		উপ-পরিচালক (মৎস্য)	(০৭২১) ২২৪৫, ২৭৮২ (বাসা)
		উর্ধতন সহকারী পরিচালক (টি,এফ,পি)	(০৭২১) ৫৯৪৬
৫৪	রাজবাড়ী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৪১) ৩৮২
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৬৪১) ৫৭০
৫৫	রাংগামাটি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৫১) ২৩২৭
৫৬	লক্ষ্মিপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৮১) ৪৬৫
৫৭	লালমনিরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৯১) ৩৪৬
৫৮	শরিয়তপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬০১) ৬৫৬
৫৯	শেরপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৩১) ৪৪৭
৬০	সাতক্ষীরা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৭১) ৩৩১৮
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৭১) ৩৬৪২
৬১	সিলেট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮২১) ৬২৪১
		যুগ্ম-পরিচালক (২য় মৎস্য)	(০৮২১) ২৩৬৪
		উপ-পরিচালক (২য় মৎস্য)	(০৮২১) ২৩৬৭
		খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	(০৮২১) ৬৭২৬
৬২	সিরাজগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৫১) ২১৩৭
৬৩	সুনামগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৭১) ৪৯০
৬৪	হবিগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৩১) ২৫৪০

মৎস্য সেক্টরের স্থাপনাসমূহ

মৎস্য ভবন
মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

বিভাগীয় মৎস্য উপপরিচালকের দপ্তর
এ ধরণের স্থাপনা ৪টি

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
এ ধরণের স্থাপনা ৪২টি

মৎস্য প্রশিক্ষন কেন্দ্র
মৎস্য অধিদপ্তরের এ ধরণের স্থাপনা ৫টি

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার
মৎস্য অধিদপ্তরের এ ধরণের স্থাপনা ১১২টি

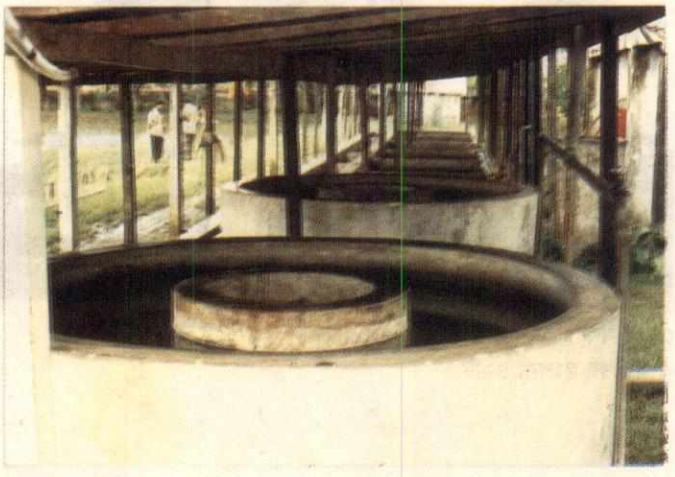

মৎস্য হ্যাচারী
মৎস্যবীজ খামারের অংশ বিশেষ

মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট
এ প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ কেন্দ্র ৪টি

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র
মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের এ ধরণের স্থাপনা ৯টি

গলদা চিংড়ি হ্যাচারী
মৎস্য অধিদপ্তরের এ ধরণের স্থাপনা ৫টি

পার্বতীপুর হ্যাচারী কমপ্লেক্স
দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প দপ্তর
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মৎস্য উন্নয়ন কেন্দ্র

রায়পুর হ্যাচারী কমপ্লেক্স
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র